রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী
১৯০৫-১৯৪৭

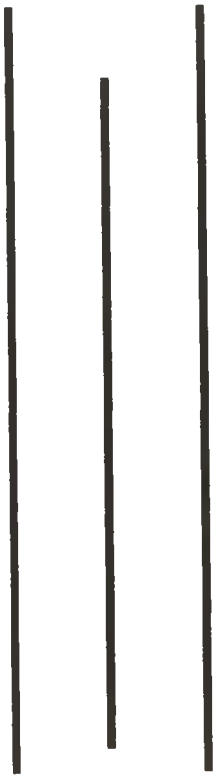

পি-এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের অভিসন্দর্ভ

রেজিনা বেগম

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী ১৯০৫-১৯৪৭

রেজিনা বেগম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পি- এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের শর্ত পূরণের জন্য উপস্থাপিত

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

466881

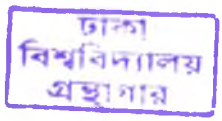

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখ : মে, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, ''রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী ১৯০৫-৪৭'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। জানা মতে, এ শিরোনামে ইতিপূর্বে আর কেউ গবেষণা করেন নি। পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা ডিপে- মা অথবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

466881

তারিখ : ১২ মে, ২০১৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

নাম : রেজিনা বেগম

Dhaka University Institutional Repository

ফোন : ৮৮০-২-৯৬৬১৯২০-৭৯/৬১৯০, ৬১৯১
Phone : 880-2-9661920-79/6190, 6191
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
Fax : 880-2-8615583
E-mail : history.du@gmail.com

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Department of History, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, পি-এইচ.ডি ডিগ্রির উদ্দেশ্যে রেজিনা বেগম এর দাখিলকৃত "রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী ১৯০৫-৪৭" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর একক সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানা মতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রির উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয় নি। অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি এবং তা পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

তারিখ :

466881

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

১১/৫/০৩

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
এম.ফিল/পি. এইচ. ডি
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রটি বিশ শতকের প্রথম থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অবিভক্ত বাংলায় নারীর রাজনৈতিক উন্মেষ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার তাৎপর্য বিশ্লেষণমূলক। বর্তমান গবেষণাপত্রের মূল যুক্তি হচ্ছে উনিশ শতকের সংস্কারআন্দোলন নয় বরং উপনিবেশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হবার মধ্য দিয়েই বিশ শতকে বাঙালি নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনটি শতকের শেষ পর্যায়ে এসে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ফলে স্তিমিত হলে নারী জাগরণের পথটি বন্ধ হয়ে যায়। বিশ শতকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে আন্দোলনের প্রয়োজনে বাঙালি নারীকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা অর্জনের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালি নারীরা উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয় এবং এই রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যায়ক্রমে ব্যাপকহারে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যদিয়েই ধীরে ধীরে নারীমুক্তির সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিকায়ন এবং নারীমুক্তি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। উনিশ শতকে সংস্কারআন্দোলন বাঙালি নারীর জীবনের মানোন্নয়নে যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে তা ছিল পিতৃতান্ত্রিকতার ভিন্নরূপ বা 'মডারেট' পিতৃতন্ত্র। যা নারীকে পুরুষের ইচ্ছানুযায়ি পুনঃসজ্জায়িত করে। সংস্কারযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষএর মধ্যদিয়ে, ফলে নারীপ্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। নারী সম্পৃক্ত হয় উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে। এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী তার সক্রিয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজ মানসে নারীর চিরন্তন যে চিত্র তা পরিবর্তনে সমর্থ হন এবং জনপরিমণ্ডলে প্রবেশের অধিকার পান। নারীর সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারসহ পতিতালয় উচ্ছেদের দাবি এই সময়ে সামনে আসে। তিরিশের দশকে নারীরা পৃথক মহিলা কংগ্রেসের দাবিও তোলেন। চল্লিশের দশকে কৃষকআন্দোলন চলাকালে সিদ্ধান্ত দেয়া হলো, কৃষক রমণী তার আঙ্গিণায় যে ফল-মূল, সব্জী উৎপাদন করে বিক্রি করে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ কৃষক রমণীর 'স্ত্রীধন'। নারী নির্যাতন বা বউ পেটানোকেও বেআইনি ঘোষণা করা হয় একই সময়ে। মনিকুন্তলা সেন বর্ণনা করেছেন কীভাবে বিধবা বাতাসী কৃষক নেত্রী বিমলা মাজিতে রূপান্তরিত হন। এসব সমাজ পরিবর্তনের সূচক। কাজেই উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন নয়, বরং বিশ শতকে পর্যায়ক্রমে সামাজিক ক্ষেত্রে এবং এর মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের ফলে বাঙালি নারীসমাজ ক্রমেই নিজেদের অধঃস্তনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় রত হয়। উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রমজীবী নারীর সচেতন উত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের একটি পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

ইতিহাসের ছাত্রী হিসেবে লক্ষ করেছি আমাদের ইতিহাসে নারী যেন অনেকটাই অস্পষ্ট, অকীর্তিত, অনুপস্থিত। বিশেষত একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে বাঙালি নারীর দীর্ঘকালের যে সংগ্রাম সেটি ইতিহাসে কিছুটা উহ্য থেকে যায়। কাজেই এমন একটি বিষয়ে গবেষণা করবার সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। গবেষণার বিষয়বস্তু বিবেচনায় তত্ত্বাবধায়ক হতে স্বীকৃত হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন বিভাগীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন । তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও পথনির্দেশ ব্যতিত এই অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণাপদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং গবেষণাপত্রের সমস্ত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন অসীম ধৈর্য সহকারে। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কাজে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করবার জন্য যে সকল লাইব্রেরি ও আর্কাইভস্ ব্যবহার করেছি, সেখানকার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এরমধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাবৃন্দ, কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কর্মকর্তাবৃন্দ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা অধ্যয়ন কেন্দ্র পাঠাগার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা অধ্যয়ন কেন্দ্র পাঠাগার-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ। কলকাতার প্রত্যেকটি পাঠাগারের কর্মকর্তাবৃন্দ আমাকে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন যাতে আমি অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারি। কলকাতা প্রাদেশিক আর্কাইভস-এর কর্মকর্তা আনন্দ ভট্টাচার্য বিশেষ বিবেচনায় সরকারি নথি দেখবার ও কপি করবার অনুমতি দিয়ে এবং অতি অল্প সময়ে সকল দলিলপত্র কপি করে দিয়ে আমার তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজ করে দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের সহযোগিতার ফলে আমি নির্ধারিত সময়ে তথ্য-উপাত্য সংগ্রহের কাজ শেষ করতে পেরেছি। বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মানবীবিদ্যা কেন্দ্রের শিক্ষক কঙ্কণা সেনগুপ্ত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, গবেবক স্বপন বসুর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাদের সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য। কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের দূর্লভ একটি ছবি সম্বলিত 'লুক-আউট ওয়ারেন্ট' টি সংগ্রহ করবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছেন কলকাতা পুলিশ প্রশাসনের উপ কমিশনার (১) ড. সুধীর কুমার মিশ্র এবং কলকাতা পুলিশ মিউজিয়াম-এর সহকারী পুলিশ কমিশনার অশোক কুমার ঘোষ এবং সাবইন্সপেক্টর অমিতাভ ভট্টাচার্য। তাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

বিশিষ্ট নারী গবেষক মালেকা বেগম তার ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে দূর্লভ বই ও নথিপত্র কপি করবার অনুমতি দিয়েছেন এবং গবেষণার কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন আন্তরিকভাবে। তার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কাজে নিয়োজিত হবার সময়ে আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা বিভাগে কর্মরত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব মফিদুল হক-এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আমি যখন পি-এইচ.ডি গবেষণার জন্য বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করছিলাম, তখন তিনি নারীর রাজনৈতিকায়নের বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টিআকর্ষণ করেন এবং আমি গবেষণার বিষয়বস্তু খুঁজে পাই। এরপর বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান বই, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পুলিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত প্রীতিলতার নথিটির তথ্য তিনি আমাকে দিয়েছেন। এটি সম্পর্কে আমার জানা ছিল না। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজে একাধারে দীর্ঘ তিন মাস এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে কলকাতায় থাকাকালে যার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও স্নেহে আমি বাড়ি থেকে দুরে থাকার কষ্ট ভুলে ছিলাম তিনি রুমঝুম রায় চৌধুরী। তিনি এবং তার ভাই সন্দীপ সিংহ রায় পারিবারিক সুহৃদ হিসেবে আমার সমস্ত প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখেছেন, কলকাতা পুলিশ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগটিও তাদের মাধ্যমে হয়েছে। তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা। সবশেষে বলতে হয় আমার পরিবারের কথা। আমার পরিবারের সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর মত আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না, আমার যে কোন অর্জন তাদের অবদান ব্যতিত সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় :
রাজনৈতিক আন্দোলনে নারী : তত্ত্বকাঠামো ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায় :
পটভূমি : উনিশ শতক : বাংলায় সংস্কার আন্দোলন ও নারীর নবজীবনের যাত্রা শুরু ৩৬

তৃতীয় অধ্যায় :
স্বদেশী যুগ : ১৯০৫-১৯১৯ : দেশাত্মবোধের চেতনায় উজ্জীবিত নারী ৬৬

চতুর্থ অধ্যায়:
সক্রিয় রাজনীতিতে নারী : ১৯২০-১৯২৯ ১০২

পঞ্চম অধ্যায় :
সনাতন ভূমিকার বাইরে নারী : ১৯৩০-৩৯ ১৩৪

ষষ্ঠ অধ্যায় :
উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায় : প্রান্তিক ও শ্রমজীবি নারীর উন্মেষ : ১৯৪০-৪৮ ১৬৮

সপ্তম অধ্যায় :
উপসংহার ১৮৫

পরিশিষ্ট-১ :
১৯২১ ও ১৯২৫-এ বঙ্গীয় আইন সভায় নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে-বিপক্ষে ব্যক্তির অবস্থান ১৯২

পরিশিষ্ট-২ :
অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানের মহিলাগণ ১৯৩০ সালের লবন আইন অমান্য আন্দোলন ও
১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন, তাদের নামের তালিকা ১৯৯

পরিশিষ্ট-৩ :
সরকারি নথিপত্র ২০৪
গ্রন্থপঞ্জি ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

গবেষণাপত্রটি বিশ শতকের প্রথম থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অবিভক্ত বাংলায় নারীর রাজনৈতিক উন্মেষ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার তাৎপর্য বিশ্লেষণমূলক। বর্তমান সময়ে বাঙালি নারীসমাজ তাদের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পাশাপাশি রাষ্ট্রের যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। বাঙালি নারীর এই সাম্প্রতিক অবস্থান বুঝবার জন্য তার যে দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে সে প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। নির্বাচিত সময়ে বাংলার নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং নারীর সামাজিকায়নে এই রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা এবং গবেষণা অপ্রতুল।

উপনিবেশিক বাংলায় নারীর শিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে উনিশ শতকের নবজাগরণের সময় থেকে। লক্ষণীয় যে, বাংলায় নারীজাগরণের সূত্রপাত ঘটে পুরুষ কর্তৃক। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে যে, বাংলার সামাজিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা রোধে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি পুনর্জাগরণ। এই বহুমুখী পুনর্জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে নারীজাগরণ বা অধঃপতিত অবস্থা থেকে নারীকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা। এ লক্ষে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের মত সমাজ সংস্কারকরাই নারীর বিরুদ্ধে সামাজিক নিপীড়ন বন্ধে এবং নারীর অধিকার রক্ষায় প্রথম এগিয়ে আসেন। ফলে ১৮৬৩ সালে *ভাগলপুর মহিলা সমিতি* প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রগতিশীল একদল পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি ছিল সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীর মুক্তির লক্ষে বাংলার নারীদের প্রথম সমিতি। পরবর্তী সময়ে ১৮৭৯ সালের ৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় *বঙ্গীয় মহিলা সমাজ*। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাধারানী লাহিড়ী, কাদম্বিনী বসু, কৈলাস কামিনী দত্ত, কামিনী সেন প্রমুখ। নবজাগরণের যুগে সমাজসংস্কারের পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য জগতেও নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে। এই প্রগতিশীল ধারার শিল্প-সাহিত্যেও নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বাংলার নারীসমাজে এভাবে শিক্ষার বিস্তার, শিল্প-সাহিত্য চেতনার বিস্তার ও স্বদেশ চেতনা বিস্তারের প্রয়াসের ফলে ধীরে ধীরে তাদের ভিতর বৃহত্তর জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায়।

প্রত্যক্ষভাবে বাংলার নারীর রাজনীতিতে প্রথম অংশগ্রহণ ঘটে ১৮৮৯ সালে। ১৮৮৯-এ বোম্বেতে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে সর্বপ্রথম দুজন বাঙালি নারী যোগ দেন। এঁদের একজন কংগ্রেস নেতা জানকীনাথ ঘোষালের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অপরজন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও এর পূর্বে ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল আন্দোলনে ছাত্রীসমাজ যুক্ত ছিল, এবং কবি কামিনী রায়, লেডী

Dhaka University Institutional Repository

অবলা বসু, সরলা দেবী প্রমুখ ছাত্রী এই আন্দোলনে যোগ দেন। তবে ইলবার্ট বিল আন্দোলনে বাঙালি নারীর এই অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ ছিল না বরং সমর্থনসূচক ছিল।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটলে বাংলার নারীসমাজ এই আন্দোলনে সচেতনভাবে জড়িত হন। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাংলার পুরুষসমাজে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ঘটলে তারা উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয় এবং এই আন্দোলনকে সফল করবার লক্ষে তারা বাঙালি নারীসমাজকে স্বদেশবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এই সময় সরলা দেবী ভারতী পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। কলকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান করে এবং গান রচনা করে জনসাধারণকে জাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। তাঁর মা লীলাবতী মিত্র এবং তাঁর সহকর্মী সুবলা আচার্য, হেমাঙ্গিনী দাস প্রমুখ নিজ বাড়ি এবং গ্রামে চরকা ও তাঁত প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। বরিশাল অঞ্চলে মহিলারা বিয়ের আচার অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অর্থ জাতীয় ভান্ডারে দান করতে আরম্ভ করেন। ১৯০৬ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের শুরুতে বন্দেমাতরম ধ্বনিসহ রাস্তায় শোভাযাত্রা বের হতে পারবে না এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এ সময় সরোজিনী বসু নামে এক মহিলা প্রতিজ্ঞা করেন যে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হলে তিনি হাতে সোনার চুড়ি পরবেন না। বরিশালের কলসকাঠি গ্রামের মহিলারা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গেরুয়া পোশাক পরার প্রতিজ্ঞা করেন। এ সময়ে বিক্রমপুরের আশালতা সেন ও কমল কামিনী গুপ্তা স্বদেশী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘরের বাইরে বের হয়ে আসেন। আশালতা সেনের উদ্যোগে ১৯২১ সনে ঢাকা শহরের গেন্ডারিয়ায় একটি বয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় 'শিল্পাশ্রম' নামে। ১৯২৪ সালে তাঁর উদ্যোগে ঢাকায় গড়ে ওঠে 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি'। এই সমিতির মেয়েরা খদ্দর কাপড়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে ঘরে ঘরে খদ্দর বিক্রি করে স্বদেশী চেতনা প্রচার করতেন। এই সমিতির অন্যতম নেত্রী ছিলেন সরযু বালা গুপ্ত ও সরমা গুপ্ত। এভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার মধ্যদিয়ে বাঙালি নারীসমাজের সামাজিকায়নের সূত্রপাত ঘটে।

মহিলাদের উদ্যোগে এ পর্যায়ে স্বদেশী মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন হতে থাকে। চব্বিশ পরগনার মজিলপুর গ্রামে বসন্তবালা হোম এবং গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর উদ্যোগে এ ধরনের একটি স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ও রাজনৈতিক কর্মীদের ভিতরে মডারেট বা নরমপন্থী এবং এক্সট্রিমিস্ট বা চরমপন্থী এই দুই দলের উদ্ভব হয়। এই দুই দল ব্যতীত বিপ্লবপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী এক দলও এসময় আত্মপ্রকাশ করে। বাংলায় যে পাঁচজন সদস্য নিয়ে ' Revolutionary National Council' বা *জাতীয় বিপ্লব সমিতি* গঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন একজন নারী, সিস্টার নিবেদিতা। তিনি বাঙালি না হয়েও বাঙালির জাতীয় আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তবে তখনও বিপ্লবী দলে বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ সম্ভব না হলেও বিপ্লবীদের কার্যকলাপে তাদের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। ফেরারী বা পলাতক কর্মীদের অতি সংগোপনে আশ্রয় দেয়া, তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া ও চিঠি আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসেবে মেয়েরা দায়িত্ব পালন করত।

১৯১৭ সালে বীরভূম জেলার সিউড়ীতে দুকড়ি বালা নামে এক মহিলার বাড়িতে পিস্তল পাওয়া যায়। বিচারে তার তিন বছরের কারাদণ্ড হয়। দুঃখময়ী নামে আরেকজন মহিলাও একই অভিযোগে অভিযুক্ত হন। ১৯১৮ সালে ননীবালা দেবী ছিলেন একমাত্র মহিলা রাজবন্দী।

১৯২০ এর দশক থেকে ধীরে ধীরে মেয়েরা বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯২৪-এ লীলা রায় ঢাকায় গড়ে তোলেন *দীপালী সংঘ*। এই সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য বাংলার নারীসমাজকে প্রস্তুত করা।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার অপরাধে কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা স্কুলের অষ্টম শ্রেণির দুজন ছাত্রী সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তারা ছিলেন যুগান্তর দলের সদস্য। ১৯৩২ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত চ্যান্সেলর জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন বীনা দাস নামের এক ছাত্রী। ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলে রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন নামে দু'জন মুসলিম মেয়ে যোগ দেয়। বিপ্লবীকন্যা প্রীতিলতা আজও স্বাধীনতাকামী সকল জনসাধারণের অনুপ্রেরণার প্রতীক।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রধান ধারা ছিল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এবং সামরিক আইনের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরলা দেবী চৌধুরানী বাংলার নারীসমাজের মুখপাত্র হিসেবে এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানান। ১৯২০ সনে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং নাগপুরে বার্ষিক অধিবেশনে এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়। স্বাভাবিকভাবেই বাঙলার নারীরা এতে যোগ দেন। এ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন স্থানে মহিলারা গয়না ও অর্থ দান করতে লাগলেন।

এ সময় বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে মহিলারা প্রকাশ্যে যোগ দেন। বাংলার নারীরা সাধারণভাবে ও প্রকাশ্যে পুরুষের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজে অবতীর্ণ হন বলতে গেলে এই সময় থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

সরোজিনী নাইডু ১৯২১ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ঐ বছর কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাসের অনুপস্থিতিতে তাঁর সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। এ সময় ঢাকার মেয়েরা চরকা দিয়ে সূতা কাটা শুরু করেন। ১৯২১ সালে চট্টগ্রামের মেয়েরা অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে যুক্ত হন। ১৯২২ সিলেট জেলায় সর্বপ্রথম নারীদের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার দুই বছর পর এর কার্যক্রম অনেকটা থেমে যায়। তবে অসহযোগ আন্দোলন বাংলার নারীদের রাজনৈতিক এবং একই সাথে সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসর করার বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ সময় বাংলার নারীরা আত্মসংগঠন ও রাজনৈতিক কাজ পরিচালনার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু করে। ১৯৩০ এর দশকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ দ্বারা আইনঅমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩০ সনের ১২ মার্চ ৭৯ জন সঙ্গীসহ সবরমতী আশ্রম থেকে পদব্রজে দণ্ডী যাত্রা করেন। ৫ এপ্রিল তিনি সরকার কর্তৃক বন্দী হন। এ সময়ে তিনি নারীসমাজের উদ্দেশ্যে একটি বাণী দেন যার মর্ম ছিল ভারতের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের দানই অধিক হওয়া উচিত। নারীকে দুর্বল মনে করা অপমানজনক এবং নারীরা যেন বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও মাদকদ্রব্য নিবারণের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে এগুলোর বিক্রয় কেন্দ্রে পিকেটিং করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে বাংলাদেশে সিলেটের সরলা বালা দেব, দিনাজপুরের প্রভা চ্যাটার্জী, ভোলার সরযুবালা সেন, বরিশালের ইন্দুমতি গুহ ঠাকুরতা, প্রফুল্ল কুমারী বসু, নোয়াখালির সুশীলা মিত্র, খুলনার স্নেহশীলা চৌধুরী, সিরাজগঞ্জের বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, বিক্রমপুরের সরযু বালা সেন, ময়মনসিংহের উষা গুহ প্রমুখ নারীরা নিজ নিজ অঞ্চলে আন্দোলনে সক্রিয় থাকেন। আইনভঙ্গ করে লবণ প্রস্তুতের কাজে সমুদ্রতীরবর্তী মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার মহিলাগণ নিজেদের নিয়োজিত করেন। মহাত্মা গান্ধীর পরে সরোজিনী নাইডু লবণ আইন ভঙ্গ করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন। লবণ সত্যাগ্রহ বা ডান্ডি মার্চে সিলেটের নারীসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে ১৯৩০ সালে গড়ে ওঠে 'শ্রিহট্ট মহিলা সংঘ'। ১৯৩১ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্যতম নেত্রী হেমপ্রভা মজুমদার ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী লাবন্যলতা চন্দ পদত্যাগ করেন, পরবর্তীকালে তাঁকে তাঁর সহকর্মী যমুনা ঘোষসহ গ্রেফতার করা হয়। শামসুননেসা বেগম, রওশন আরা বেগম, রইসাবানু বেগম ও বদরুন্নেসা বেগম প্রমুখ মুসলিম নারীরাও লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলে হেমপ্রভা মজুমদার, লীলা রায়সহ বাংলার নারীরা সেখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে নেতাজী জাপান অধিকৃত সিঙ্গাপুরে একটি অস্থায়ী জাতীয় ভারত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এর অধীনে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে একটি জাতীয় সামরিক বাহিনীও গঠন করেন। নেতাজী জাতীয় আন্দোলনে নারীসমাজের সমান অংশগ্রহণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তিনি তাঁর সামরিক বাহিনীর অধীনে 'রানী অব ঝান্সী ব্রিগেড' নামে একটি নারী-বাহিনী গঠন করেন। এই নারী-বাহিনীর প্রধান ছিলেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন্। যুদ্ধ পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা এই বাহিনীকে দেওয়া হয়। নারীজাতির এই সম্মান শুধু বাংলা কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নারীগণের মধ্যেও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা এনে দেয়।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে বোম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী প্রস্তাব আনেন যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ দেশ থেকে চলে যাক, ভারতীয়রা কোনভাবেই তাদের সাহায্য করবে না, তারা আত্মশক্তির উপর দাঁড়িয়ে বিপক্ষ দলের সঙ্গে লড়বে। প্রস্তাবটি ৮ আগস্ট গৃহীত হয়। এরপরই মহাত্মা গান্ধীসহ বহু নেতাকে বৃটিশ সরকার আটক করে। মহিলা নেত্রীবৃন্দও বাদ পড়লেন না। সরোজিনী নাইডু প্রথমদিনই গ্রেফতার হন। এ সময়ে সমগ্র ভারতব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় তা আগস্ট বিপ্লব নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সর্বত্র এই আন্দোলন শুরু হয়, বিশেষ করে মেদিনীপুরে নিবিড়ভাবে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং মেদিনীপুরের নারীরা অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মেদিনীপুরের ৭৩ বছর বয়স্ক বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা এই আন্দোলনে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। মেদিনীপুরের মত বীরভূমের অন্তর্গত শান্তিনিকেতন অঞ্চলেও মহিলা কর্মীরা আগস্ট বিপ্লবকে সার্থক করবার উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে প্রচার ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত হন। এ অঞ্চলে নন্দিতা দেবী ও রানী চন্দ্র আগস্ট বিপ্লবে যোগদান করে কারাবরণ করে।

কলকাতাতেও এই বিপ্লব জোড়াল আকার ধারণ করে। এ সময় দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সম্পাদক বীনা দাস আটক হন। সমাজতন্ত্রীদল এই সময় কংগ্রেসের অর্ন্তভুক্ত থেকে কাজ করতেন। তারা পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে এড়িয়ে সংগোপনে বিপ্লবী কাজ চালাতেন। এদের অন্যতম ছিলেন অরুনা আসফ আলী। তিনি একজন বাঙালি নারী। তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী হয়। তিনি পুলিশের হাতে ধরা দেন নি। তিনি সমাজতন্ত্রী নেতা ডক্টর রামমোহন লোহিয়ার সঙ্গে গোপনভাবে 'ইনকিলাব' নামে একটি পত্রিকাও বের করেন। ১৯৪৬ সালে অরুনা আসফ আলীর উপর থেকে পরওয়ানা তুলে নেওয়া হলে তিনি কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের বিরাট জনসভায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৪৩ সনে (বাংলা ১৩৫০) জাপানি আক্রমণের প্রতিরোধকল্পে বাংলার পূর্বাঞ্চল থেকে যানবাহন সরিয়ে নেয়া হয় এবং খাদ্যমজুদ বৃদ্ধি পাবার কারণে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়। যার ফলে দেখা দেয় ভীষণ দুর্ভিক্ষ যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতার মহিলা কর্মীরা গঠন করেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। মূলত এই সমিতি ছিল তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধকালীন জরুরী সমিতির একটি নারী শাখা। বিভিন্ন অঞ্চলে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীর সমাজ-জীবনে এই সময় যে ভীষণ সংকট উপস্থিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

তা থেকে তাকে রক্ষা করার ভার নেয় এই সমিতি। এটি ছিল একটি ফ্যাসিবাদবিরোধী ও গণতান্ত্রিক নারী সংগঠন। এই সংগঠনটি যে সময় গঠিত হয় তখন কমিউনিষ্ট আন্দোলনে বিশেষ করে বিভিন্ন কৃষক শ্রমিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা এই প্রক্রিয়ার সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য ছিল :

১. দেশরক্ষা

২. জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা

৩. দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও নারীদের মর্যাদার সাথে বাঁচতে সাহায্য করা।

৪. সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শামিল হওয়া।

কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা ফ্রন্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের নির্যাতিত মেয়েদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তসহ সকল শ্রেণির মেয়েদেরই সমাবেশ ঘটেছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ছিল সমাজের সকল শ্রেণির দেশপ্রেমিক নারীদের প্লাটফর্ম। মনিকুন্তলা সেন, গীতা মুখার্জি, রেনু চক্রবর্তীসহ বেশ কয়েকজন কমিউনিষ্ট আন্দোলন এবং ছাত্রআন্দোলন থেকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার গণতান্ত্রিক সংগঠনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ের বিশিষ্ট শ্রমিকনেত্রী ছিলেন সন্তোষ কুমারী দেবী, ডঃ প্রভাবতী দাসগুপ্ত, সুলতানা মোয়জ্জেদা, সুধা রায় প্রমুখ।

অবিভক্ত বাংলার ২৮টি জেলাতেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে ওঠে। দিনাজপুরের ফুলবাড়ি থানার লালপুর ডাঙ্গায় হারুনা বিবির নেতৃত্বে কৃষক মেয়েদের একটি সভা হয়। সভায় একটি কৃষক মেয়েবাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। খুলনায় সাতক্ষীরা মহকুমার রসুলপুরে তসলিমা খাতুনকে সম্পাদিকা করে একটি আত্মরক্ষা সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতিতে মুসলিম নারীদের উৎসাহ বেশী ছিল। বরিশালে স্নেহলতা দাসকে সভানেত্রী ও শান্তিসুধা ঘোষ এবং যুঁইফুল বসুকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে ১৭ জন মহিলা নিয়ে একটি আত্মরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১২০ জন স্বেচ্ছাসেবিকা এতে যোগ দেয়। বরিশালে আত্মরক্ষা সমিতির মহিলারা পাঁচ হাজার দুঃস্থ মহিলার সমাবেশ করে, সমবায় ভাণ্ডার খুলে চাল বিতরণের কাজ করে।

চট্টগ্রামের ১৫টি স্কোয়াড জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যআন্দোলন গড়ে তোলে। দিনাজপুর, রংপুর ও পাবনায় এই সমিতির মহিলারাই প্রথমত ভুখা মিছিল বের করে। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে প্রায় দুই হাজার মহিলার ভুখা মিছিলের কারণে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শেষ পর্যন্ত আদেশ দিতে বাধ্য হন যে, বাজারে যত ধান চাল আছে তা ১৫ টাকা সের দরে বিক্রি করে দেওয়া হোক।

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল কৃষক আন্দোলনের সময়। অবিভক্ত বাংলার উনিশটি জেলায় সে সময় যে সব কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তারমধ্যে নারীর অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪৩ সালে নালিতাবাড়িতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে বহু হাজং নারী কর্মীও যোগ দেন। এ সময়ে রংপুর, যশোর, খুলনা ও দিনাজপুরে 'তোলা ও লিখাই' বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। গ্রামীণ নারীরা এর বিরুদ্ধে সংগঠিত কৃষকআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। দিনাজপুর ও রংপুরে কৃষকরা 'সমিতির হাট' চালু করলে কৃষক জোতদার লড়াই শুরু হয়। এ সংগ্রামে কৃষকদের রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাত্রী হিসেবে কৃষাণীরা সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

তেভাগা আন্দোলন, টংক আন্দোলন, নানকার আন্দোলন, নাচোলের কৃষক আন্দোলনের সাথে নারীসমাজের এক বিরাট অংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। দিনাজপুরের রানী শংকাইলে রাজবংশী কৃষাণী জয়মনি প্রায় তিনশ' নারী নিয়ে তার বাহিনী গঠন করে। এই বাহিনী পুলিশকে কয়েকবার পরাস্ত করে। ঠাকুরগাঁও মহকুমার আটোয়ারী থানার রামপুর গ্রামে বর্গাদারের ধানকাটা উপলক্ষে শুরু হয় কৃষক নির্যাতন। এ নির্যাতন বন্ধ করার জন্য এগিয়ে আসেন রাজবংশী মহিলা দীপেশ্বরী।

১৯৪৬ সালে ময়মনসিংহের সুসং দূর্গাপুরের বাহরতলী গ্রামে পুলিশী তল্লাসীর বিরুদ্ধে হাজং নারীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ সময় ২৫ জন সশস্ত্র পুলিশের সাথে লড়ে রাশমনি হাজং শহীদ হন। টংক আন্দোলনে এ অঞ্চলে তিনি প্রথম শহীদ। এ অঞ্চলে পরবর্তীতে শহীদ হন শঙ্খ মনি ও রেবতি। পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন অর্শমনি, রাহেলা ও ভদ্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব থেকেই বন্দী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করতে থাকেন। জেলমুক্ত নেতারা নবচেতনায় সঞ্জীবিত হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষে নিয়োজিত হন। বাংলার অঞ্চলে অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানরা একত্রে সভাসমিতি, শোভাযাত্রা-হরতাল আয়োজন করতে লাগল। বাংলার নারীরাও এতে সমানভাবে যোগ দেন।

এভাবে বাংলার জাতীয় আন্দোলনে নারী যখন পুরুষের পাশে সমভাবে দাঁড়ান তখনই তা শক্তিমান হয়ে ওঠে। এই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে নি পরাক্রমশালী বৃটিশ শক্তিও, ফলে ১৯৪৭ এর আগস্ট মাসে বৃটিশ রাজকে ভারত ত্যাগ করতে হয়। ১৯০৫, ১৯২১, ১৯৩০ এবং ১৯৪২ সাল আমাদের জাতীয় আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় সময়। প্রথমে পরোক্ষ এবং পরে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়ে এর প্রত্যেকটিকেই বাঙালি নারী সার্থক করে তুলেছে, একই সাথে পর্যায়ক্রমে নারীর রাজনীতি এবং সমাজে অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

১. বর্তমান গবেষণাপত্রের মূল যুক্তি হচ্ছে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন নয় বরং উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হবার মধ্য দিয়ে বিশ শতকে বাঙালি নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। উনিশ শতকে যে সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয় শতকের শেষ পর্যায়ে এসে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ফলে তা স্তিমিত হলে নারীজাগরণের পথটি বন্ধ হয়ে যায়। বিশ শতকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে আন্দোলনের প্রয়োজনে বাঙালি নারীকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা অর্জনের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালি নারীরা উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে এই রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার এবং পর্যায়ক্রমে ব্যাপকহারে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে নারীমুক্তির সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিকায়ন এবং নারীমুক্তি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এই যুক্তির পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গবেষণাপত্রে আলোচিত হবে।

২. মহিলাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার মূল লক্ষ্য কী ছিল? তাদের লক্ষ্য কি শুধু নারীসমাজের উন্নতি ও মঙ্গলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, না দেশের সার্বিক মঙ্গল তাদের লক্ষ্য ছিল?

৩. লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মপন্থার যে ভিন্নতা ছিল তা এই গবেষণায় বিবেচ্য বিষয়। বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের দর্শনে যেমন ভিন্নতা ছিল তাদের কর্মপদ্ধতিও ছিল তেমন ভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন কর্মপদ্ধতি বাঙালি নারীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করেছে।

৪. রাজনৈতিক দর্শনে ভিন্নতার পাশাপাশি ধর্মীয় আদর্শের ভিন্নতাও নারীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্তিকে প্রভাবিত করেছিল যা বর্তমান গবেষণার একটি বিবেচ্য বিষয়।

যৌক্তিকতা :

অবিভক্ত ভারতবর্ষে উপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন অধিকার আদায়, সামাজিক অবরোধমুক্তি ও বৃটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে অংশ নিয়েছেন নারী। এই বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে অবিভক্ত বাংলার বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং বাংলার নারীসমাজ এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পশ্চাদপদ সামাজিক অবস্থান এবং অবরুদ্ধ জীবনে আবদ্ধ বাঙালি নারীর জন্য স্বাধীনতা আন্দোলন প্রথম অবরোধ মুক্ত হবার পথ সৃষ্টি করে। অবিভক্ত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলার নারীসমাজের পরিবর্তনশীল ভূমিকার গবেষণাভিত্তিক ইতিহাস এখন পর্যন্ত অনুপস্থিত। পাশাপাশি বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে নারীর অস্বীকৃত ও অবমূল্যায়নকৃত অবদানের প্রতি আলোকপাত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত গবেষণার মূল্যায়ন :(দ্বৈতীয়িক উৎস)

বর্তমানে নারী বিষয়ক গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারী বিষয়ক গবেষণার অধিকাংশই হয়ে থাকে নারীশিক্ষার প্রসার, নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবর্তন বিষয়ে। তবে রাজনীতিতে নারীর সংগ্রামী মনোভাব, ঐতিহ্য এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে উত্তরণের পটভূমি নিয়ে কিছুসংখ্যক গবেষণা হয়েছে। এই সকল গবেষণাকর্মে সাধারণত উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকে অবধি বাংলার রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের একটা ধারাবিবরণী পাওয়া যায়। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ দু'স্থানেই এধরনের গবেষণাকর্মের উপস্থিতি দেখা যায়। তবে গবেষকরা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যেন তা ইতিহাসের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ধারা। এছাড়া কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায় যেখানে কৃতি নারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি বর্ণনা করা হয়। এই গ্রন্থসমূহও বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক নয়। তবে রাজনীতিতে বাংলার নারীর অংশগ্রহণ কখন থেকে শুরু হয় এবং এই অংশগ্রহণ কীভাবে ব্যাপক আকার লাভ করে তা জানবার জন্য এই গবেষণাকর্মগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত ***জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গ নারী***। এটি একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম। এখানে ১৮৮৯ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে দুজন নারী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত সময়ে বাঙালি নারীর বহুমাত্রিক সংগ্রামের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলন ও এর ফলাফল, অসহযোগ আন্দোলন, আইনঅমান্য আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে নারীসমাজের অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানা যায়। তবে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে যে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়, যে আন্দোলনে নারীসমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল সে সম্পর্কিত তথ্য এখানে অনুপস্থিত। এ ছাড়াও বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কেও তেমন আলোকপাত এখানে হয় নি।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম অদিতী ফাল্গুনী রচিত ***বাংলার নারী : সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসন্ধান***। গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে নারীসংগঠনগুলির বিকাশ এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক উন্মেষের ক্ষেত্রে সংগঠনগুলির ভূমিকা জানা যায়। পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের একটি বিবরণী পাওয়া যায়। তবে গবেষণাকর্মটি বিশ্লেষণমূলক নয়, ঘটনা সমূহের বর্ণনামূলক।

বাংলাদেশে নারী বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে মালেকা বেগমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । মালেকা বেগম রচিত ***বাংলার নারী আন্দোলন*** শীর্ষক গবেষণাকর্মটি উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিতে নারীআন্দোলনের ইতিহাসকে ১১টি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটির সূচনা হয়েছে প্রাচীন দ্রাবিড় ও আর্য সমাজে নারীর অবস্থান ও সেই অবস্থান থেকে কীভাবে নারী গৃহবন্দী হয়, কীভাবে নারী সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার তথা সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সেই ইতিহাসের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে উনিশ শতকের নবজাগরণের সময়ে নারীর অবস্থার উন্নয়নে যে পদক্ষেপ নেয়া হয় তা আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে নারীআন্দোলনের সূচনা, বিশ শতকের

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততা, কৃষক আন্দোলনে নারীসমাজের ভূমিকা, নারী সংগঠন সমূহের প্রতিষ্ঠা, বিভাগোত্তর পাকিস্তানে ও পাকিস্তানে সামরিক শাসনকালে নারীআন্দোলন আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির আলোচনা সমাপ্তি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব তথা '৬৯ এর গণআন্দোলনে নারীসমাজের ভূমিকা ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নারীসমাজের অবস্থান আলোচনার মধ্যদিয়ে। তবে স্বল্প পরিসরে বৃহত্তর সময়ের ইতিহাস আলোচনা করায় তা পূর্ণাঙ্গ বা বিস্তৃত হয় নি।

১৮ থেকে ২০ শতক এই তিনশ বছরের বাঙালি নারীর জীবন সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক রচনা করেছেন *আমি নারী* শীর্ষক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি থেকে বিগত তিন শতকে এ অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে বাঙালি নারীর জীবন কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে সেই ইতিহাসের একটি ধারাবিবরণী পাওয়া যায়।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বামপন্থি আন্দোলনে নারী নেত্রীদের পুরোধা ছিলেন কনক মুখোপাধ্যায়। নারী আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি লিখেছেন *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা* গ্রন্থটি। বিশেষ করে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি যা পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি নামে পরিচিত হয় তার ক্রমবিকাশের একটি রূপরেখা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থী নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে জানবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কনক মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক এবং তাঁর সহকর্মী রেনু চক্রবর্তী রচনা করেছেন ***Communists in Indian Women's Movement (1940-1950).*** এই গ্রন্থটি থেকেও চল্লিশের দশকের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে বামপন্থী নারী সংগঠন-এর ভূমিকার কথা জানা যায়। গ্রন্থটিতে বাংলার পাশাপাশি সমগ্র ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে জানা যায়।

মনিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *সেদিনের কথা* থেকেও বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে বামপন্থি দলের ভূমিকার কথা জানা যায়। মনিকুন্তলা সেন বিস্তারিতভাবে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীদের সচেতন করার ক্ষেত্রে বামপন্থী সংগঠন-এর ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে এই তিনটি গ্রন্থই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। কাজেই এই গ্রন্থ থেকে নারীআন্দোলনের একটি খণ্ডিত চিত্র পাওয়া যায়।

সংগ্রামী বাংলার নারীদের জীবনী নিয়ে নারী প্রগতি সংঘ প্রকাশ করেছে *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে* নামক দুই খণ্ডের গ্রন্থ। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী নারীদের জীবনী এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যাবে। এই জীবনী থেকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও তাদের রাজনীতি সম্পৃক্ততার পটভূমি জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি : গবেষণাপত্রটি প্রধানত বিশ্লেষণধর্মী। প্রকাশিত এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। আলোচনা ও বিশ্লেষণের শুরুতে যে প্রত্যয়টি ও ধারণা কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে তা রাজনৈতিক নারী সংক্রান্ত। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার লক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজিত আছে।

উৎস :

বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক সূত্রের অপর্যাপ্ততার কারণে প্রাপ্ত দ্বৈতীয়িক সূত্রসমূহকে গবেষণার ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হবে, যেমন : নির্বাচিত দ্বৈতীয়িক গবেষণা কর্ম (ইংরেজি), নির্বাচিত দ্বৈতীয়িক গবেষণাকর্ম (বাংলা) ও নির্বাচিত প্রবন্ধ। প্রাথমিক সূত্র হিসেবে সমকালীন রাজনীতিসংশ্লিষ্ট নারীদের আত্মজীবনী ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ডায়েরি ও চিঠি গবেষণার উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া সম্ভাব্যক্ষেত্রে প্রাপ্য সরকারী নথি পর্যালোচনা হবে।

গবেষণার সময়কাল :

এই গবেষণার সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯০৫ খৃ: থেকে ১৯৪৭ খৃ: পর্যন্ত। বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবিদার। গবেষণার শুরুর কাল হিসেবে ১৮৮৯ সনকে নির্ধারণ করা যেতো, এ বছর প্রথম কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে দুজন নারী প্রতিনিধি যোগ দেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ১৯০৫ সালটিকে বেছে নেয়া হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন শুরু হয় এবং এই সময় বৃটিশবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রথম জেগে উঠে বাঙালি নারীর ভেতর ব্যাপকভাবে দেশাত্ববোধের চেতনা ও বৃটিশবিরোধী রাজনৈতিক সচেতনতা যা শহরের শিক্ষিত শ্রেণীকে অতিক্রম করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ নারীসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

অপরপক্ষে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। জন্ম নেয় দুটি ভিন্ন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। অবিভক্ত বাংলার এক অংশ নিয়ে তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান ও অন্য অংশ সংযুক্ত হয় ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে। নারী কর্মীরা কেউ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে যান আবার কেউ ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। তাদের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন আদর্শ নিয়ে তাঁরা নতুন কর্মক্ষেত্রে জড়িত হন।

১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়ে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজের যে বহুমুখী ভূমিকা তা বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ের বিভাজন :

প্রথম অধ্যায় : নারীবাদী তত্ত্ব কাঠামোসমূহ বা Feminist Theory সমূহ এ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যে কোন নারী বিষয়ক গবেষণার পূর্বে নারীবাদী তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এতে করে নারীবাদী প্রেক্ষাপটে গবেষণা বিষয়টির যর্থাথতা নিরূপন সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : পটভূমি : বাঙালি নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা হঠাৎ তৈরি হয় নি, যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে ওঠে তা এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

তৃতীয় অধ্যায় : ১৯০৫ খৃঃ - ১৯১৯ খৃঃ :- নারীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা বিকাশের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে। এ সময়ে 'ব্রত পালন', 'অরন্ধন', 'রাখী-বন্ধন'- সহ অন্যান্য কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ সালে এই আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্যদিয়ে। ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত সময় ছিল নারীদের রাজনীতিতে প্রবেশের সময় বা রাজনৈতিক নারী হিসেবে তাদের যাত্রা শুরুর সময়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে সেই চেতনার ক্রমবিকাশের ধারায় পরবর্তী সময়ে নারীরা রাজনীতিতে যুক্ত হতে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায় : ১৯২০ খৃঃ-১৯২৯ খৃঃ :- ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং বিশেষভাবে নারীসমাজকে রাজনীতিতে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার নারীসমাজ প্রথম প্রকাশ্যে পুরুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় এই সময়কালেই বাংলার নারীরা সক্রিয়ভাবে বিপ্লববাদী আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে।

পঞ্চম অধ্যায় : ১৯৩০ খৃঃ-১৯৪১ খৃঃ :- ১৯৩০- এ গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলে নারীদের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা যুক্ত হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন অনুযায়ী নারীদের ভোটাধিকার ক্ষমতা প্রসারিত হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবস্থা পরিষদে একমাত্র নারীদের ভোটে নারী সদস্য নির্বাচিত করার অধিকার পাওয়া গেল। এই আইন অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৩৭ সালে। এই নির্বাচনকে নারী আন্দোলনের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করা যায়।১৯৩৭ এর পরবর্তী অধ্যায়কে বলা যায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুগ। ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস মহিলা সংঘ। এই মহিলা সংঘের মূল কাজ ছিল জাতীয় মুক্তিআন্দোলনে নারীদের সংগঠিত করা। ১৯৩৮ সন থেকেই ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে শুরু হয় রাজবন্দী মুক্তিআন্দোলন। ১৯৩৯-এ শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। একদিকে সাধারণ জনগণের মধ্যে শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, আরেকদিকে শুরু হয় সরকারী দমন-নিপীড়ন। এই পর্যায়ে কমিউনিষ্ট আন্দোলন জোরদার হয়। এই পুরো সময় জুড়ে দেখা যায় বাঙালি নারী তার প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা থেকে বের হয়ে এসে নতুন পরিচয় সন্ধানে ব্রতী হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ১৯৪২ খৃ:-১৯৪৭ খৃ: :- ১৯৪২ সনে বোম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত সাহায্য করবে না এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এ দেশ ছেড়ে চলে যাক। মহাত্মা গান্ধী এ প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যসহ বহু নেতা আটক হন। এ সময় সমগ্র ভারতে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। এই চল্লিশের দশকেই দেখা যায় জোরদারভাবে শুরু হয় কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন, যে আন্দোলনে কৃষক নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একদিকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে ভিন্নমাত্রা যোগ করে, অপরদিকে প্রান্তিক নারীর অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৩ সনে দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীদের সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় এই প্রান্তিক নারীর উত্থান।

সপ্তম অধ্যায় : উপসংহার। এই অধ্যায়ে গবেষণাকর্মের মূল সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

রাজনৈতিক আন্দোলনে নারী ঃ তত্ত্বকাঠামো

বর্তমান গবেষণাটি বৃটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলায় রাজনৈতিক নারীর উন্মেষ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণপূর্বক সামাজিক ইতিহাসের অংশ হিসেবে নারীর অবস্থান নির্ণয় বা পুনঃমুল্যায়নের প্রচেষ্টা। বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানে নারীবিষয়কে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণের প্রচলন হয়েছে, যা গবেষণা ক্ষেত্রে তৈরি করেছে একটি নতুন ধারা। ফলে যে কোন নারীবিষয়ক গবেষণার পূর্বে নারীবাদের সম্যক আলোচনা প্রয়োজন। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আদিম যুগের যাযাবর জনগোষ্ঠী যখন নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রচলন হয় তারপর থেকেই নারীরা পুরুষের অধস্তন হয়ে গৃহে আবদ্ধ জীবনযাপন শরু করে। আর এভাবেই যে কোন সমাজে নারীরা সমাজের মূলস্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[১] যার কারণ হিসেবে সমাজবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন নারীর অনুৎপাদনশীল গৃহস্থালীর কাজ করাকে। সাধারণত দেখা যায় যে, নারীরা গৃহস্থালীর যে কাজ করে তা থেকে কোন উপার্জন হয় না; যে কারণে অর্থনৈতিকভাবে নারীকে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। এভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুরুষের হাতে থাকায় অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতাও পুরুষের কুক্ষিগত হয় এবং নারীকে সর্বক্ষেত্রে হতে হয় তার অধীন। একপর্যায়ে এই অধস্তন অবস্থানে সে হয়ে ওঠে অভ্যস্ত।[২] নারীকে সমাজের মূলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্বের প্রচলন হয়েছে যা নারীবাদ বা Feminism হিসেবে পরিচিত। Helen Tierney সম্পাদিত "***Women's Studies Encyclopedia***" গ্রন্থে Feminism -এর যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, "Feminism affirms the value of women and women's contributions to social life and anticipates a future where barriers to women's full participation in public life will be removed." [৩] এই সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলা যায়, নারীবাদ একদিকে নারীর বিবিধ ভূমিকার মূল্যায়ন করে, অন্যদিকে সমাজে নারীর সর্ব্বোচ্চ ভূমিকা পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পথনির্দেশ করে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে নারীবাদের দুটি দিক আছে, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। জুডিথ অ্যাস্টেলারা তাঁর `***Feminism and Democratic Transition in Spain'*** গ্রন্থে নারীবাদকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন

> নারীবাদ হচ্ছে সামাজিক রূপান্তর ও আন্দোলনের লক্ষে একটি পরিকল্পনা যা নারী নিপীড়ন বন্ধ করার চেষ্টা করে। এই দুইপ্রকার উপাদানের মধ্যে নারীবাদ সবসময় ঐতিহাসিক সমাজের অংশ হিসেবে অবস্থান করেছে যে সমাজের মধ্যে এটা বিকশিত হয়েছেঃ নারীবাদ এর সমাজের নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। একটি আন্দোলন হিসেবে নারীবাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা কমবেশী সংগঠিত কিন্তু নারীকে নিম্নস্তরে

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে সবসময় তা সোচ্চার। এরূপ বিরোধিতা সামাজিক সংগ্রামের অন্যান্য ধরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং এই সম্পর্ক আন্দোলনের আদর্শ ও সংগঠন উভয়কেই প্রভাবিত করেছে।[৪]

যেহেতু নারীবাদের ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গি তাই নারীবাদের সর্বজনস্বীকৃত বা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নিরূপন করা দুরূহ বিষয়। তবে যে বিষয়টি বলা যায় তা হচ্ছে, নারীবাদ সমাজে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য এবং নিপীড়নের কারণ ও ফলাফল নির্দেশ করে এবং নারীর সর্বাঙ্গীন মুক্তি বা তার অধিকার নিশ্চিত করার পথনির্দেশ করে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ বা দৃষ্টিকোণ থেকে।[৫]

নারীবাদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ বা দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, মতবাদের ভিন্নতা থাকলেও সাধারণভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে সবাই একমত পোষণ করে। বিষয়সমূহ হচ্ছে : সমাজে নারীর অবদানকে সুনির্দিষ্ট করা এবং নারীর মূল্যায়ণ; পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীকে কীভাবে অবমূল্যায়ণ করে তা অনুধাবনে অতীতকে সমালোচনার দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা; সেক্স-জেন্ডার প্রত্যয় দুটির গঠনকৌশল বিশ্লেষণ যা পুরুষ এবং নারীর পার্থ্যক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং নারীদের মধ্যে যে পার্থক্যসমূহ রয়েছে তা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে, বিশেষত জাতি, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, শ্রেণি, বয়স, শারীরিক গঠন সহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ যার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে তার মেধা, চিন্তা - মননশীলতা ও অন্যান্য গুণাবলী বিবেচনা না করেই তাকে অবমূল্যায়ন করা বা বাতিল করা হয়; সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনে রীতিনীতি ও আচরণগুলি নারীর ভূমিকা, গুণাবলী ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবর্তনের জন্য সহমর্মীতার নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিস্কার করা; সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন আনার জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো যাতে করে নারীরা সমাজে পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে জনজীবনের অংশীদার হতে পারে।[৬]

প্রাচীন গ্রীস থেকে শুরু করে বিশ শতক পর্যন্ত নারীর বিষয় নিয়ে চলছে আলোচনা, তা থেকে বিকশিত হয়েছে নানান ভাবনা। এইসব চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যানধারণার ভিত্তিমূল ছিল প্রাচীন অ্যাথেনীয় গ্রীক দর্শন। গ্রীক মতবাদ অনুসারে নারী সম্পর্কিত যে তত্ত্বগুলি পাওয়া যায় তা হচ্ছে : প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষ ভিন্ন সত্ত্বার অধিকারী ও এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয়-রফার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষিত হয়; একইভাবে, নারী ও পুরুষের ভূমিকা পরস্পরের বিপরীত ও প্রকৃতি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী একে অন্যের সম্পূরক। সমাজের প্রয়োজনগুলিকে দুটি স্পষ্ট বিভাগে ভাগ করা যায় যা প্রকৃতির ও নারী-পুরুষের সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যার একটি বাইরের জগৎ বা বহিরাঙ্গণ পরিমণ্ডল, এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ ভারী শ্রমমূলক কাজ, সামরিক তৎপরতা এবং সমাজরক্ষা ও সামাজিক জীবনযাত্রা পরিচালনা – একাজগুলি পুরুষের জন্য নির্ধারিত। অন্যদিকে, গৃহ বা অন্তরাঙ্গণ পরিমণ্ডলের কাজে কম শক্তির এবং অনেক বেশী ভালবাসা, মমতা ও লালন-পালনের প্রয়োজন, কাজেই এ কাজগুলি মেয়েদের ওপর ন্যস্ত। পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে বহির্মুখী এবং অধিক শারিরীক শক্তি ধারণ করে, আর তাই তাদের জনসেবামূলক কাজ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা উপার্জন ও সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

কাজকর্মে নিয়োজিত হওয়াটাই যথার্থ। নারী প্রকৃতিগতভাবে অন্তর্মুখী। এই যুক্তিতে সে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলির আওতার বাইরে আর একই কারণে পারিবারিক ও জনগণের কাছে অপ্রকাশ্য নানা কর্মতৎপরতার ভার তার ওপর ন্যস্ত। গ্রীক দর্শন অনুসারে লোকপরিমণ্ডল নগর-জনপদগুলির অস্তিত্ব ও ঐ নগর-জনপদের অধিবাসীদের স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং এই পরিমণ্ডলের কাজকর্ম একান্ত ঘরোয়া পরিমণ্ডলের কাজগুলির তুলনায় অনেক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন, মহিমাময় ও গুরুত্বপূর্ণ। বলা চলে গ্রীক দর্শন অনুসারে পুরুষ অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিমান, সাহসী ও উৎকৃষ্টতর; অন্যদিকে নারী দুর্বল, অসম্পূর্ণ, যুক্তিবর্জিত ও নিকৃষ্ট।[৭] গ্রীক মূল্যবোধে, রাজনৈতিক সংগঠন কর্মের মানবীয় সামর্থ্যটি নারী সামর্থ্যের তুলনায় কেবল বিসদৃশই নয় বরং তা নারীর স্বাভাবিক অনুষঙ্গের সরাসরি বিপরীত। গ্রীক ধারণা অনুযায়ি, নারী নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকারগুলি তার তরফ থেকে পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ প্রয়োগ করবে।[৮]

নারী প্রশ্নে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো প্রথম একজন সত্যিকার আদর্শ নারীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত সেটি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *Republic*-এ বর্ণনা করেছেন। মূলত এই গ্রন্থে প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারীর অবস্থান কী হবে সে সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত ব্যাক্ত করেছেন। প্লেটো এমন একটা সমাজব্যবস্থার ধারণা দেন যেখানে মানবসমাজের বিশুদ্ধ চিত্রটি পাওয়া যাবে, যে সমাজে নারী-পুরুষ সবাই এক নিয়মের অধীনে একই ব্যবস্থার সুফল ভোগ করবে।[৯] প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ সমাজের শিক্ষা প্রসঙ্গে তার মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে, সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একই শিক্ষাব্যাবস্থা চালু থাকবে এবং উভয়ের সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য একই রকম হবে।[১০] প্লেটোর মতবাদে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে তিনি প্রতিটি মানুষের (ব্যক্তি পুরুষ বা নারী হিসেবে নয়) মেধা বিকাশের সমান সুযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, একইভাবে সমাজে কর্মবন্টনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রাধান্য দিয়েছেন। যে ব্যক্তি (পুরুষ বা নারী নয়) যে কর্ম সম্পাদনে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তিনি সেই দায়িত্ব পালন করবেন, ফলে নারী-পুরুষের কাজের পৃথক যে গণ্ডি তাকে তা দূর হবে। নারী-পুরুষের কাজের পৃথক গণ্ডিকে প্লেটো অযৌক্তিক মনে করেছেন।[১১]

রোম-এর ইতিাসে দেখা যায় যে প্রাথমিক যুগে রোমান নারীরা কোন ধরনের অধিকারই ভোগ করতেন না। ধীরে ধীরে রোমান সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে সেখানকার নারীদের অবস্থাও পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা কিছুটা সামাজিক অধিকার লাভ করে।[১২] রোমান নারীরা এসময়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার, চুক্তি করার এবং তালাকের জন্য মামলা দায়ের করার অধিকার লাভ করে।[১৩] তবে কিছু কিছু অধিকার পেলেও রোমান নারীদের সবসময়ে তাদের অভিভাবকের অধস্তন হয়ে থাকতে হতো। পিতাকেই অভিভাবক হিসেবে গণ্য করা হতো । অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিত কোন কিছু করার অধিকার রোমান নারীর ছিল না। প্রকৃত অর্থে রোমান নারীও ছিল পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রিষ্টীয় মতবাদের প্রাধান্য দেখা যায়। খ্রিষ্টীয় মতবাদে দেখা যায় বাহ্যিক ভাবে তা নারীর জন্য আধ্যাত্মিক মুক্তি ও অনন্য মর্যাদার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে তা ছিল নিরেট একটি পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ। খ্রিষ্টের মুক্তির বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক নারী তাদের দুরবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য খ্রিষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে।[১৪] খ্রিষ্টের শিষ্য ও খ্রিষ্টধর্মপ্রচারক সেন্ট পল বলেন, পুরুষ স্রষ্টার আদলে তৈরি আর নারী পুরুষের আদলে গড়া, তাই তিনি বিধান দেন পরিবারে নারীর ভূমিকা হবে অধঃস্তনের এবং সে থাকবে স্বামীর কর্তৃত্বের অধীনে। তিনি চার্চে নারীর অধিকারকেও অস্বীকার করেন।[১৫] বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশের দশটি বিধানেও দেখা যায় নারীর উল্লেখ রয়েছে দশম বিধানটিতে এবং সেখানে দাসদাসী ও গৃহপালিত পশুর সঙ্গে নারীকেও এক করে দেখানো হয়েছে।[১৬] খ্রিষ্টধর্মও তার পূর্ববর্তী অন্যান্য ধর্মের মতই নারীকে হেয় করে রেখেছিল। যার ভিত্তিতে নারীসমাজকে রাজনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মর্যাদার আসন থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সতেরো শতকের শেষভাগ থেকে আঠারো শতকের শুরুতে এই দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে থাকে, এসময়ে নারীর সামাজিক অবস্থান ও নারীর অধিকারের বিষয়গুলিতে প্রশ্ন ওঠে। যে বিষয়গুলি এই সামাজিক পরিবর্তনের সাথে জড়িত ছিল সেগুলি হচ্ছে, ইউরোপের নবজাগরণ (রেনেসাঁ),শিল্পবিপ্লব, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার উদার ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্ব ইত্যাদি। এ সময়ে দেখা যায় নারী নিজেও তার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

১৬৬২ সালে মার্গারেট লুকাস নামে একজন ওলন্দাজ নারীর একটি লেখা পাওয়া যায় 'ফিমেল ওরেশনস' নামে। এতে তিনি বলেন, " পুরুষ আমাদের বিরুদ্ধে দারুণ বিবেচনাহীন ও নিষ্ঠুর আচরণ করে, ওরা সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে কিন্তু আমাদের বেলায় অবরোধ সৃষ্টি করে মেয়েদের সাথেও মিশতে দেয় না। আমরা বাদুড় অথবা পেঁচার মতো বাস করি, পশুর মতো ভারবাহী জীব যেন আমরা। আমরা প্রতিনিয়ত পোকামাকড়ের মতো মৃত্যুবরণ করি।"[১৭]

১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে Mrs Hannah Woolley নামে একজন স্কুল শিক্ষিকা "*Gentlewomen's Companion*" নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যার সূচনায় তিনি বলেন

> The right education of the female sex, as it is in a manner everywhere neglected, so it ought to be generally lamented. Most in this depraved later Age think a women learned and wise enough if she can distinguish her husbands bed from anothers. Certainly Mans Soul cannot boast of a more sublime original than ours, they had equally their efflux from the same eternal immensity, and (are) therefore capable of the same improvement by good education. Vain man is apt to think we were meerly intended for the world's propagation, and to keep its human inhabitants sweet and

Dhaka University Institutional Repository

clean: but by their leaves, had we the same literature, he would find our brains as fruitful as our bodie's.[১৮]

যদিও লেখিকা তাঁর অভিযোগগুলি মেয়েদের কাছেই করেছিলেন, তবে এর মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিকতা, নারী-পুরুষের বৈষম্য, নারী-পুরুষের সমান মেধার বিষয়টি এবং নারীকে উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত রাখার বিষয়টি খোলাখুলিভাবে সকলের সামনে আসে। এই সময় দেখা যায় নারীশিক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পায় এবং ১৬৯৪ সালে মেরী অ্যাস্টেল তার "***A Serious Proposal to the Ladies for the Advancement of Their True and Greatest Interest***" বইটিতে প্রথম নারীর উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণের দাবী জানান।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত রয়েছে। প্রথমটি ১৭৭৬ সালে আমেরিকায় প্রণীত The Declaration of Independence ও দ্বিতীয়টি ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে প্রণীত The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen। ১৭৭৬ সালে আমেরিকা ইংরেজ দখলমুক্ত হতে থাকে, এ সময়ে "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র"-এর প্রণেতা John Adams -এর কাছে তার স্ত্রী Abigail Adams -এর লেখা Remember the Ladies শীর্ষক চিঠির মাধ্যমে নারীর নিজের অধিকার দাবির সূচনা হয় বলা যেতে পারে। এটি স্বামীর কাছে লেখা স্ত্রীর চিঠি না হয়ে বরং হয়ে উঠেছে একজন আইন প্রণেতার কাছে নারীজাতির পক্ষ থেকে পেশ করা দাবিনামা। তিনি আশা করেছেন, যে নতুন আইন প্রণয়নের সময়ে জন এডামস্ নারীদের কথা স্মরণ রাখবেন এবং তার পূর্বসূরীদের চাইতে তিনি নারীদের প্রতি অধিকমাত্রায় সংবেদনশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হবেন। তিনি স্বামীদের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদানের বিষয়ে নিষেধ করেন, যার কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে সকল পুরুষই সুযোগ পেলে নৃশংস ও জুলুমবাজ (এক্ষেত্রে তিনি Tyrants শব্দটি ব্যবহার করেছেন) হয়ে ওঠে। তিনি সতর্ক করে বলেন যে, যদি নতুন আইন নারীদের প্রতি যথার্থ যত্নবান না হয় তাহলে তাঁরা বিদ্রোহ করবেন এবং যে আইনে নারীদের কোন প্রতিনিধিত্ব থাকবে না বা নারীদের বলবার কোন সুযোগ থাকবে না, তেমন আইনের শাসন তারা মেনে নেবেন না।[১৯] নারীর আধিকারকে আইনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস বলা যায় এটিকে।

আঠারো শতকের শেষ দুই দশকে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব নামে খ্যাত রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সাম্য, স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ -এই মন্ত্রে দীক্ষিত এই আন্দোলনে ফ্রান্সের নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীরা শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের বিরোধিতাই করেন নি, একই সাথে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারের অবসান এবং নারীর অধিকারের দাবিও করেন। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তীকালে দেখা যায় ফরাসী সংসদে The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen গৃহীত হয় এবং পুরুষদের সীমিত ভোটাধিকার দেওয়া হয়। পুরুষতান্ত্রিক এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদী নারীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং জাতীয় পরিষদের সামনে সমাবেশ করে বলেন ''আপনারা অতীতের সকল কুসংস্কার দূর করলেও, সবচেয়ে ব্যাপক ও প্রাচীনতম কুসংস্কারটি বহাল থাকতে দিয়েছেন। এর ফলে গোটা দেশের অর্ধেক মানুষ রাষ্ট্রীয় পদ, অবস্থান, সম্মান ও সর্বোপরি আপনাদের মাঝে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।''[২০] অন্যতম ফরাসী নারীনেত্রী অলিমপি দ্য গোজ এসময়ে রচনা করেন The Declaration of the Rights of Women and of the Female Citizen । প্রাথমিকভাবে নারীদের এই অধিকারের ঘোষণাপত্র বিরোধিতার সম্মুখিন হলেও শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয় এর কিছু কিছু প্রস্তাব মেনে নিতে। এর মাধ্যমে ফরাসী মহিলারা যে কয়েকটি অধিকার লাভ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবার অধিকার; বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা শুরু করবার অধিকার; অবৈধ সন্তানের স্বীকৃতি; ও বংশানুক্রমিক আইনের ক্ষেত্রে নারীদের স্বীকৃতি।[২১] এই আইনের মাধ্যমে নারীরা তাদের জীবনের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ পেল। বিশেষত ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে বিয়ে করবার অধিকার ও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার নারীমুক্তির পথে বিশেষ অর্জন বলা চলে।

উনিশ শতকে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দর্শনচর্চার প্রচলন শুরু হলে এর প্রভাবে নারীমুক্তির প্রশ্নটিও সামনে এসে পরে এবং নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রসঙ্গটি বিভিন্ন লেখায় উঠে আসতে থাকে। এসময়ের দাবিদাওয়া ছিল মূলত নারীর জন্য পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার। বিশ শতকে এসে নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা নারী-পুরুষের বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে নারীর অধঃস্তন অবস্থার জন্য দায়ী করেন।

বিভিন্ন স্তরে নারীবাদী ধ্যানধারণা বিকাশের সময়ে গড়ে ওঠে নারীবাদের বিভিন্ন ধারা। নারীবাদের প্রধান ধারার মধ্যে পাওয়া যায় : উদারনৈতিক নারীবাদ; মার্ক্সীয় নারীবাদ ; সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ; বৈপ্লবিক নারীবাদ; সাংস্কৃতিক নারীবাদ; পরিবেশ প্রধান নারীবাদ এবং উত্তরাধুনিক নারীবাদ।

উদারনৈতিক নারীবাদ

উদারনৈতিক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী নারীবাদীরা ছিলেন তাদের সময়ের এবং সমাজের প্রগতিশীল ধ্যানধারণার অধিকারী বুদ্ধিজীবি শ্রেণির সদস্য। এরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, একমাত্র যুক্তিই পারবে মানবসমাজকে একটি উন্নততর সমাজব্যবস্থায় নিয়ে যেতে এবং সকল কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে যা মানবতার পথে একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।[২২] উদারনৈতিক নারীবাদ অনুসারে সামাজিক রীতিনীতি ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত আইনব্যবস্থা নারীর পশ্চাদপদতার কারণ। পুরুষ নারীর চাইতে দৈহিক শক্তিতে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে সবল- সমাজের এই প্রচলিত বিশ্বাস নারীর যথাযথ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং নারীকে জনজীবনে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। উদারনৈতক নারীবাদীরা সমাজের কল্যাণার্থে নারীর জন্যও

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা দাবি করেন যাতে করে নারীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের মতন যোগ্যতা ও সফলতা অর্জন করতে পারে।[২৩] উদারনৈতিক নারীবাদীদের উত্থাপিত দাবির মধ্যে ছিল নারীর শিক্ষার অধিকার, নারীর ভোটাধিকার, আইনি অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবার অধিকার। উদারনৈতিক মতবাদের প্রধার বৈশিষ্ট্য হলো, দাবি বা অধিকার আদায়ে কোন বৈপ্লবিক পথের কথা এখানে বলা হয় নি, এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যুক্তি এবং শিক্ষাকে। তারা শিক্ষাকে মানবসমাজের সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখেছেন এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা এবং যুক্তির যথার্থ চর্চাই নারী-পুরুষ উভয়কেই প্রকৃতপক্ষে মুক্ত করতে পারে।[২৪]

এই মতবাদে বিশ্বাসী নারীবাদীদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন মেরী ওলস্টোনক্রাফট, জন স্টুয়ার্ট মিল, ফ্রান্সিস রাইট, হেরিয়েট টেইলর, বেটি ফ্রায়ডান প্রমুখ। এই মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বিদ্যমান সমাজকাঠামোর মধ্যেই নারীর সমান অধিকার দাবি করে। নারীর জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ এই মতবাদে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করেছে।

মেরী ওলস্টোনক্রাফট প্রধানত নারীর সকল দুর্দশার জন্য নারী-পুরুষের অসম শিক্ষাব্যবস্থা এবং পুরুষ নিয়ন্ত্রিত অধস্তনতার শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন।[২৫]

তিনি নারীজাতির দুর্দশার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সমাজে নারী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে। তিনি বলেন নারীর গুণাবলী সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত ধারণা (Mistaken notations of female excellence) দ্বারা নারীরা প্রভাবিত হয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পরে। প্রচলিত সামাজিক ধ্যানধারণা নারীকে বিশ্বাস করতে সেখায় যে নারীর প্রকৃতি হচ্ছে কোমল, সে হবে ধৈর্যশীল, মমতাময়ী। এসব গুণাবলীকে সমাজ নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয় এবং একজন নারীসমাজে আদর্শ নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য এসব গুণাবলী অর্জন করাই তার লক্ষ্য বলে মনে করে।

মেরী নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে রুশো যে মতামত দিয়েছে তার একান্ত বিরোধিতা করেছেন। রুশো নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। রুশোর যুক্তি ছিল নারী প্রকৃতি পুরুষের মত শিক্ষাগ্রহণের যোগ্য নয়। নারী তার সমাজ নির্ধারিত গুণাবলী অর্জন করবে এবং তাতেই সে পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, কেননা পুরুষ তার নিজ প্রকৃতির বিপরীত নারীকেই পছন্দ করে। মেরী রুশোর এই যুক্তি খণ্ডন করে বলেন যে, বৈষম্যমূলক শিক্ষা নারীকে কখনই পুরুষের উপযুক্ত সহধর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না। এতে করে নারী সমাজের বোঝা হয়েই থাকে।

মেরী মনে করেন, মানবতাকে আরো মহৎ হতে হলে নারী-পুরুষ উভয়কে সমান অবস্থানে থেকে একই নীতিতে কাজ করতে হবে। এবং এটা কখনই সম্ভব হবে না যদি কেবল পুরুষদেরকে এ কাজের যোগ্য করে তোলা হয়। এজন্য নারীকে অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যমে তাদের যথাযথ গুণাবলী অর্জনের অধিকার দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মেরী নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীর অধিকার অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তার আর্থিক সচ্ছলতা।

মেরী নারীকে শুধু পারিবারিক দায়িত্বে আবদ্ধ না থেকে নাগরিক দায়িত্ব (civil duties) পালনে যত্নশীল হতে পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ এর মাধ্যমেই সে নিজেকে সমাজের জন্য অধিক যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

A Vindication of the Rights of Woman গ্রন্থের সমাপ্তি টানতে মেরী বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারীকে যুক্তিবাদী প্রাণি এবং স্বাধীন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যাতে তারা আদর্শ মা এবং স্ত্রী হয়ে উঠতে পারে, আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন পুরুষ পিতা এবং স্বামী হিসেবে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।[২৬]

মেরীর বক্তব্য বিশ্লেষণে তাঁর মতবাদের সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখা যায় তিনি সমাজে নারীর সনাতন ভূমিকা (মা এবং স্ত্রী হিসেবে) অস্বীকার করেন নি। বরং সমাজের কল্যাণের জন্য নারীকে তার ভূমিকা যথাযথ পালনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, এর জন্য নারীর সুশিক্ষাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মেরী ওলস্টোনক্রাফট তার ***A Vindication of the Rights of Woman*** গ্রন্থটি রচনা করেন ১৭৯২ সলে। পরবর্তী সময়ে ১৮৬৯ সালে তাঁর সমমতের একজন তাত্ত্বিকের নারীবাদী রচনা পাওয়া যায় যিনি পুরুষ হয়েও নারীর জন্য সমান অধিকার এবং বিশুদ্ধ সাম্য দাবি করেন। জন স্টুয়ার্ট মিল তার 'দ্যা সাবজেকশন অব উইমেন' গ্রন্থের শুরুতেই সমাজে প্রচলিত নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির বিরোধিতা করে বলেন, "That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes – the legal subordination of one sex to the another – is wrong in itself, and now one of the chief hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other." প্রথমেই মিল সামাজিক রীতিনীতির বিরোধিতা করেছেন, যার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, যেহেতু নারীসমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই নারীকে তার অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করলে তা কেবল নারীর জন্যই কল্যাণকর হবে না বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্যই কল্যাণকর হবে।

পুরুষতন্ত্র ঘোষণা করে যে নারীর ওপর পুরুষের যে আধিপত্য তা নারীরা স্বেচ্ছায় মেনে নেয় এবং এর বিরুদ্ধে খুব কম নারীই অভিযোগ করে থাকে। এই বক্তব্যের বিপরীতে মিল যুক্তি দেন, এটি আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হলেও প্রকৃত সত্য নয়। তিনি বলেন অনেক নারীই পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের প্রকাশ্য বিরোধিতা করছেন তাদের লেখনির মাধ্যমে। তিনি তার মতবাদে বলেন, কোনো পরাধীন শ্রেণীই দীর্ঘকাল যে শক্তির অধীনে থাকে সরাসরি সেই শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় না বরং প্রতিবাদ জানায় তার পীড়নের বিরুদ্ধে, যে

Dhaka University Institutional Repository

কারণে নারীরা পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না, প্রতিবাদ করে তাদের স্বামীদের পীড়নের বিরুদ্ধে। মিল একে বলেছেন প্রকৃতির রাজনৈতিক বিধান (political law of nature)।

প্রকৃতিগতভাবেই নারীরা দুর্বল ও পুরুষেরা সবল, কাজেই দুর্বল সবলের অধীন থাকবে – এটাই প্রকৃতির নিয়ম, পুরুষতন্ত্রের এ দাবীকে মিল পুরোপুরি অস্বীকার করে বলেন যে,নারী-পুরুষের যথার্থ প্রকৃতি জানবার মতো কোনো বিজ্ঞানসম্মত পন্থা যেহেতু নেই তাই লৈঙ্গিক ভিন্নতার কারণে জৈবিকভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তা eminently artificial thing। নারী-পুরুষের মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা বলা হয় তাও পুরুষতন্ত্রের সৃষ্টি এবং প্রথাভিত্তিক।

মিলের মতে পুরুষতন্ত্র নারী ও পুরুষের জন্য দুটি পৃথক কর্মক্ষেত্র তৈরি করে এবং নারীর জন্য বরাদ্দ করে গৃহের অন্তঃপুর ও পুরুষের জন্য বাইরের বিশ্ব। বাইরের বিশ্বের কাজের জন্য নারী অযোগ্য নয় বরং পুরুষই তাকে সেই যোগত্যা প্রমাণের সুযোগ দেয় নি। যেহেতু তাদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দেয়া হয় নি তাই বলা যাবে না যে নারী অযোগ্য। নারীকে পুরুষের সমান হবার জন্য সবধরনের পেশায় অংশগ্রহণ করা জরুরী। মিলের মতে, নারীমুক্তির লক্ষে নারীর জন্য শিক্ষা ও শিক্ষালাভের অধিকারের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেরীর অনুরূপ মিল ও অভিমত প্রকাশ করেন যে, পুরুষতন্ত্র নিপীড়নের মাধ্যমে নয় বরং তার উদ্ভাবিত শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে নারীকে পুরুষের একান্ত অনুগত ও প্রিয় দাসী হিসেবে গড়ে তোলে। শিশুকাল থেকেই নারীকে শেখানো হয় যে, তাদের প্রকৃতি পুরুষের বিপরীত; নারীরা নিয়ন্ত্রণ করবে না, তারা আত্মসমর্পণ করবে অন্যের নিয়ন্ত্রণের কাছে, তার থাকবে না নিজের কোনো ইচ্ছাশক্তি। এভাবেই নারী হয়ে ওঠে ভীরু এবং বশ্যতাপরায়ন। মিল পুরুষতন্ত্রের এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে অবস্থান করেন। তিনি এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন।

মা ও স্ত্রী হিসেবে নারীর সমাজ নির্ধারিত যে ভূমিকা রয়েছে মিল তাকে সর্বজনীন সত্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন কারণ হিসেবে তিনি বলেন নারী তার এই ভূমিকাকে সানন্দে মেনে নেয় কিনা তা বলা যায় না, কারণ নারীকে অন্য কোন পেশা বা ভূমিকা স্বাধীনভাবে বেছে নেবার সুযোগ দেয়া হয় না। তার সামনে একটিমাত্র পথ খোলা থাকে তা হচ্ছে বিয়ে। তিনি বিয়েকে সাম্যের ভিত্তিতে (equal conditions) প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দাবি জানিয়েছেন। যে সব নারীদের পক্ষে সম্ভব তাদেরকে মিল বিয়ে ব্যতীত অন্য যে কোনো পেশা বেছে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তিনি নারীর বিবাহবিচ্ছেদ ও নারীর পুনর্বিবাহের অধিকার দাবী করেছেন।

নারীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকারকে মিল সমর্থন করে বলেন বিয়ের পূর্বে পুরুষ ও নারী যে সম্পত্তির অধিকারী থাকে বিয়ের পরও সেই সম্পত্তি তারই থাকবে। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মিল নারীকে সব ধরনের পেশা ও ভূমিকা প্রদানেরই সুপারিশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে মিল সুস্পষ্টভাবে তার অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, যদি রাজনীতিতে অংশ নেবার জন্য যোগ্যতাকে মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয় তবে যোগ্য পুরুষের পাশাপাশি যোগ্য নারীকেও সেই সুযোগ দিতে হবে, একইভাবে অযোগ্য নারীর মত অযোগ্য পুরুষও এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। মিলের দৃষ্টিতে, যে যুক্তিতে পুরুষরা ভোটাধিকার পায়, একই যুক্তিতে নারীদেরও ভোটাধিকার থাকা উচিত।[২৭]

মিলের নারীবাদী চিন্তা বিশ্লেষণে দেখা যায় পরিবার ব্যবস্থাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবার থেকেই নারী নিপীড়নের সূত্রপাত ঘটে। মিল পরিবারপ্রথা পুনর্গঠনের সুপারিশ করেছেন, তিনি পরিবারপ্রথা বিলুপ্তির পক্ষে মত দেন নি। এক্ষেত্রে মিলের চিন্তার স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি একদিকে নারীর স্বাধীনভাবে কোনো পেশা পছন্দ করার বিষয়ে মত দিয়েছেন আবার গৃহের মধ্যে নারীকে মাতৃত্বের গুণাবলীতে দেখতে চেয়েছেন, কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক পিতার চেয়েও গভীর এবং সন্তানের শিক্ষায় মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এভাবে কার্যত মিল শেষ পর্যন্ত নারীর সনাতন ভূমিকাকেই পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছেন। তবে অবশ্যই তিনি নারীর অবস্থানের উন্নতি ও নারীর জন্য সাম্য ও সমঅধিকারের কামনা করেছেন।

উদারনৈতিক নারীবাদী ফ্রান্সিস রাইট নারীদেরকে যুক্তি ও বাস্তবসম্মত চিন্তাধারা গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন সামাজিক রীতিনীতি, ধ্যানধারণা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নারীকে অধস্তন করে রাখে। কেবল যুক্তি ও বাস্তব চিন্তার মাধ্যমেই নারী এসব বিষয়ের উর্দ্ধে উঠে কোন বিষয়কে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে।[২৮]

অপর উদারনৈতিক নারীবাদী তাত্ত্বিক সারা গ্রিমকে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করার জন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে উল্লেখিত নারীর ভূমিকার প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে নারীরা সমাজে তার সৃষ্টিকর্তা নির্ধারিত ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন নারীরা সৃষ্টিকর্তা নির্ধারিত ভূমিকা পালন না করার ফলে বিশ্বে নানা ধরনের দ্বন্দ্বের উদ্ভব হচ্ছে।[২৯] তিনি পুরুষ কর্তৃক ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করার বিরোধিতা করে বলেন, "My protest against the false translation of some passages by the men who did that work, and against the perverted interpretation by the men who undertook to write commentaries thereon." [৩০]

তিনি যুক্তি দেখান যিশু নারী-পুরুষ সবার জন্য একই পথ নির্দেশ করেছেন, এবং নারী-প্রকৃতি ও পুরুষ প্রকৃতি বলে যে পার্থক্য করা হয় তা পুরোপুরি অখৃষ্টীয় পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্য। তিনি বলেন পুরুষের যুদ্ধ নারীর মেধা, মনন, এবং আত্মার বিরুদ্ধে এবং পুরুষ নারীর নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয়।[৩১] তিনি নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে পুরুষ নারীর চাইতে দুর্বল পুরুষে এই যুক্তির বিরোধিতা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য উদারনৈতিক নারীবাদীর মতো গ্রিমকে নারীর শিক্ষার ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বারোপ করেন এবং পুরুষতন্ত্র নির্ধারিত নারীশিক্ষার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন শিশুর নৈতিক এবং মানসিক বিকাশে নারীর প্রভাব বেশি দেখা যায়, একারণে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে তৈরি হতে হবে মা এবং বোন হিসেবে তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য।[৩২]

উনিশ শতকের অপর দুজন উদারনৈতিক চিন্তার নারীবাদী এলিজাবেথ কেডি স্টানটন এবং সুসান বি অ্যান্টনী তাদের মতাদর্শে শিক্ষার পাশাপাশি নারীর ভোটাধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এলিজাবেথ কেডি স্টানটন ভোটাধিকারহীন নারীর অবস্থাকে " Taxation without Representation" হিসেবে বর্ণনা করেন।[৩৩] সুসান বি অ্যান্টনী মনে করেন, ভোটাধিকার হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক অধিকার, যা নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব এবং পরিবারে নারীর দাসত্বের অবসান ঘটাবে।[৩৪]

উদারনৈতিক নারীবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেটি ফ্রাইডান তার ***The Feminine Mystique*** (1963) এবং ***The Second Stage*** (1981) নামক দুটি গ্রন্থে নারীবাদী চিন্তা তুলে ধরেছেন। ফ্রাইডান *The Feminine Mystique* গ্রন্থে নারী সংক্রান্ত যে মৌলিক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেছেন সেটি হলো: কেন নারীরা বিয়ে আর সন্তানধারণকে তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করে ? তাঁর দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে ক্ষমতাহীন সেক্স শ্রেণি এবং পুরুষকে ক্ষমতাবান সেক্স শ্রেণি। তিনি নারীদের নিজেদের চেষ্টা দ্বারা পুরুষের মতো ক্ষমতাবান সেক্স শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত হতে পরামর্শ দেন।[৩৫]

ফ্রাইডান মনে করেন সনাতন ভূমিকা পালন থেকে মুক্ত হবার জন্য নারীকে গৃহের বাইরে কাজ করা উচিত। তিনি বলেন, নারীরা শিক্ষালাভ করে ঘরের বাইরে উৎপাদনী ক্ষেত্রে তাদের শ্রমকে যদি কাজে না লাগায় তাহলে তাদের মধ্যে মারাত্মক হতাশার সৃষ্টি হবে। তিনি নারীর গৃহে দায়িত্ব পালনের সাথে বাইরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন দ্বন্দ্ব খুজে পান নি। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, ''আপনার পরিচয় ক্ষমতা এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ এই নয় যে আপনি কোন পুরুষকে ভালবাসবেন না বা আপনাকে ভালবাসবে না কিংবা আপনার সন্তানদের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেবেন।''[৩৬]

ফ্রাইডান ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে নারী-পুরুষের দায়িত্ব বণ্টন ও পুরুষের অংশগ্রহণ দাবী করেছেন এবং শিশুর রক্ষণাবেক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা কামনা করেছেন।[৩৭]

এই পর্যায়ের অন্য দুই নারীবাদী তাত্ত্বিক র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস ও সুসান মোলার ওকিন নারীর গুণাবলী বিকাশের জন্য সমান সুযোগ এবং পরিবারে নারী-পুরুষের সমান দায়িত্ব বণ্টনের কথা বলেছেন। নারীর জন্য শিক্ষার সুযোগ ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণে তাঁরাও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।[৩৮]

উদারনৈতিক নারীবাদের তত্ত্ব বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে এই মতবাদে বিশ্বাসী নারীবাদীরা প্রধানত নারীর জন্য সমানাধিকার দাবি করেন, বিশেষত নারীর জন্য শিক্ষার অধিকারের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বলাভ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। এই মতবাদ পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে না গিয়ে বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই নারীর অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছে। পরবর্তীতে বেটি ফ্রাইডান, র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস ও সুসান মোলার প্রমুখ নারীবাদী শুধুমাত্র সমানাধিকার নয় বরং রাষ্ট্রের আনুকূল্যে নারীর জন্য সকল কল্যাণকর ব্যবস্থা এরা দাবি করেছেন।

মার্ক্সীয় নারীবাদ

নারীর দাসত্বের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস্ উনিশ শতকের মধ্যভাগে যে নারীবাদী তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন তা মার্ক্সীয় নারীবাদ হিসেবে পরিচিত। মার্কসবাদ অনুসারে শোষণভিত্তিক, শ্রেণিভিত্তিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে পরিবার আর নারীকে পরিবারের মধ্যেই পুরুষের অধীন হয়ে থাকতে হয়। এভাবে মার্কস শ্রেনিশোষণের সঙ্গে নারী শোষণের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন এবং শ্রেনিশোষণের অবসানের মধ্যদিয়ে নারীর মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। মার্কসবাদী তত্ত্বের মূল সূত্র হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রাচীন যুগ থেকেই মানব সমাজে নারীজাতি পুরুষের অধীন এবং ভবিষ্যতেও থাকবে–প্রচলিত এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মার্কসবাদ ইতিহাস বিশ্লেষণ করে যুক্তি দেয় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন সমাজে মানুষের মধ্যে শোষক-শোষিত শ্রেণিবিভাগ হয় নি তখন নারী-পুরুষ সমানাধিকার ভোগ করতো। এসময়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চালু ছিল এবং সমাজে নারীর কর্তৃত্বও বিরাজমান ছিল কেননা সামাজিক উৎপাদন (চাষাবাদ)-এর উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন এক শ্রেণির মানুষ অন্য শ্রেণির মানুষের উপর অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করে তখন থেকেই নারীকে ক্রমশ উৎপাদনশীল কাজ থেকে সরিয়ে গৃহকর্মের অনুৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ দেয়া হয় এবং গৃহঅভ্যন্তরে নারীকে পুরুষের অধীনস্ত করা হলো। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব এক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। মানুষ যখন কৃষিভিত্তিক উৎপাদন শুরু করে তখন থেকে কিছু কিছু সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকত এবং তা ধীরে ধীরে পুরুষদের মালিকানায় চলে যায়। মার্কস ও এঙ্গেলস বিষয়টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, সামাজিক উৎপাদনের উপর সে দলের কর্তৃত্ব থাকে যে দল উৎপাদন কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যেহেতু চাষাবাদের প্রাথমিক স্তরে নারীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করত, তখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও সমাজে নারীর কর্তৃত্ব বজায় ছিল। পরবর্তী সময়ে পশুপালনের যুগে দেখা যায় উৎপাদনের প্রধান যন্ত্র ছিল বর্শা দড়ির ফাঁস, তীর-ধনুক।[৩৯] এসময়ে উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে পুরুষ এবং সমাজে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়; ফলে ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে পুরুষকেন্দ্রিক পরিবার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হচ্ছে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি মাতৃবংশের পরিচয়ে পরিচিত হতো। এবং কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি তার মাতৃগোষ্ঠীর লোকেরাই অধিগ্রহণ করতো, তার পুত্রকন্যাদের এক্ষেত্রে কোন অধিকার থাকত না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার পুরুষের হাতে যাবার পর শুরু হল উত্তরাধিকার আইন বদল করা এবং উচ্ছেদ হলো মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ফ্রেডারিখক এঙ্গেলস্

Dhaka University Institutional Repository

জননীবিধি উচ্ছেদকে নারীজাতির চূড়ান্ত পরাজয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৪০] উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের ফলে স্ত্রীর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য এবং সন্তানদের পিতৃত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজন হয় নারীকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীনে রাখা, একবিবাহ প্রথার উদ্ভব হয় হয় এভাবেই। এঙ্গেলস একে বলেছেন নারীর ওপর পুরুষ প্রাধান্যের রূপ।[৪১] একবিবাহ প্রথায় নারী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার হারায়। পুরুষ বৈধ স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর সাথে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। অর্থাৎ একবিবাহ প্রথা শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়। পুরুষের কাছে নারীর বশ্যতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ এই একবিবাহ প্রথা।[৪২] ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে আধুনিক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হলে, দরিদ্র নারীদের একটি বড় অংশ কলকারখানায় কাজ করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে নারীরা সামাজিক উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এঙ্গেলস্ -এর মতে যদিও নারীদের কর্মসংস্থানের ফলে নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত হবে তথাপি এটি বর্তমান পরিবারপ্রথার উপর প্রভাব ফেলবে এবং পরিবারপ্রথা ভেঙ্গে পরবে। তিনি বলেন, " আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবারগুলি প্রকাশ্যেই হোক আর প্রচ্ছন্নভাবেই হোক, নারীর দাসত্বের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে ...আর বর্তমান সমাজটাই হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুকেন্দ্র স্বরূপ ব্যক্তিগত পরিবারের সমষ্টি ... নারীর মুক্তিলাভের প্রথম শর্তই হলো এই যে, সমগ্র নারীসমাজকে আবার সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করতে হবে। আর তারই ফলে বর্তমানে যে ধরনের ব্যক্তিগত পরিবারগুলি সমাজের অর্থনৈতিক অনুকেন্দ্র হিসেবে রয়েছে সেগুলি তার পূর্বেকার বৈশিষ্ট্য হারাবে।"[৪২]

মার্ক্সীয় নারীবাদ অনুসারে, ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া আইনে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কাজের অধিকার স্বীকৃত হবার ফলে কিছুসংখ্যক নারী ঘরের বাইরে বের হয়ে আসতে শুরু করে। শুধুমাত্র নিম্নস্তরের নারীরাই নয় বরং সমাজের সবস্তরের নারীরাই উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে। তবে এই চিত্র সমাজের ক্ষুদ্র অংশের জন্য প্রযোজ্য। নারীসমাজের বৃহৎ অংশ তখনও পুরাতন সামন্ত্রতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবারের সনাতন নারীর ভূমিকাতেই রয়ে যায়। এঙ্গেলস্-এর মতে পরিবারের মধ্যে পুরুষ হচ্ছে বুর্জোয়া আর নারী সর্বহারা।[৪৩]

মার্কস্- এঙ্গেলস্-এর মতবাদ অনুসারে পুঁজিবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিবারব্যবস্থা তার বৈশিষ্ট্য হরাবে, নারী-পুরুষ সমান অধিকার পাবে, সমানভাবে উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে। তাদের দাম্পত্য জীবন হবে সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থনৈতিক দাসত্বমুক্ত। এভাবেই নারী মুক্ত হবে পুরুষের দাসত্ব থেকে।[৪৪] এই মতবাদ অনুসারে, সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির সঙ্গে নারীসমাজের মুক্তির বিষয়টি জড়িত। মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, পুঁজির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্তির মাধ্যমে অবসান ঘটবে শ্রেণি শোষণের, শ্রেণিশোষণের অবসানের মাধ্যম্যে অবসান হবে নারীশোষণ এবং পীড়নের। মার্ক্সীয় নারীবাদ পুঁজিতন্ত্রের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে নারীমুক্তির উপায় হিসেবে নির্ণয় করেছে।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ

নারীবাদী এলিসন জগার সমাজতান্ত্রিক নারীবাদকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে : '' উদার নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে নারীরা নিপীড়িত হয় কারণ তারা অন্যায় বৈষম্যের শিকার; গতানুগতিক মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন যে নারীরা উৎপাদন পক্রিয়া থেকে বঞ্চিত বলে নিপীড়িত হয়; প্রগতিবাদী নারীবাদীরা মনে করেন যে নারীর যৌন ও প্রজনন ক্ষমতার ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণের ফলে নারীরা নিপীড়িত হয়; কিন্তু সমাজতন্ত্রী নারীবাদীরা মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের সংশোধিত ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নারী নিপীড়ন ব্যাখ্যা করেন।''[৪৬] কাজেই বলা যায় যে, মার্ক্সীয় মতবাদের মূল বিষয়গুলি গ্রহণ করে তাতে সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন করে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের উদ্ভব ঘটে। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের মতে পিতৃতন্ত্র কেবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত নয় বরং এর সাথে আরো অনেক কার্যকারণের যোগসূত্র রয়েছে। মার্কস্‌বাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সাথে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে বলে যে মত প্রকাশ করা হয় সমাজতন্ত্রীরা তার বিরোধিতা করেন বরং তারা মনে করেন মার্কসবাদীরা, পরিবার, প্রজনন ও গার্হস্থ্য শ্রমের মত ক্ষেত্রগুলিকে উপেক্ষা করে গেছেন।[৪৭] সমাজতান্ত্রিক জিলা আইজেনস্টাইন নারীশোষণের দু'টি মুখ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন পুরুষ আধিপত্য ও পুঁজিবাদকে। সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলেও পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় নারীশোষণ অব্যাহত থাকে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।[৪৮] সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা নারী নিপীড়নকে ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি তত্ত্ব প্রদান করেছেন, একটি দ্বৈত ব্যবস্থা তত্ত্ব ও অপরটি একীভূত ব্যবস্থা তত্ত্ব।

দ্বৈত-ব্যবস্থা তাত্ত্বিকেরা বলেন পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্র এ দুটি কাঠামো যখন পরস্পর সংযুক্ত হয় তখন চূড়ান্তভাবে নারীনিপীড়ন ঘটে।[৪৯] তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, নারীর ওপর শোষণ ও বৈষম্যের উৎস হচ্ছে দুটি : বস্তুগত কাঠামো (অর্থনৈতিক); উপরি কাঠামো (পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো)। আর দু'টির কোনটির উপরই নারীর নিয়ন্ত্রণ নেই।[৫০] সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী জুলিয়েট মিশেল মনে করেন কিছুটা অর্থনৈতিক, কিছুটা দৈহিক-সামাজিক এবং কিছু আদর্শিক উপাদানের সংমিশ্রনে নারীজীবন গঠিত। তিনি নারীমুক্তির জন্য উৎপাদনের ধরণ পরিবর্তনের সাথে সাথে দৈহিক, সামাজিক ও আদর্শগত উপাদানের পরিবর্তনের উপরও জোর দিয়েছেন। মিশেল এমন একটি সমাজ-গঠনের কথা বলেছেন, যে সমাজের ভিত্তি হবে নানামুখী সম্পর্ক, যেখানে যৌনতা ও প্রজনন পরস্পরের সম্পর্কিত নয় এবং যেখানে শুধু যৌনতার কারণেই চিরাচরিত বিবাহপ্রথার প্রয়োজন অনুভূত হবে না। মিশেল মনে করেন অর্থনৈতিক বিপ্লবের মতো বিপ্লব না ঘটলে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন হবে না, কেননা নারীর নিপীড়নের মূল কারণ মানবসমাজের মনস্তত্ত্বে নিহিত রয়েছে। মিশেল পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিবাদ-দু'ইয়ের উচ্ছেদ কামনা করেছেন।

তাত্ত্বিক হিডি হার্টম্যান এর মতে নারীবাদী বিশ্লেষণের মূল বিষয় হচ্ছে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, যা মার্কস্‌বাদে অনুপস্থিত। মার্কস্‌বাদের আলোচনায় শ্রমজীবি নারী স্থান পেয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সব নারী শ্রমজীবি নয় কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্য এবং নিপীড়নের শিকার।[৫৯] পুরুষতন্ত্রের সংজ্ঞায় তিনি বলেন, '' পুরুষদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের একটি সেট, যার বস্তুগত ভিত্তি আছে এবং যদিও এটা পদক্রমিক তথাপি তা পুরুষদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা ও সৃষ্টি করে, যা তাদেরকে নারীর ওপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম করে।''[৫১] তিনি অভিমত দেন শ্রমশক্তির ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণহীনতা নারীনিপীড়নের প্রধান কারণ।

একীভূত ব্যবস্থার তাত্ত্বিকেরা পুঁজিবাদ ও পুরুষতন্ত্রকে এক ও অবিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখেছেন। ইরিস ইয়ং একিভূত ব্যবস্থার অন্যতম প্রবর্তক। তিনি মার্কসীয় তত্ত্বের শ্রেণিবিভাজন অপেক্ষা শ্রমবিভাজনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে শ্রেণিবিশ্লেষণ উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদন সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে। অপরপক্ষে শ্রমবিভাজন উৎপাদনের সাথে জরিত ব্যক্তিদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি মত দেন যে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুঁজিবাদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে নারীনিপীড়নের মূল কারণ উদঘাটন করা সম্ভব।[৫২]

মার্ক্সীয় নারীবাদ ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বিলোপে সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের কথা বলে।

বৈপ্লবিক নারীবাদঃ

বৈপ্লবিক নারীবাদীরা নারী-পুরুষের জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে প্রজনন সম্পর্কের ভিত্তিতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন নারীর অধস্তনতার জন্য দায়ী।[৫৩] সিমোন দ্যা বোভয়ার বৈপ্লবিক নারীবাদের প্রবক্তা বলা চলে। "***The Second Sex***" গ্রন্থে তিনি তাঁর নারী বিষয়ক চিন্তা চেতনা তুলে ধরেন। তিনি প্রথম যে জিজ্ঞাসাটি সামনে আনেন তা হচ্ছে 'নারী কী?' (What is a woman?) তিনি বলেন একজন পুরুষকে কখনই বলতে হয় না আমি একজন পুরুষ, কিন্তু একজন নারীকে সবসয়েই তার লিঙ্গ পরিচয়ে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়, তার নিজের পরিচয়ের সূত্রপাত করতে হয় ''আমি একজন নারী'' এই বক্তব্য স্বীকার করে নিয়ে। তাঁর মতে মানবজাতি শব্দটি দ্বারা কেবল পুরুষকেই বোঝানো হয় এবং মানব শব্দটি একই সঙ্গে ইতিবাচক এবং নিরপেক্ষ, অন্যদিকে নারী শব্দটির মাধ্যমে কেবল নেতিবাচক দিকই বোঝানো হয়ে থাকে। নারীর জরায়ু রয়েছে এবং তার এই বিশিষ্টতাই তাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। পুরুষরা প্রায়ই বলে থাকে নারী চিন্তা করে তার গ্রন্থি দিয়ে, বোভয়ার বলেন, পুরুষরা এ বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যান যে তাদের দেহেও গ্রন্থি রয়েছে। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, পুরুষ হচ্ছে মানব জাতি এবং নারী হচ্ছে পুরুষ যা ঘোষণা করে তাই। পুরুষ নারীকে স্বাধীন-স্বকীয় সত্ত্বা হিসেবে বর্ণনা করে না বরং পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে বর্ণনা করে। পুরুষের কাছে নারী হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ যৌন সত্ত্বা। পুরুষ নিজেকে দেখে আত্ম বা পরম সত্ত্বা হিসেবে আর নারীকে বিবেচনা করে দ্বিতীয় সত্ত্বা, অপর সত্ত্বা বা দ্য আদার হিসেবে। বোভয়ার প্রশ্ন রেখেছেন নারী কেন অপর সত্ত্বা হিসেবে নিজের এই ভূমিকা কোন প্রতিরোধ ছাড়াই

Dhaka University Institutional Repository

মেনে নেয়ার জন্য অনুগত হয় ? কারণ ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন পুরুষের বিপরীতে নিজেকে পরম সত্তা হিসেবে নিজেকে দাঁড় করানোর মতো বাস্তব উপায় নারীর নেই। নারীর কোন অতীত নেই, ইতিহাস নেই, কোন ধর্ম নেই। নারীরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত নয় বরং অর্থনৈতিক শর্ত বা সামাজিক অবস্থানের দ্বারা পিতা বা স্বামীর সাথে যুক্ত, আর তাই নারী পিতৃতন্ত্রকে ধ্বংস করার চিন্তাও করতে পারে না। এই তত্ত্ব অনুসারে নারীর অপর সত্তা হতে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে উচ্চবর্ণের সাথে সখ্যতার মাধ্যমে অনুগ্রহ প্রাপ্তির সুবিধা পরিত্যাগ করা। পুরুষ-নির্ভরশীল নারীসত্তা নারীকে সকল বস্তুগত নিরাপত্তা দেয়। এই সুবিধা প্রাপ্তি নারীকে অর্থনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণ ও স্বাধীনতার ঝুঁকি গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে।[৫৪]

বোভয়ার নারীর এই অপরত্বের ধারণার অবসান কামনা করেছেন এবং আশা করেছেন নারী তার নারীত্বের মিথকে আসনচ্যুত করবে এবং নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।

বোভয়ারের ধ্যানধারণা গ্রহণ করে তা আরো প্রসারিত করেই বৈপ্লবিক নারীবাদীরা তাদের তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। ইভা ফিগস তাঁর তত্ত্বে পিতৃতান্ত্রিকতাকে নারীর মর্যাদাহানীর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং নারীর অধীনতার জন্য দায়ী করেছেন।[৫৫] ইভা ফিগস এর মতো কেট মিলেটও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে ক্ষমতা হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই ক্ষমতার কারণেই নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য গড়ে ওঠে। তিনি যুক্তি দেখান পরিবারের কাঠামো রচিত হয় পিতৃতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে, আর এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৈরি হয় অর্থনৈতক, সামাজিক ও রাজনৈকিত কাঠামো। রাজনীতির প্রচলিত সংজ্ঞা অস্বীকার করে মিলেট বলেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাজনীতির অস্তিত্ব বোঝা যায়।[৫৬]

বৈপ্লবিক নারীবাদীরা পুরুষ কর্তৃক নারীর দেহ নিয়ন্ত্রণের দিকটিকে অধিক গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে পুরুষরা নারীর দেহকে ও যৌনতাকে ব্যবহার করে আপন স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। বৈপ্লবিক নারীবাদী জারমেইন গ্রিয়ার-এর অভিমতে, অসমকামিতা নারীর অধীনতার প্রধান হাতিয়ার। তিনি নারীর প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নারীর স্বাভাবিক নারীত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫৭]

সুলামিথ ফায়ারষ্টোন নারীর প্রজনন ক্ষমতাকে নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য ও নিপীড়নের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মার্কসের ঐতিহাসিক জড়বাদের ব্যাখ্যা নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে দিয়েছেন, ''ঐতিহাসিক জড়বাদ হচ্ছে ইতিহাসের গতিধারার ঐ দৃষ্টিভঙ্গি যা সেক্সের দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ ও পরিবর্তনের শক্তি অনুসন্ধান করেঃ সন্তান পুনরুৎপাদনের জন্য দুটি ভিন্ন জৈবিক শ্রেণিতে সমাজের বিভক্তি এবং এসব শ্রেণির পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে, এসব সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট বিয়ে, প্রজনন ও সন্তান লালনপালনের ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে ; দৈহিকভাবে পৃথকীকৃত অন্যান্য শ্রেণির (বর্ণ)

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্ত উন্নয়নের মধ্যে; এবং (অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক) শ্রেণীব্যবস্থায় বিকশিত সেক্সভিত্তিক প্রথম শ্রমবিভাজনের মধ্যে।"[৫৮] তিনি মার্কস্‌বাদের অর্থনৈতিক বিপ্লবের বিপরীতে নারীর মুক্তির জন্য জৈবিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অর্জিত সমতা নয় বরং পুরুষতান্ত্রিক প্রজনন ও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উচ্ছেদ নারীর অবস্থার পরিবর্তনের পূর্বশর্ত।[৫৯]

বৈপ্লবিক নারীবাদীরা নারীর হীন অবস্থার ব্যাখ্যায় জেন্ডার এবং সেক্স প্রত্যয়দুটিতে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বৈপ্লবিক নারীবাদের মতে, নারীকে তার অধস্তন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন যৌনতা বিষয়টির পুনঃসংজ্ঞায়ন ও পুনঃনির্মাণ এবং এবিষয়ে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।[৬০]

পরিবেশ নারীবাদ

পরিবেশপ্রধান নারীবাদ (Ecofeminism) শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় ফরাসী নারীবাদী ফ্রাঁসোয়া দোবান-এর ***Feminism or Death*** গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন নারীর মধ্যেই রয়েছে পরিবেশবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা।[৬১]

পরিবেশপ্রধান নারীবাদীদের প্রধান বক্তব্যগুলি হচ্ছে :

১) পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ নারীকে প্রকৃতির সাথে এবং পুরুষকে সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে ব্যাখ্যা করে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে যেহেতু সংস্কৃতি প্রকৃতির চাইতে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন তাই পুরুষ নারীর চাইতে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন।

২) নারী এবং প্রকৃতি উভয়ই সমভাবে আধিপত্য ও নিপীড়নের শিকার হয়।

৩) নারী প্রকৃতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪) নারীবাদী ও পরিবেশবাদী উভয়ের লক্ষ্য বৈষম্যহীন সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা।[৬২]

পরিবেশ নারীবাদীদের মতে, প্রকৃতির অস্তিত্ব ব্যতীত যেমন মানব অস্তিত্ব মূল্যহীন তেমন মানবসমাজেও নারীর অস্তিত্ব ছাড়া পুরুষের অস্তিত্ব মূল্যহীন। নারীর অস্তিত্বকে অমৌলিক বিষয় হিসেবে গৌণ এবং পুরুষ অস্তিত্বকে মৌলিক বিষয় হিসেবে মুখ্য বলে বিবেচনা করার পুরুষতান্ত্রিক ধারণাটিকেই পরিবেশ নারীবাদীরা বর্জন করেন।[৭৬] পরিবেশ নারীবাদী ড. ওয়ারেন-এর মতে যেভাবে মানুষের আধিপত্য বিস্তৃত হয় একইভাবে পুরুষকর্তৃক নারীর উপর আধিপত্যের বিস্তার ঘটে।[৬৩]

পরিবেশ নারীবাদীরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, গৃহে নারীর যে ভূমিকা, সন্তান জন্মদান, লালন-পালন ও গৃহস্থালি কার্যাদি তাতে নারী প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে, ফলে যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রভাব নারীর উপর সর্বাধিক পরে।[৬৪] পরিবেশ নারীবাদীরা এ কারণে পরিবেশবাদী আন্দোলনে নারীর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক মারিয়ামিজ দেখিয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

কীভাবে সারা পৃথিবীতে ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।[৬৫]

পরিবেশবাদী নারীবাদ নারীর বৈষম্য দূরিভূত করার কথা বলে, তবে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত গৃহস্থালীর ভূমিকাকেই নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে নারীর অধস্তন অবস্থাকেই স্বীকার করে নেয়।

সাংস্কৃতিক নারীবাদ

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদে নারী-পুরুষের মধ্যে ভিন্নতার যুক্তিতে নারীকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল করে দেখানো হয় বা নারীর বৈশিষ্ট্যকে নেতিবাচক হিসেবে দেখানো হয়। এর বিপরীতে সাংস্কৃতিক নারীবাদীরা নারীর বৈশিষ্ট্যকে ইতিবাচক অর্থে ব্যাখ্যা করে। তাদের মতে নারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ, ধৈর্য, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সেবার মত গুণাবলী সমাজে অধিক প্রয়োজনীয়।

মার্গারেট ফুলারের মতে, যেহেতু নারীর প্রকৃতি অহিংস এবং পুরুষ প্রকৃতি আক্রমণাত্বক তাই সমাজে শান্তি ও ভালবাসার পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য নারীর গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, নারীর গুণাবলী তার মধ্যে সামগ্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে যা তার জীবনের একমুখীনতাকে নষ্ট হতে দেয় না।

সাংস্কৃতিক নারীবাদীদের মতে, যেহেতু জনপরিমণ্ডলের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষের প্রাধান্য তাই নারী-বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মাতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তিত করতে হবে। তাঁরা বলেন মাতৃন্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যখন সমাজে প্রভাববিস্তারকারী উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অপসারিত হবে।

সাংস্কৃতিক নারীবাদকে আরো সমৃদ্ধ করে গড়ে ওঠে Gynocentric (নারী শরীরের বৈশিষ্ট্যভিত্তিক) নারীবাদ। এই ধারার তাত্ত্বিকেরা সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন। তাঁরা নারীর প্রজনন, যৌনতা, মাতৃত্বের মত বিষয়গুলিকে ইতিবাচক মূল্যবোধের উৎস হিসেবে বিশ্লেষণ করেন।

তাত্ত্বিক সারা রাডিক বলেন, সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব বহন করবার জন্য নারীকে পৃথক শ্রেণিতে বিভক্ত করা উচিত নয়, বরং এই ভূমিকার মধ্যদিয়ে নারীর অন্তর্গত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, যা আগ্রাসন, হিংস্রতা ও যুদ্ধবাদের বিরোধী। তাত্ত্বিক ক্যারল গিলিগান নারীর আবেগ, সংবেদনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলীকে পুরুষের চাইতে স্বতন্ত্র হিসেবে দেখেছেন এবং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি পুরুষের যুক্তিবাদের তুলনায় নারীর আবেগ ও অনুভূতিকে উচ্চমর্যাদা দিয়েছেন।[৬৬]

সাংস্কৃতিক নারীবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে সমাজের গভীর ও ব্যাপক বিশ্লেষণ করা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনের বিষয়টি তুলে ধরা।

উত্তরাধুনিক নারীবাদ :

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধুনিক নারীবাদীরা আধুনিকতার বিপরীতে অবস্থান করেন, কেননা তারা আধুনিকতা এবং পিতৃতন্ত্রকে পারস্পরিক সম্পৃক্ত বলে মনে করেন। উত্তরাধুনিক নারীবাদীরা আধুনিকতার উচ্ছেদের মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রের অবসান চেয়েছেন। উত্তরাধুনিক নারীবাদীদের মতে নারীর জন্য শিক্ষা কিংবা অর্থনৈতিক সমতা অর্জন নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ নারী-পুরুষের বৈষম্য কেবল এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর মূল নিহিত রয়েছে চিন্তা কাঠামোর মধ্যে। এই ধারার তাত্ত্বিকেরা বলেন, চিন্তা কতকগুলি আবশ্যিক বিধি মেনে চলে এবং এর মাধ্যমেই সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য অনিবার্য হয়ে ওঠে, এই বিধি মানুষের চিন্তার বৈষম্যকেও অস্বীকার করে। উত্তরাধুনিক নারীবাদীরা নারীকে এই চিন্তার পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। মুক্ত করার মাধ্যম হিসেবে তারা বেছে নিয়েছেন সাহিত্য এবং ব্যবহৃত ভাষাকে।

উত্তরাধুনিক নারীবাদী হেলেন সিক্সু -র মতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে পুরুষের লেখা মেয়েলি লেখার ওপর আধিপত্য করে। তিনি পুরুষালি লেখার বিরোধিতা করে বলেন, পুরুষরা তাদের লেখায় এমনভাবে দুটি বিপরীতধর্মী জোড় তৈরি করেন, যার একটি অন্যটির উপর প্রভূত্বকারী। এই বিপরীতধর্মী জোড়-এর উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন : সক্রিয়তা/নিষ্ক্রিয়তা, সূর্য/চন্দ্র, সংস্কৃতি/প্রকৃতি, দিন/রাত, বলা/লেখা, উঁচু/নিচু প্রভৃতি জোড়কে। তিনি মনে করেছেন পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য সক্রিয়, সাংস্কৃতিক, আলো এসব ইতিবাচক গুণ নির্ধারণ করা হয় আর বিপরীত নেতিবাচক গুণাবলী নির্ধারিত থাকে নারীর জন্য। তিনি নারীকে পুরুষ কর্তৃক নির্ধারিত জগৎ-এর বাইরে এসে নিজ লেখনী সৃষ্টির আহ্বান জানান। তিনি আশা করেন যে, নারীরা সমাজমানসে পরিবর্তন আনতে সক্ষম এমন লেখা লিখবেন। সিক্সু নারী সমাজের মুক্তির জন্য যুক্তির পরিবর্তে ইচ্ছাশক্তিকে অপরিহার্য মনে করেন।

অপর উত্তরাধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিক লুস ইরিগারের মতানুসারে, পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-কাঠামোতে নারীকে প্রকৃত অর্থে জানা অসম্ভব। তিনি নারীর বন্দিত্ব ও নারীমুক্তির কৌশলের উপর গুরুত্বারোপ করেছন। নারীমুক্তির কৌশল হিসেবে তিনি তিনটি পন্থা নির্দেশ করেছেন:

১) ভাষার প্রকৃতির ওপর মনোযোগ : তিনি বলেন অধিকাংশ শব্দই পুরুষকেন্দ্রিক, একইসাথে প্রচলিত ভাষায় নারী অনুপস্থিত। ইরিগারে নারীসমাজকে তাদের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হতে পরামর্শ দিয়েছেন।

২) ইরিগারে মনে করেন নারীরা তাদের মুক্তির জন্য দৈহিক সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারে এবং তাদের কথা বলা ও চিন্তা করা শিখতে হবে।

৩) পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারীরা মুকাভিনয়ের কৌশল অবলম্বন করতে পারে। তিনি মনে করেন নারীর উচিত নারীর প্রতিকৃতিকে পুরুষের সামনে বড় করে তুলে ধরা । এভাবে নারীরা একটি শক্তি হিসেবে বিকাশিত হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক ও তাত্ত্বিক জুলিয়া ক্রিস্টিভা পুরুষালি ও মেয়েলি বলে যে পার্থক্য করা হয় তাকে জৈবিকতার মধ্যে সীমিত করেন নি বরং এর বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন নারী প্রত্যয়টি ভুল, নারী বলতে কিছু নেই। *নারী - মেয়েলি* এসব প্রত্যয়ের বিরোধিতা করে বলেন, "একজন নারী (one is a women) এই বিশ্বাসটি 'একজন পুরুষ' (one is a man) এই বিশ্বাসটির মত প্রায় একই রকম হাস্যকর ও অস্পষ্ট। আমি প্রায় কথাটি বলছি এজন্য যে, আজো নারীরা অনেক কিছু করতে পারে : গর্ভপাত ও জন্মশাসনের স্বাধীনতা, সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার, কর্মের সমতা ইত্যাদি। কাজেই 'আমরা নারী' (We are women) কথাটি আমাদের দাবির জন্য বিজ্ঞাপন বা স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করি। কাজেই গভীরতর অর্থে, একজন নারী হতে (be) পারে না; এমনকি হওয়ার প্রক্রিয়াতেও (being) থাকে না।" [৬৭]

সময় বিবর্তনের সাথে সাথে মানবসমাজে এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিবর্তন ঘটেছে নারী সংক্রান্ত ধ্যানধারণার। বিভিন্ন পার্থক্য সত্ত্বেও প্রতিটি নারীবাদী তত্ত্বেই দেখা যায় নারীর অবস্থান পরিবর্তনের প্রচেষ্টা এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা।

ভারতবর্ষে অবিভক্ত বাংলায় দেখা যায় প্রাচীন আমল থেকে নারী তার সনাতন ভূমিকা পালনেই সন্তুষ্ট ছিল। পরবর্তী সময়ে উপনিবেশিক শাসনামলে বিদেশী শাসনের ফলে বাংলার এই চিরায়ত সমাজকাঠামোতে ভাঙ্গন ধরে। সমাজ-মানসে পরিবর্তন আসে। এর সাথে সাথে দেখা যায় বাঙালি নারীর চিরন্তন ভূমিকা ও নারীর উপর বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি নিয়ে সংশয় ও প্রশ্ন তৈরি হয়। কাজেই দেখা যায় ইউরোপ ও আমেরিকায় যখন বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্ব প্রচার হচ্ছে তখন বাংলায় চলছে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন। এই সংস্কার আন্দোলনের বড় অংশই ছিল নারী সংক্রান্ত। তাই ১৮৬৯ সালে জন স্টুয়ার্ট মিল যখন *দ্য সাবজেকশন অব উইমেন* গ্রন্থটি রচনা করেন তখন অবিভক্ত বাংলায় রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদে সফল হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইনগত ভিত্তি পায়, বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে আন্দোলন। দেখা যায় বাঙলায় এই নারীবাদীদের কার্যক্রম উদারনৈতিক নারীবাদের পর্যায়ভুক্ত ছিল। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীরাও উদারনৈতিক নারীবাদী চিন্তাচেতনা বহন করতেন। চল্লিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারের ফলে বাংলায় নারীদের মধ্যে মার্ক্সীয় চেতনা বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে বাংলায় নারীসমাজের অবস্থানগত পরিবর্তন এবং রাজনীতিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়সমূহ আলোচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. সঞ্চারী রায় মুখার্জী, 'নারীবাদী আন্দোলন', রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা*, (কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ৬৩

২. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারী আন্দোলনের কয়েকটি কথা*,(কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৭৫), পৃ. ৫

৩. Helen Tierney (ed.), ***Women's Studies Encyclopedia (Revised and Expanded Edition) vol.1***, (New Delhi: Rawat Publications, 2008), p. 476

৪. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬), পৃ. ৪

৫. ঐ, পৃ. ৪

৬. Tierney (ed.), p. 476-477

৭. রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার (অনুবাদ, নূরুল ইসলাম খান), *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ২৯

৮. ঐ, পৃ. ৩০-৩১

৯. রাশিদা আক্তার খানম, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০০৫), পৃ. ১৮

১০. ঐ

১১. ঐ

১২. আগস্ট বেবেল (অনুবাদ: কনক মুখোপাধ্যায়), *নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড), পৃ. ১৫

১৩. কেলি ও বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, পৃ. ৩৩

১৪. বেবেল , *নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে*, পৃ. ১৭

১৫. কেলি ও বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, পৃ. ৩৪

১৬. বেবেল, *নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে*, পৃ. ১৮

১৭. মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৭

১৮. Dale Spender (ed.), ***Feminist Theories***, (London: The Women's Press Ltd., 1983), p. 28

১৯. Alice S. Rossi (ed.), ***The Feminist Paper : from Adams to de Beauvoir***, (Boston : Northeastern University Press, 1988), p. 10-11

২০. কেলি ও বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, পৃ. ৩৯

২১. রায় মুখার্জী, 'নারীবাদী আন্দোলন', পৃ. ৬৪

২২. Rossi (edited), ***The Feminist Paper : from Adams to de Beauvoir***, p. 3

২৩. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, পৃ. ৮

২৪. Rossi (ed.), ***The Feminist Paper : from Adams to de Beauvoir***, p. 3

২৫. তিনি ***A Vindication of the Rights of Woman*** গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেন : - "a profound conviction that the neglected education of my fellow-creatures is the grand source of the misery I deplore; ---- One cause of this barren blooming I attribute to a false system of education, gathered from the books written on this subject by men who considering females rather as women than human creatures, have been more anxious to make them alluring mistresses than affectionate wives and rational mothers." Mary wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, *In* Alice S. Rossi (edited), ***The Feminist Paper : from Adams to de Beauvoir***, p. 40

২৬. Mary wollstonecraft, ibid, p. 43, 45-46, 81, 61, 67, 85

২৭. John Stuart Mill, The Subjection of Women, *In* Rossi (edited), ***The Feminist Paper : from Adams to de Beauvoir***, p. 196, 197, 200- 204, 206, 208, 213-14, 218

২৮. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা*, পৃ. ৪৭

২৯. Sarah Grimke, Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Women, *In* . Rossi (edited), ***The Feminist Paper : from Adams to de Beauvoir***, p. 37

৩০. Sarah Grimke, p. 307

Dhaka University Institutional Repository

৩১. Sarah Grimke, p. 308
৩২. Sarah Grimke, p. 309
৩৩. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', পৃ. ৪৭
৩৪. ঐ, পৃ. ৪৭
৩৫. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, পৃ. ১৭
৩৬. ঐ
৩৭. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', পৃ. ৪৮
৩৮. ঐ
৩৯. কনক মুখোপাধ্যায়, *মার্কসবাদ ও নারীমুক্তি*, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৭৫), পৃ. ৬, ৭,১০-১১
৪০. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি প্রশ্নে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ৩৮
৪১. কনক মুখোপাধ্যায়, *মার্কসবাদ ও নারীমুক্তি*, পৃ. ১৭
৪২. ঐ, পৃ. ২৫-২৬
৪৩. ঐ, পৃ. ২৭
৪৪. ঐ, পৃ. ৩২
৪৫. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*,পৃ. ২৮
৪৬. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', পৃ. ৫০
৪৭. ঐ, পৃ. ৫১
৪৮. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, পৃ. ২৬
৪৯. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা',পৃ. ৫১
৫০. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, পৃ. ২৬
৫১. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', পৃ. ৫২
৫২. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, পৃ. ২৬-২৮
৫৩. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা',পৃ. ৫৩
৫৪. Simone de Beauvoir, The Second Sex, *In* Rossi (edited), ***The Feminist Paper : from Adams to de Beauvoir***, p. 674-676
৫৫. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', পৃ. ৫৪
৫৬. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, পৃ. ৩৭
৫৭. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা',পৃ. ৫৪
৫৮. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, পৃ. ৩৮
৫৯. ঐ পৃ. ৩৮
৬০. ঐ, পৃ. ৪৫
৬১. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', পৃ. ৫৮
৬২. ঐ, পৃ. ৫৮
৬৩. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, পৃ. ৫৮
৬৪. ঐ, পৃ. ৫৮
৬৫. ঐ, পৃ. ৫৪
৬৬. বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', পৃ. ৫৫, ৫৬, ৫৭,৫৯,৬০
৬৭. মান্নান ও মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, পৃ. ৪৬, ৪৭,৪৮,৫০,৫১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় :
উনিশ শতক : বাংলায় সংস্কার আন্দোলন ও নারীর নবজীবনের যাত্রা শুরু

উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে বিশেষায়িত হয়ে আছে নবজাগরণের যুগ হিসেবে। তবে ঐতিহাসিকদের একাংশ একে নবজাগরণের পরিবর্তে নবজিজ্ঞাসার যুগ বলবার সপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন। যেমন স্বপন বসু এ প্রসঙ্গে বলেন

> উনিশ শতকের বাংলায় এক নতুন যুগের এবং সেইসূত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। ... এই নতুন যুগকে আমরা বিশেষভাবে বলতে চাই নবজিজ্ঞাসার যুগ। উনিশ শতকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় সভ্যতা– প্রায় পরস্পর বিরোধী এই দুই ধারার সম্মুখীন এদেশের মুষ্টিমেয় 'সচেতন' জনমনে এই জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। এ জিজ্ঞাসা সচেতন বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা–এবং তা প্রসারিত হয়েছে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ রীতিনীতি ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে।[১]

ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে নারী প্রশ্নটি। যে কারণে উনিশ শতক নারীযুগ হিসেবেও অভিহিত হয়েছে। ঐতিহাসিক রাধা কুমার তার ***History of Doing*** গ্রন্থে বলেন, "The nineteenth century could well be called an age of women, for all over the world their rights and wrongs, their 'nature', capacities and potential were the subjects of heated discussion."[২]

ভারতবর্ষের জন্য ভিনদেশী শাসকবর্গের অধীন হওয়া নতুন অভিজ্ঞতা বলা যাবে না, বৃটিশ অধিকারের পূর্বে শক, হুন থেকে শুরু করে পাঠান, মোগল, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতি এই উপমহাদেশের ওপর প্রভূত্ব করেছে বহু যুগ ধরে। কিন্তু বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে অন্যান্য শাসকবর্গের শাসনের গুণগত পার্থক্য ছিল। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলে বারবার শাসকশ্রেণির পরিবর্তন ঘটেছে একথা যেমন সত্য তেমন একথাও সর্বজনস্বীকৃত যে, শাসকশ্রেণির এই পরিবর্তনে সমাজব্যবস্থার কোনরূপ হেরফের ঘটে নি। বরং দেখা যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার নির্ধারিত পথেই আবর্তিত হয়েছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর এর সমাজ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কার্ল মার্কস এই পরিবর্তন সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে

> যত গৃহযুদ্ধ, আক্রমণ, বিপ্লব, জয়, মন্বন্তর– হিন্দুস্থানের উপর যাদের লীলা-ক্রম অদ্ভুত জটিল, ক্ষিপ্র এবং ধ্বংসাত্মক মনে হয় – তার কোনটাই বহিরাবরণ ভেদ করে গভীরে বেশি দূর প্রবেশ কওে নি। কিন্তু ইংলন্ড ভারতীয় সমাজের সেই গোটা কাঠামোটাকেই ভেঙ্গে দিয়েছে, পুনর্সংগঠনের কোন লক্ষণই এখনো প্রকাশ পাচ্ছে না। নতুন জগৎ না লাভ করেই পুরোনো জগৎ খোয়ানো হিন্দুর আজকের এই দুর্দশাকে এক বিশিষ্ট বেদনা দান করেছে এবং বৃটিশ-শাসিত হিন্দুস্থানকে তার সকল প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।[৩]

বৃটিশ শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর ফলে বাংলার কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত হয় শিল্প নির্ভর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা। নতুন সমাজকাঠামোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে

Dhaka University Institutional Repository

নুতন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, বিকাশ ঘটে বণিক, মুৎসুদ্দী, দালাল, জমিব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র আকারের শিল্পবিনিয়োগকারী পুঁজিপতি শ্রেণির মত এদেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণির।[৪] পাশাপাশি এই সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই শ্রেণির মধ্যে একইসঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ ঘটায় তারা আত্মসমীক্ষার পথে পা বাড়ান।[৫] উনিশ শতকে বাংলার নব জিজ্ঞাসার ধারক ও বাহক বলা যায় এই শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকেই। ঐতিহাসিক স্বপন বসু এই নবজিজ্ঞাসার সূচনাপর্বে তিনটি পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, এই সময়ে বাঙালিজীবন পুরোপুরি দৈবনির্ভরতা কাটিয়ে কিছুটা মানবমুখী হয়ে ওঠে এবং মানুষ কিছুটা নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পায়। দ্বিতীয়ত, অদৃষ্টবাদী বাঙালির জীবনে যুক্তিবাদ স্বল্পমাত্রায় হলেও প্রবেশাধিকার পায়, ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি হয়ে ওঠে ইহমুখী, আর একই সঙ্গে অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করে সে তার নিজের ভাগ্য নির্মাণে ব্রতী হয়। তৃতীয়ত, এই সময়ে সমাজে কিছুটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নারীমুক্তি আন্দোলনের। এর ফলেই নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে না দেখে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে মযার্দা দেবার চর্চা শুরু হয়।[৬] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের এই নবজিজ্ঞাসা ছিল শহরকেন্দ্রিক কিংবা আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে কলকাতাকেন্দ্রিক। বৃহত্তর বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এই চেতনার বাইরে অবস্থান করছিল।

(২)

প্রাচীন যুগে দেখা যায় ভারতবর্ষে নারীরা পারিবারিক জীবনে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে ও জনজীবনে সীমিত আকারে স্বাধীনতা ভোগ করত। সময়ের সাথে সাথে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ক্রমে নারীদেরকে স্বাধীনতা ভোগ করবার অনুপযুক্ত মনে কারা হয়।[৭] বৈদিক যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ-খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০অব্দ) নারীর সামাজিক অবস্থান অনেকটাই উন্নত ছিল। এই যুগে বিয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হতো এবং পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল, স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হতো না। তবে কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ঋগ্বেদ অনুসারে দেখা যায় স্ত্রী-কে জুয়া খেলায় বাজী রাখা হতো এবং হেরে গেলে স্ত্রীকে জয়ী ব্যক্তির হাতে সমর্পন করা হতো, তবে ঋগ্বেদে এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে যে শ্লোক আছে তা থেকে বলা যায়, এই প্রথা সমাজস্বীকৃত ছিল না, বরং এর বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতাও গড়ে উঠেছিল।[৮] তবে বৈদিক যুগে সার্বিকভাবে নারীর অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। এযুগে নারীশিক্ষার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল। নারীর বেদ অধ্যয়নের অধিকার ছিল, তারা উপনয়নের অধিকারী ছিলেন। এ সময়ে সমাজে নারীর উচ্চশিক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে কুড়িজন নারীর রচিত সুক্ত পাওয়া যায় যাদের ঋষি বলা হয়েছে।[৯] ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনে নারীর অধিকার ধর্মীয় অনুশাসনে স্বীকৃত ছিল। ধনী এবং রাজপরিবারে বহুবিবাহের প্রচলন স্বল্প মাত্রায় থাকলেও, সাধারণত এক বিবাহই সমাজে প্রচলিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এসময়ে সতীদাহ প্রথার প্রচলন দেখা যায় না। বিধবা নারী চাইলে পুনরায় বিয়ে করতে পারত। পছন্দ অনুসারে স্বামী বেছে নেবার অনুমতিও ঋগ্বেদে দেখা যায়। তবে ঋগ্বেদেই এর বিপরীত অনুশাসনও দেখা যায়, যখন এতে বলা হয় 'ভুক্তোচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদ্যাৎ' অর্থাৎ 'পুরুষ খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেবে'।[১০] ঋগ্বেদে নারীকে ছায়ার মতো স্বামীর অনুগামিনী হতেও বলা হয়েছে।[১১] নারী সম্পত্তির অধিকার এযুগে স্বীকৃত ছিল না।[১২] তবে সামগ্রিকভাবে বলা চলে যে, বৈদিক যুগে এবং পরবর্তী সময়ে সংহিতা ও উপনিষদের যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ – খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ) নারীর অবস্থান সন্তোষজনক ছিল, নারী কিছু পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করতো।

কালক্রমে (খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ-১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে) নারীর এই অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। উপনয়নের অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করা হয়। ঐতিহাসিকরা নারীর অবদমনের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের যুগকে। এর কারণ হিসেবে তারা প্রথমত যে বিষয়টিকে দেখিয়েছেন তা হচ্ছে, আর্য সম্ভ্রান্ত পুরুষ কর্তৃক অনার্য নারী বিবাহ।[১৩] এই আর্য-অনার্য বিবাহই নারীর সামাজিক অবস্থান ধীরে ধীরে নিম্নমুখী করে তোলে। আর্য সমাজে অন্তর্ভুক্ত অনার্য নারীর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না অথবা তাদেরকে এর যোগ্য মনে করা হতো না। পর্যায়ক্রমে আর্য সমাজভুক্ত সকল নারীই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে থাকে। মেয়েদের বিয়ের বয়স যা পূর্বে ১৬-১৭ ছিল তা ১০-১২ তে নেমে আসে, পরবর্তী সময়ে ৮ বছর বয়সে মেয়ের বিয়ে দেয়াকে পূণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হতে থাকে। কম বয়সে বিয়ে হবার কারণে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এই সময়কালের মধ্যে বিধবা নারীর পুনঃবিবাহের অধিকার হরণ করা হয়, সমাজে পুরুষের বহুবিবাহপ্রথার প্রচলন বেড়ে যায়। সতীদাহ প্রথার মত পৈশাচিক প্রথার উদ্ভবও এসময়ে ঘটে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করে তখন ভারতে নারীসমাজ সকল অধিকার বঞ্চিত হয়ে এক মানবেতর জীবনযাপন করছিল। সামগ্রিকভাবে এ সময়ের সমাজে নারীর চিত্র অঙ্কন করতে গেলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে:

- নারীর শিক্ষার কোন অধিকার ছিল না;
- গৃহের বাইরে জনপরিমণ্ডলে নারীর অংশগ্রহণের কোন অধিকার ছিল না;
- কঠোর পর্দাপ্রথা নারীর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল;
- ৮-১০ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল;
- অনেকক্ষেত্রে বাল্যকালেই মেয়েদের বৈধব্যের শিকার হতে হতো;
- বিধবাদের পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, ফলে বিধবা মেয়েরা পিতা বা ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রিত হিসেবে থাকত বা বলা যায় কার্যত তাদের দাসীর জীবনযাপন করতে হতো;

Dhaka University Institutional Repository

- বিধবাদের জন্য বৈধব্যের কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল;
- সতীদাহ প্রথার ব্যপক প্রচলন ছিল; এবং
- কুলীন প্রথার শিকার নারীরা বিবাহিত হয়েও পিতৃগৃহে বসবাস করতো।

নারীকে শুধু সন্তান উৎপাদন ও স্বামীর সেবা করার যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো, এবং শত শত বছর ধরে এই অবস্থার মধ্যে থাকার ফলে সমাজে এটাই স্বাভাবিক রীতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছিল, নারীরাও একে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করবার পর বাংলা তথা কলকাতা তাদের প্রশাসনিক কাজের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং এর ফলে বাংলার দীর্ঘদিনের অচলায়তনে প্রথম আঘাতটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী উপলব্ধি করে যে, ভারতবর্ষের প্রশাসনকাজ পরিচালনা করা এককভাবে গুটিকয়েক ইংরেজ কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটতে থাকলে শাসকগোষ্ঠী শাসিতের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন ও জনসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করে। এই উপলব্ধি থেকে ইংরেজ শাসকেরা এদেশের জনগণের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এদেশীয়দের শিক্ষার বিস্তারে ১৮১৩ সালে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে।[১৪] বাঙালিদের একাংশও নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষ প্রবেশ করে একটি নতুন জগৎ ও নতুন পরিমণ্ডলে। এই নতুন পরিমণ্ডল পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক, যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার আলোকে আলোকিত। এই আলোকিত পুরুষদের একাংশের মনে প্রথম প্রশ্ন ওঠে তৎকালীন ভারতীয় তথা বাংলার সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান নিয়ে। তারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে শুরু করে সমাজকে। যে বিষয়টি নব্যচিন্তাবিদদের সর্বাধিক দৃষ্টিআকর্ষণ করে তা হলো বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থান। শিক্ষিত পুরুষের নিকট অশিক্ষা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে থাকা, চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নারী বিসদৃশ মনে হলো। এর একটি প্রধান কারণ ইংরেজরা এদেশে এসে অন্তঃপুরের ধারণাটাই পাল্টে দেয়।[১৫] বৃটিশরা তাদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য এবং ভারতীয়দের উপর তাদের শাসনের বৈধতা প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে নারীর অধস্তন অবস্থার চিত্রটি সামনে নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে মিশনারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারা সতীদাহ, কন্যাসন্তান হত্যা, পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, নারীদের মধ্যে শিক্ষার অভাব ইত্যাদী চিত্র তুলে ধরে প্রমান করবার চেষ্টা করেন যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজকে খ্রিস্টধর্মের জ্ঞানের আলোয় এনে রক্ষা করা সম্ভব। মিশনারী সমাজের মধ্যে অন্যতম চার্লস্ গ্রান্ট ১৭৯২-তে ***Observations on the State of Society among the Asiatic Subjects of Great Bretain*** নামে এক প্রবন্ধে ভারতীয়দের প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন এই বলে-"While men were bound by no moral restraints and lived with the

Dhaka University Institutional Repository

insensibility of brutes', Indian Women were doomed to a life of servitude and self-imprisonment and a violent and premature death."[১৬] তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে কেবল খ্রিস্টধর্মের প্রসারের মাধ্যমেই ভারতীয় সমাজকে সভ্যতার স্তরে উন্নিত করা সম্ভব। এছাড়া ইংরেজরাও বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন লেখায় এ দেশের সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেন। ১৮১৮-তে জেমস স্টুয়ার্ট মিল তার ***History of British India*** তে বলেন, "The condition of women is one of the most remarkable circumstances in the manners of nations. Among rude people, the women are generally disregraded; among civilised people they are exalted."[১৭] এদেশীয় শিক্ষিত পুরুষদের একাংশ পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে নিজেদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করে যে, পাশ্চাত্যের উন্নতির অন্যতম কারণ সে দেশে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান।[১৮] ফলস্বরুপ উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজিজ্ঞাসার সূত্রপাত হতে দেখা যায় তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারী সংক্রান্ত প্রশ্ন।

(৩)

বাঙালি মহিলাদের দুর্দশার কথা সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে দেখা যায়।[১৯] সতীদাহের বিরুদ্ধে লেখনীতে তিনি বলেন " একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না।"[২০] নারীজাতির হীন অবস্থার জন্য তিনি পুরুষসমাজকে দায়ী করে বলেন,"স্ত্রীলোকের শারীরিক পরাক্রম পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহাদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে।"[২১] নারীরা পুরুষদের চাইতে কম বুদ্ধিসম্পন্ন হবার কারণে তারা শিক্ষা গ্রহণের অনুপযুক্ত, সমাজে প্রচলিত এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে তিনি বলেন যে, "স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হইতে পারে; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কীরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজপত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রপরায়না রূপে বিখ্যাতা আছেন।"[২২]

বিদ্যাসাগরের লেখনীতেও নারীজাতির দুর্দশার জন্য পুরুষসমাজকে দায়ী করে বলা হয়, "যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদাসদ্বিবেচনা নাই, কেবল

Dhaka University Institutional Repository

লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"[২৩]

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি পুরুষদের একাংশের আত্মপোলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এই লেখনীসমূহে। পুরুষদের একাংশের মধ্যে যেহেতু এই উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছিল যে, নারীজাতির বর্তমান হীনঅবস্থার কারণ পুরুষেরাই, তাই এই দুরবস্থা থেকে নারীর পরিত্রাতার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হলেন তারা। অতএব বাংলায় নারীজাতির উন্নয়নকল্পে যে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা পুরুষদের হাত ধরেই শুরু হয়। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ইয়ং বেঙ্গল-এর সদস্যবৃন্দ প্রমুখের সহযোগিতায় বাঙালি নারী প্রথম আলোর স্পর্শ পান। এক্ষেত্রে মেয়েদের কোন ভূমিকা প্রথম পর্যায়ে ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে পুরুষ প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর সীমিতসংখ্যক রচনায় তাদের মতামত ও বক্তব্যও পাওয়া যায়।

সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে নারীকেন্দ্রিক যে সামাজিক আন্দোলন চলতে থাকে তা হচ্ছে:

- সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন;
- বিধবাবিবাহ আন্দোলন;
- বহুবিবাহ প্রথা রদ আন্দোলন; এবং
- বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন

আর এই সকল আন্দোলনের সঙ্গে যে বিষয়টি চলে আসে তা হচ্ছে, স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলন। সতীদাহপ্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলনসহ সমাজসংস্কার মূলক আন্দোলন শুরু হবার ফলে সংস্কারকদের মধ্যে যে উপলব্ধি জাগ্রত হয় তা হচ্ছে মেয়েদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে স্ত্রীশিক্ষা। কাজেই উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনে স্ত্রীশিক্ষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনা ধীরে ধীরে জাগলেও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার ও ধারণা দূর করা সম্ভব হয় নি।[২৪] স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির একটি অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায় এ সময়ে শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে বিবাহ এবং পারিবারিক জীবন বা পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন।[২৫] শিক্ষিত পুরুষেরা উপলব্ধি করলেন স্ত্রী যদি অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মানসিক দূরত্ব কিছুতেই ঘুচবে না। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বলা হয়, "পরস্পর পরস্পরের আত্মার অভাব মোচনের উপায় সকল অন্বেষণ করিবেন, একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা, একসঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা, একসঙ্গে ধর্ম্মালোচনা, একসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান, একসঙ্গে শয়ন, একসঙ্গে ভোজন, একসঙ্গে অধ্যায়ন ইত্যাদি ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্তব্যসকল নিষ্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ গৌরববৃদ্ধি করিবেন।"[২৬] বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে শিক্ষিত পুরুষের উপযুক্ত সহধর্মিনী হিসেবে নারীকে গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

তোলবার জন্য স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছিল। কাজেই বলা যায় নারীকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয় পুরুষের নিজস্ব কারণে।

উনিশ শতকের নারীশিক্ষা সংক্রান্ত রচনা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রগতিবাদী বা উদারনৈতিক দলের সঙ্গে রক্ষণশীল বা প্রথানুসারিদের লড়াই। তৎকালীন সমাজে স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে প্রচলিত কুসংস্কারগুলি এবং স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল শ্রেণির যুক্তিসমূহের একটি চিত্র মদনমোহন তর্কালঙ্কার *সর্বশুভাকরী* পত্রিকায় *স্ত্রী শিক্ষা* শিরোনামে এক প্রবন্ধে তালিকা বদ্ধ করেছেন। যুক্তিসমূহ হল :

ক) শিক্ষা কর্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রীজাতির তাহা নাই;

খ) স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখনও নাই... অতএব লোকাচার বিরুদ্ধ...;

গ) স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখে চিরকাল জীবনযাপন করিবে;

ঘ) স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক;

ঙ) বিদ্যার অহংকারে মত্ত হইয়া গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক; এবং

চ) পরিশেষে স্বয়ং পতিত হইবেক;

অতএব স্ত্রী জাতিকে সর্বদা অজ্ঞাননান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত।[২৭]

যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে স্ত্রী শিক্ষার স্বপক্ষে মদনমোহন লেখেন

> বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিত ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? --- যাঁহারা কহেন বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ মুখর দুশ্চরিত্র অহঙ্কারী হইবে তাঁহাদিগকে উত্তরপ্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ বিহিত বোধ হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়াছে ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্যান মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উত্তানপাদ হইয়া গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, বিদ্যাবান মানুষ্যেরা যে দেশে বসতি করেন কিম্বা যে সমাজে উপবিষ্ট হইয়া স্বৈরআলাপ করেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারকেরা সেই-সেই দেশ ও তত্তৎ সমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়ত করেন নাই।[২৮]

এভাবে সমকালীন রচনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উনিশ শতক জুড়েই স্ত্রীশিক্ষা শব্দটি সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এবং বাঙালি নারীর সামাজিক ভূমিকার পটপরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের পূর্বে কি তবে নারীদের সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্কই ছিল না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, প্রথাগত নারীশিক্ষার কোন ব্যবস্থা এর পূর্বে ছিল না একথা ইতিহাসস্বীকৃত। তবে মধ্যযুগ থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত একটি চিত্র পাওয়া যায়, যে ধারাটি অন্তঃপুর শিক্ষার একটি রূপ বলা যায়, তা হচ্ছে বৈষ্ণবীদের মাধ্যমে নারীশিক্ষা। বৈষ্ণবীরা অন্দরমহলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাত এবং এদের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারাই অন্তঃপুরের নারীরা জ্ঞানের আলো পেত। ''এ্যাডামস রিপোর্ট অন দ্য স্টেট অব এডুকেশন ইন বেঙ্গল'' থেকে জানা যায় তিনি কেবল নাটোরেই চোদ্দশ কিংবা পনেরশ বৈষ্ণবের খোঁজ পান যারা মেয়েদের লেখাপড়া শেখাত এবং এ্যাডাম মন্তব্য করেন যে, সর্বত্র পরিব্যপ্ত অজ্ঞানতার মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণবরাই বিদ্যাচর্চা করত এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে একমাত্র তারাই মেয়েদের শিক্ষার প্রতি যত্ন নিত।[২৯] বৈষ্ণবী ব্যতীত আরো এক শ্রেণির নারীর মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন পাওয়া যায়; এরা হলেন জমিদার শ্রেণি। জমিদার বংশীয় নারীরা প্রায় সকলেই কিছুটা লেখাপড়া করতেন। এর কারণ হিসেবে দেখা যায়, জমিদার বংশীয় মেয়েদের বিয়ে দেয়া হতো সমশ্রেণির বা বংশের ঘরে। কিছুটা লেখাপড়া জানা না থাকলে এই নারীরা বিধবা হলে স্বামীর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাবে এই ভয়ে তারা কিছুটা লেখাপড়া করতেন।[৩০] তবে এই প্রথা দুটিই সমাজে উচ্চশ্রেণির মধ্যে প্রচলিত ছিল বিধায় সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম হিসেবেই পরিগণীত।

উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে সংস্কার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও বৃটিশ সরকার ভারতীয় তথা বাংলার নারীদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথম পর্যায়ে কোন পদক্ষেপ নেয় নি। ১৮৩৪ সালে মেকলে ভারতে আগমন করে ''জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস''-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষার বিষয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় এই প্রস্তাবে তিনি নারীদের শিক্ষার প্রসঙ্গে কোন বক্তব্য দেন নি বা সুপারিশ করেন নি।[৩১] পরবর্তীকালে ১৮৪৫-এ উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এবং রামকৃষ্ণ মুখার্জী মেয়েদের একটি স্কুল স্থাপনের জন্য কাউন্সিল অব এডুকেশনের কাছে প্রস্তাব রাখেন এবং তারা নিজেরা বিদ্যালয়ের অর্ধেক ব্যয় বহন করবার দায়িত্ব নিয়ে বাকি অর্ধেক সরকারকে বহন করবার অনুরোধ জানান।[৩২] জন ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন্ এর নেতৃত্বে সভার কাজ শুরু হয়। বিটন্ প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন কিন্তু অন্যান্য সদস্যদের আর্থিক সংকটের যুক্তিতে প্রস্তাবটি বাতিল হয়।[৩৩] অবিভক্ত বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হয় কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে মিশনারীদের উদ্যোগে। রবার্ট মে নামে একজন পাদ্রি ১৮১৮ সালে চুঁচুড়ায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩৪] ছবি বসু তাঁর *বাঙলার নারী আন্দোলন* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ''রেইনি সাহেবের মতে, ১৭৬০ অব্দের সমকালে মিসেস হেজেস একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সম্ভবত উহাই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ঐ বিদ্যালয়ে নৃত্য ও ফরাসী ভাষা শেখান হতো বলে প্রকাশ।''[৩৫] তবে ছবি বসুর এই তথ্যের যথার্থতা জানা যায় না। ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি নামে একটি খ্রিষ্টান মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি নন্দন বাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে এই সমিতির সহযোগিতায় বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত গৌরমোহন

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালঙ্কার প্রকাশ করেন 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে একটি গ্রন্থ। এর পর ১৯২৪ সালে চার্চ মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'লেডিজ সোসাইটি'। এই সোসাইটির মাধ্যমে মিস মেরী এ্যান কুক নারীশিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হন। পরবর্তীকালে ১৮২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন নামে অপর একটি মহিলা সমিতি। ইংরেজ মিশনারীগণ কর্তৃক গৃহীত নারীশিক্ষা বিস্তারের এইসব পদক্ষেপ উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চবর্ণের বাঙালি পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন কওে নি। এর কারণ মিশনারীদের স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে ধর্মপ্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। তাদের মধ্যে ভয় জন্মে যে যদি স্ত্রীশিক্ষার সূত্রে খ্রিস্টান মহিলারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ঘটবে। তাই এসকল স্কুলে নিম্নশ্রেণির হিন্দু বালিকারাই যেতো।[৩৬] প্রসন্নকুমার ঠাকুর তার ''রিফর্মার'' পত্রিকায় মিসেস উইলসনের কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে লেখেন

The pupils of this institution consist for the most part of the lowest classes, who are not permitted to frequent the houses of the respectable natives. For these women it will be difficult to find access to the respectable females, particularly when it is known that their education consists chiefly of the knowledge of the New Testament and the religious facts. Prejudice of caste and the stronger prejudice which the generality of natives continue to entertain against Christianity, are at present likely to raise an insurmountable barrier against the success of their endeavours.[৩৭]

খ্রিস্টান মিশনারীদের জনসেবামূলক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ছবি বসুর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য

> স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে এদেশে নবাগত খৃস্টান মিশনারীরা যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করছেন সেকথা অনস্বীকার্য। শুধু স্ত্রীশিক্ষা নয় সুদূর পল্লীমনে, অর্ধসভ্য সরল মানুষদের সঙ্গেও এক মানসিক যোগ-সাধনে এঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য একথাও পুরোপুরি সত্য যে, মিশনারীদের এই পরহিতসাধন নিছক মানবপ্রীতি সম্ভূত নয়। তাঁরা যেখানে গিয়েছেন সেখানেই মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে গিয়েছেন, স্থানীয় ভাষা শিখে সেই ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য বই ছাপিয়েছেন। খৃস্টের বাণী প্রচার করেছেন আর এদেশের ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার নিন্দা করেছেন। যারা তাঁদের প্রলোভনে-প্ররোচনায় বা শিক্ষায় স্বধর্ম ত্যাগ করেছেন, তাঁদের আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য স্কুল খুলেছেন।। তাই এঁদের হিতসাধনের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচারের তাগিদ এবং আরো কিছুদিন পরে অবশ্যম্ভাবীরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠল বণিকের মানদণ্ড রক্ষা করবার কৌশল।[৩৮]

তৎকালীন বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের মিশনারী শিক্ষার সম্পর্কে এরূপ শংকার যথার্থতা অবশ্য মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের পাঠ্যতালিকা বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। মিসেস উইলসনের বিদ্যালয়ে ১৮২৯-এ পাঠ্যসূচি ছিল ওয়াটের ক্যাটসিসম, মোক্ষলাভের উপায় সম্পর্কে যিশুর উপদেশ নিয়ে মাতা ও কন্যার কথোপকথন, বাংলায় অনুদিত বাইবেলের ইতিহাস, সেন্ট ম্যাথুর গসপেল এবং খ্রিস্টের দ্বাদশ শিষ্যের প্রচারকার্যের বিবরণ।[৩৯] ১৮৩৩ সালে পাঠ্যক্রমটি বর্ধিত হয়ে দাঁড়ায় ১. যোশেফের ইতিহাস-প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ২. বাইবেলের ইতিহাস, ৩. ভূগোল, ৪. এলারটনের কথোপকথন, ৫. নিউটেস্টামেন্ট, ৬. চার্চ

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাটসিসম, এছাড়া স্রোত মুখস্থ এবং সেলাই-এর কাজ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪০] এই পাঠ্যসূচী সব মিশনারী বিদ্যালয়গুলি অনুসরণ করত।

তবে মিশনারীদের প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এ বিষয়টি সন্দেহাতীত। এর ফলে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে ক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমাজের উপরের স্তরে এই চেতনা সঞ্চারিত হতে থাকে। স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে মূলত তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়; স্ত্রীশিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি? যদি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন থাকে তবে এ ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে? এবং স্ত্রীশিক্ষার বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত?

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যখন স্বীকৃত হতে থাকে তখন প্রশ্ন ওঠে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে প্রশ্নটি। কারণ স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠানোর বিষয়টি সম্ভ্রান্ত বংশীয় অনেকেরই আপত্তি ছিল। এক্ষেত্রে তৎকালীন হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাধাকান্ত দেব-এর উদাহরণ গ্রহণযোগ্য। নীতিগতভাবে তিনি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন কিন্তু প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রেরণের পক্ষপাতি ছিলেন না। ১৮৫১ সালে বিটন্ কে লিখিত পত্রে তার এ বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ জানা যায়

> বর্তমানে আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন, আমি এতকাল উপদেশ ও নিজের কাজের দ্বারা দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছি যে আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান সমর্থক।...১৮১৯ সালে আমি পাদরি পিয়ার্সকে লিখে জানিয়েছিলাম যে বিবাহের আগে মেয়েদের আমরা ঘরেই লেখাপড়া শেখাই, তাই কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বাইরের স্কুলে লেখাপড়া করতে যাবে না। এরপর আমি বরাবরই একথা বলে এসেছি। নীতির দিক থেকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা আমি করি নি, তবে প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল।[৪১]

এভাবে রাধাকান্ত দেবের মতো রাজা বৈদ্যনাথ রায়, ধনকুবের মতিলাল শীলসহ অনেক সমাজগণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক যুক্তির সমন্বয় দেখা যায় যারা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও একে গৃহশিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। ১৮৫০ সালের সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকার এক প্রবন্ধ থেকেও জানা যায় 'অনেক ভদ্রলোকই স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে বালিকা প্রেরণ করিতে অসম্মত আছেন এবং তাহা ভদ্র পরিবারের যোগ্য এমন জ্ঞান করেন না।'[৪২]

স্ত্রীশিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেন ইয়ং বেঙ্গল দল। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী শিক্ষায় বিশ্বাসী, শিক্ষার জন্যই শিক্ষা এই মতাদর্শে বিশ্বাসী ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের সদস্যরা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেন এবং তাঁরা ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার জোরালো সমর্থক। ১৮৪০ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে প্রবন্ধ রচনা করে পুরস্কার পান। পরবর্তীকালে ১৮৪২ সালে রামগোপাল ঘোষ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এছাড়াও ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র *পার্থেনন, জ্ঞানান্বেষণ, এনকোয়েরারে* প্রকাশিত হতো স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে জোরালো যুক্তি সম্বলিত প্রবন্ধসমূহ। *একাডেমিক এশোসিয়েশন* ও *সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা* সভার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষা।[৪৩] এভাবে

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টি উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে প্রধানত মিশনারীদের প্রচেষ্টাধীন থাকলেও চতুর্থ দশকে এসে ক্রমেই তা বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত *বিদ্যাদর্শন* পত্রিকায় লেখেন

> কিয়দ্বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদের বিদ্যাভ্যাস বিষয় লইয়া যে সমুদয় সমাচার পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা বাদানুবাদ করিতেছেন, তাঁহারা দুইদলে বিভক্ত হইয়া স্ত্রীবিদ্যার সাপক্ষ বিপক্ষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। যাঁহারা এতদ্বিষয়ের প্রশংসা করেন, তাঁহারা নানাবিধ দৃষ্টান্তদ্বারা মধ্যে মধ্যে সম্বাদপত্র....করিয়া থাকেন। তদ্বিপরীতে যে-সকল মহাশয়েরা স্ত্রীবিদ্যার গৌরব করেন না, তাঁহারা কেবল উপহাস করিয়াই আসিতেছেন। ফলতঃ কিরূপ উপায়দ্বারা দেশীয় রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এপর্যন্ত কেহই দর্শাইতে পারেন নাই।...
>
> আমরা সকল উপায়াপেক্ষা এ বিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রীবিদ্যার উন্নতিকল্পে দেশ হিতৈষি জনসমূহের যুক্ত সাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না; অতএব আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি দয়াশীল মহাশয়েরা ঐক্যবাক্যে একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করুন, এবং দৃঢ়রূপে তৎসমাজের কার্য্যবিষয় মনযোগী হউন।[৪৪]

বিদ্যাদর্শন সম্পাদকের আহ্বান থেকে বলা যায় যে, সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তবে তা কার্যে পরিণত করবার পদ্ধতি নিয়ে বিভক্তি ছিল। কাজেই তিনি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা শুভেচ্ছার পরিবর্তে সকলের প্রচেষ্টার সম্মিলিত রূপকেই সর্বাধিক কার্যকর উপায় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তবে এই বিচ্ছিন্ন প্রয়াস শেষ হতে আরো কিছুদিন সময় লেগেছিল। বাংলায় সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয় বলা যায় ১৮৪৭ সালে বারাসতে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টিকে। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও তাঁর ভাই নবীনকৃষ্ণ মিত্র সহ বারাসতের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির উদ্যোগে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নবকৃষ্ণ ঘোষ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরবর্তী প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে বলেন

> ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বহুল গণ্ডগ্রাম বারাসতে ঐ দেশাচার বিরুদ্ধ নব অনুষ্ঠানের জন্য প্যারীবাবু প্রমুখ ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তাগণকে কত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কত লাঞ্ছনা-নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্যারীবাবু, নবীনকৃষ্ণবাবু এবং বালিকা বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বারাসতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এমন কি বারাসত বিদ্যালয়ের তৎসাময়িক দ্বিতীয় শিক্ষক হরিদাসবাবুও প্যারীবাবুর বিপক্ষদলে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে সে সময়ে স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যায় প্রভৃতি কুসংস্কার বঙ্গীয় পল্লীবাসিগণের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। এমনকি একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী সস্ত্রীক বারাসতের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়া একটী দুগ্ধপোষ্য বালিকার চিবুকে হাত দিয়া আদর করাতে জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া বারাসতবাসিগণ ঘোটমঙ্গল বসাইয়াছিলেন।[৪৫]

স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে বারাসত বালিকা বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে বৃটিশভারতে অবিভক্ত বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে ১৮৪৯ সালে ৭ মে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে,[৪৬] যা পরবর্তীকালে বেথুন কলেজ হিসেবে খ্যাত হয়ে কেবল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেই নয় নারীজাতির অগ্রগতির প্রধান নিয়ামকে পরিণত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন, যিনি ভারতবর্ষের জনগণের কাছে বেথুন সাহেব নামে পরিচিত। উনিশ শতকের গোড়ায় রাজা রামমোহন রায় যখন সচেষ্ট হয়েছেন ভারতীয় হিন্দু নারীদের সতীদাহ প্রথার হাত থেকে রক্ষা করতে, আবার একদল চাচ্ছেন এই প্রথাটি বহাল রাখতে, তখন এই প্রসঙ্গে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে দু'পক্ষই আবেদন করে। যারা সতীদাহ প্রথার পক্ষে তারা তৎকালীন লন্ডনের তরুণ আইনজীবী বিটনকে তাদের পক্ষের উকিল নিয়োগ করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অজ্ঞ বিটন না জেনেই তাদের পক্ষে লড়ে যান। প্রথম জীবনে অজ্ঞতাপ্রসূত এই ভুল সংশোধনের জন্যই যেন ১৯৪৮ সালে যখন ভারতবর্ষের আইন সচিব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন তখন এদেশের নারীকল্যাণে, নারীদের দুঃখমোচনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এরই ফলশ্রুতি বলা চলে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। এই বিদ্যালয়ে উচ্চ বর্ণের সভ্রান্ত বংশের হিন্দু এবং ব্রাহ্ম বালিকারা ভর্তি হতে পারত। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছিলেন ছিলেন হিন্দু, এর পাঠ্যসূচিতে এমন কিছুই ছিল না যা হিন্দু ধর্মীয় আদর্শে কোন আঘাত করতে পারে। সর্বোপরি এর পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কালীকৃষ্ণ দেব, হরচন্দ্র ঘোষ এর মতোন নেতৃস্থানীয় হিন্দু ব্যক্তিবর্গ। কাজেই বলা যায় এক্ষেত্রে মিশনারীদের কোনপ্রকার সংযুক্তি না থাকার ফলে ধর্মান্তরের ভীতি থাকল না। এভাবে বেথুন স্কুল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামনে প্রশ্ন রাখেন, ধর্মান্তরের ভীতি দূর হওয়ায় তারা তাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করবেন কিনা?[৪৭] তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে ২১জন মেয়ে নিয়ে স্কুল শুরু হলেও ক্রমেই ছাত্রীসংখ্যা কমতে থাকে এবং এই বিদ্যালয়টিও তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়ারও জন্ম দেয়। গোড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না, বরং যারা মেয়েদের স্কুলটিতে পাঠাতেন তাদের তাদেরকে সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখবার জন্য তারা আন্দোলন করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তার মেয়েদের বেথুন স্কুলে পাঠাবার অপবাদে ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেবার কারণে প্রায় ৮/৯ বছর সমাজচ্যুত হয়ে থাকেন। অনেকে বিদ্যালয়গামী ছোট ছোট মেয়েদের উদ্দেশ্যেও কটুকথা বলতে দ্বিধা করতেন না। রামনারায়ণ তর্করত্ন বলতে লাগলেন,"বাপরে বাপ, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে? এক 'আন' শিখাইয়া রক্ষা নাই। চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।"[৪৮] *হিন্দু ইন্টেলিজেন্স* পত্রিকার নব্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কাশীপ্রসাদ ঘোষ তার পত্রিকায় এসময়ে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। এই রক্ষণশীল মতবাদের বিপরীতে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেসময়ে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে অবস্থান নেন। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁর *সম্বাদভাস্কর* পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে লেখেন

> আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

> সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকটে রাখেন, ... সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান হালে লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আমারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না, মানব কোথায় আছেন, ... সহস্র সহস্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব...।[৪৯]

স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, উনিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশক মুখর ছিল স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষ-বিপক্ষদের বাক-বিতণ্ডায়। এসময়ে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাফল্যের প্রেক্ষিতে বিশেষ করে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারত সরকার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁদের উদাসীন ও নিরপেক্ষ নীতি কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন, ১৮৫১ সালের ১২ আগস্ট বেথুন সাহেবের অকালমৃত্যুর পর ডালহৌসির উদ্যোগে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ বিদ্যালয়টির দায়িত্বভার গ্রহণ করলে এই বিদ্যালয়টি হয় সরকারি পরিচালনায় প্রথম মহিলা বিদ্যালয়।[৫০] এরপর ১৮৫৪ তে উডের ডেসপাচে স্ত্রীশিক্ষা বাবদ ব্যয় বরাদ্দ করার অনুকূলে মতপ্রকাশ করা হয়।[৫১] ১৮৫৪ সালে হ্যালিডে বাংলার প্রথম ছোটলাট হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৫৭-এর শুরুতে তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য বিদ্যাসাগরকে ডেকে পাঠান। মেয়েদের শিক্ষার প্রসঙ্গে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব দেখে বিদ্যাসগর উৎসাহী হন এবং মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তিনি নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮-এর মে এই সময়কালে ৩৫টি মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন, যার মধ্যে হুগলি জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদেনীপুরে ৩টি ও নদীয়ায় ১টি।[৫২] বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক খরচ হতো ৮৪৫ টাকা এবং ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০।[৫৩]

এই পর্যায়ে যে প্রশ্নটি স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তা হচ্ছে, স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হবে? যেহেতু উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু পরিবার তাদের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাবার পক্ষে ছিলেন না এবং বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা খুব অল্প সময় বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পেতেন, অতএব সমাজসংস্কারকদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্ত্রীশিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা শুরু করতে হয়। অন্তঃপুর শিক্ষাপদ্ধতির উৎপত্তি এইভাবে হয়। এই পদ্ধতিতে মহিলারা নিজ চেষ্টায় বাড়িতে স্বামী কিংবা অন্যকোনো আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করতেন, এধরণের শিক্ষাপদ্ধতি জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী বলে পরিচিত হয়।[৫৪] এ ক্ষেত্রেও প্রথম উদ্যোগটি গ্রহণ করে খ্রিস্টান মিশনারী সোসাইটিসমূহ। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের মিসেস হানা মার্শম্যান শ্রীরামপুর অঞ্চলে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।[৫৫] মিশনারীদের এই প্রচেষ্টাও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে নি। মিশনারীদের জেনানা মিশন সফল না হলেও এই কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্ম সমাজ অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কাজে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরচন্দ্র গুপ্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণীভূমিকা পালন করেন। ১৮৬৩ সালে

Dhaka University Institutional Repository

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম বন্ধুসভা স্থাপন করেন যার একটি বিভাগ ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক। এই বিভাগ অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা করে। পরবর্তী পর্যায়ে এই দায়িত্ব 'বামাবোধিনী সভা'র উপর বর্তায়। এই পদ্ধতিতে লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে বছরে চারবার রিপোর্ট পাঠানোর ও'বছরে দুইবার পরীক্ষা গ্রহণ এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল।[৫৬] এই পদ্ধতি প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ অভিমত প্রকাশ করেন সবচেয়ে ভালো লেখাপড়া জানতেন সেইসব মহিলারা যারা বাড়িতে স্বামী অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখতেন।[৫৭] তবে মেয়েদের জন্য পাঠ্যক্রম কী হবে এ নিয়ে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দিল। কেশব সেন সহ অনেক ব্রাহ্ম নেতাও মনে করতেন যে মেয়েদের বিজ্ঞান, গণিত বা ইতিহাস, ভূগোল পড়বার প্রয়োজন নেই। তাদের কিছুটা সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, সেলাই, গৃহবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য এসব পড়ানো উচিত। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় লেখা হয় ''স্ত্রীজাতির প্রকৃতি কোমল, এইজন্য সুকুমার বিদ্যা তাহাদিগের প্রকৃতির বিশেষ উপযোগী। . . . চিত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, রন্ধন, ভাস্করের কার্য্য প্রভৃতি আরও কতকগুলি সুকুমার বিদ্যা আছে তাহা যেমন তৃপ্তিকর,তেমন উপকারী।''[৫৮] *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা মত প্রকাশ করে এই বলে, ''আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নই। নিশ্চয়ই মেয়েরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হবেন এবং শিক্ষার আলোকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবেন। . . . আমরা মনে করি মেয়েদের এমন সব বিষয় পড়া উচিত যা তাদের যোগ্য স্ত্রী এবং যোগ্য মাতা হতে সাহায্য করবে।''[৫৯] ১২৭৭ বাংলা সনে বামাবোধিনী সভা পরিচালিত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যক্রম দেখা যায়,

১ম বৎসর :- সাহিত্য : বোধদয়, অঙ্ক, ব্যাকরণ, সঙ্কলন, নামতা ২০০ পর্যন্ত।

২য় বৎসর :- সাহিত্য : আখ্যানমঞ্জরি ২য় ভাগ, পদ্যপাঠ ১ম ভাগ ১৮ পৃষ্ঠা, ব্যাকরণ স্বরসন্ধি পর্যন্ত, ভূগোল পরিচয় আসিয়া (এশিয়া) ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, অঙ্ক : গুণন ও ভাগাহার, ধারাপাত : নামতা ৪০০ পর্যন্ত, কড়া ও গণ্ডা।

৩য় বৎসর :- সাহিত্য : চারুপাঠ প্রথম ভাগ (বিদ্যাশিক্ষা, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও জলস্তম্ভ), নারীশিক্ষার নারীচরিত ১ম ভাগ ১০ থেকে ৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, পদ্যপাঠ ২য় ভাগ ২৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, ব্যাকরণ : সন্ধি এবং ণত্ব ও ষত্ব বিধান সমাপ্ত, ভূগোল : ভূগোল পরিচয় (আসিয়া ও ইউরোপ সমাপ্ত। বাদ ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ), ইতিহাস : ২য় ভাগ বাংলার ইতিহাস প্রশ্নমালা (বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত) বস্তুবিচার, পাটীগণিত : লঘুকরণ, মিশ্র সঙ্কলন ও ব্যাকরণ, ধারাপাত, পণ, কাঠা ও সের।

৪র্থ বৎসর :- সীতার বনবাস ২য় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত, পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ ১৭ পৃষ্ঠা (বাদ চকোর ও চাতক), ৩৭ পৃষ্ঠা মুমূর্ষু সময়ে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি উক্তি, ৫০ পৃষ্ঠা দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, ৫৫ পৃষ্ঠা পুষ্প পর্যন্ত, ব্যাকরণ : স্ত্রী প্রত্যয়, কারক ও সমাস (লোহারামের ব্যাকরণ), ভূগোল : ভূগোল পরিচয় – চার মহাদেশের সাধারণ জ্ঞান, বাদ ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, নারীশিক্ষা: দ্বিতীয় ভাগের ভূগোল, ইতিহাস : ইংল্যান্ডের

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস (রামকমল কৃত), বিজ্ঞান : ২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান (৭০ থেকে ১১০ পৃষ্ঠা), পাটীগণিত : মিশ্র গুণন ও ভাগাহার, শুভঙ্করের হিসাব (শিশুবোধক থেকে), মনকষা, সেরকষা, বৎসর মাহিনা ও মাস মাহিনা।

৫ম বৎসর :- সাহিত্য : টেলিমেক্স প্রথম তৃতীয় সর্গ, সাবিত্রীচরিত কাব্য ৪র্থ সর্গ (সাবিত্রীর বিবাহ পর্যন্ত), ব্যাকরণ : তদ্ধিৎ ও ছন্দ বিষয় (লোহারাম কৃত), ভূগোল : ভূগোল পরিচয় সম্পূর্ণ, প্রত্যেক মহাদেশের, ভারতবর্ষের ও ইংল্যান্ডের মানচিত্র, ২য় ভাগ নারীশিক্ষা, বিজ্ঞান : নারীশিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন (১১০ হইতে ১৫৯ পৃষ্ঠা), ইতিহাস : ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত), বাদ ৩য় ও ৯ম অধ্যায়, পাটীগণিত : ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিক, শুভঙ্করের হিসাব সম্পূর্ণ।

৬ষ্ঠ বৎসরের বিশেষ পরীক্ষা :- সাহিত্য: নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস, টেলিমেক্স, চারুপাঠ ৩য় ভাগ, শকুন্তলা, সাবিত্রীচরিত কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্মিনীর উপাখ্যান, ব্যাকরণ : অলংকার, প্রবন্ধ রচনা, ইতিহাস : ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, গণিত : সম্পূর্ণ পাটিগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রথম অধ্যায়, বীজগণিত : সমানুপাত পর্যন্ত, বিজ্ঞান : ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, পদার্থের গুণ, প্রকৃত ভূগোল ও খগোল, বামাবোধিনীর বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত প্রস্তাব।[৬০]

পাঠ্যতালিকাটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য ছিল মূলত নারীর চরিত্রগঠনের শিক্ষা বা বলা চলে যেসকল গুণাবলী অর্জন করলে বাঙালি নারীর চিরাচরিত ভূমিকা আরো সুনিপুনভাবে পালন করা সম্ভব হবে সে বিষয়েই নারীকে শিক্ষা দেয়া হতো। সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হবার সাথে সাথে এটাও নির্ধারিত হয়েছিল যে, পুরুষের সমান শিক্ষা নারীর জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং যদি মেয়েরা শিক্ষিত হলে পারিবারিক বিশৃংখলা তৈরি হয় তাই তাদের পাঠ্যক্রমে ধর্ম, ভক্তি, নৈতিক উপদেশ সমৃদ্ধ এবং দৈনন্দিন পারিবারিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় যে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে তা বামাবোধিনী সভার অন্তঃপুর শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অনুরূপ ছিল, নুতন বিষয় হিসেবে ইংরেজি অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* ও *দ্যা ল্যান্ডমার্ক অব এনসিয়েন্ট হিষ্ট্রি* নামে দুটি বই যুক্ত হয়।[৬১] ১৮৮২-তে ভারত সংস্কার সভা মেয়েদের পরীক্ষার জন্য যে পাঠ্যক্রমের প্রস্তাব দিয়েছিল তা ছিল,

১। ইংরেজি – ক) হ্যামলেট ১ম অঙ্ক, ৩য় অঙ্ক যথাক্রমে ল্যারেটিসের প্রতি পোলোনিয়াসের উপদেশ; হ্যামলেটের স্বগোতক্তি এবং রাজার স্বগোতক্তি, মার্চেন্ট অব ভেনিস – বিচারদৃশ্য, খ) ঈশার পর্বতোপরি উপদেশ এবং রূপকোক্তি, মথু (ম্যাথিউ?) ৫ম, ৭ম অধ্যায়, মথু ১৩ ও ২৫ অধ্যায়, লুক ১৪ অধ্যায়, গ) ব্যাকরণ ও রচনা।

২। বাংলা – ক) মহাভারতের বনপর্ব–শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান, নলদয়মন্তীর উপাখ্যান, যুধিষ্ঠির ও ধর্মের কথোপকথন; শান্তিপর্ব–ভীষ্মের যোগ বিষয়ে উপদেশ, খ) রচনা।

Dhaka University Institutional Repository

৩। গণিত

৪। ইতিহাস ও ভূগোল

৫। প্রাকৃতিক ধর্মবিজ্ঞান

৬। স্বাস্থ্যরক্ষা

৭। সঙ্গীত ইত্যাদি[৬২]

নারীর রমণীসুলভ গুণাবলী বিকাশের উদ্দেশে শুরু হলেও এই শতকের সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে ক্রমশ নারীশিক্ষা তাত্ত্বিক স্বীকৃতি পেতে থাকে যার প্রমাণ পাওয়া যায় মেয়েদের বিদ্যালয় এবং ছাত্রীসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার থেকে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বৃটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলায় ১৮৬৩ তে বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ৯৫ টি এবং ছাত্রীসংখ্যা ২,৪৮৬ জন, ১৮৭১-এ বিদ্যালয় সংখ্যা ৩৪৪ এবং ছাত্রীসংখ্যা ৬,৭১৭, ১৮৮১-তে বিদ্যালয় সংখ্যা ১,০৪২ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৪৪,০৯৬, ১৮৯০-এ এই সংখ্যা দাঁড়ায় বিদ্যালয় ২,২৩৮ এবং ছাত্রী ৭৮,৮৬৫।[৬৩] ১৯০১ সনের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ব্রাহ্ম পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার হার ৫৫.৬ শতাংশ এবং ইংরেজি জানেন ৩০.৯ শতাংশ, বৈদ্যদের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার হার ২৫.৯ শতাংশ, ইংরেজি জানেন .৮ শতাংশ, কায়স্থদের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার হার দেখা যায় ৮.০ শতাংশ এবং ইংরেজি শিক্ষার হার .৪ শতাংশ, আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই হার দাড়াঁয় যথাক্রমে ৫.৬ শতাংশ এবং .১ শতাংশ।[৬৪] এই সময়ে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন এবং বেথুন কলেজে এফ এ এবং স্নাতক বিভাগ চালু হয়। ১৮৭৯ সালে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখি বসু এই কলেজ থেকে প্রথম দুই বাঙালি মহিলা স্নাতক হিসেবে সম্মানিত হন। পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

(৪)

তবে ওপরে বর্ণিত চিত্র সমাজের হিন্দু ধর্মাবলম্বী অংশের জন্য প্রযোজ্য। অপরদিকে মুসলিম সমাজের চিত্র ছিল ভিন্ন। নারীশিক্ষার প্রশ্নে হিন্দু সমাজের চাইতে মুসলিম সমাজ অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। শুধু নারীশিক্ষাই নয়, বৃটিশদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে হতাশাগ্রস্থ মুসলিম সমাজ বৃটিশ প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত ছিল, ফলস্বরূপ উনিশ শতকের শুরুতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে সংস্কার আন্দোলন দেখা গিয়েছিল তা মুসলিম সমাজে দেখা যায় নি। এমনকি মুসলমানরা প্রতিবেশী হিন্দুদের চাইতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। বাংলার মুসলমানদের নবচেতনার উন্মেষকাল বলা যায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে।[৬৫] এই পর্যায়েই বাঙালি মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে আধুনিকায়নের পথে অগ্রসর হয়। বাংলায় এই অগ্রসর দলের নেতৃত্বে যাদের নাম নেওয়া হয় তারা হলেন সৈয়দ আমীর আলী, আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর হোসেন, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান প্রমুখ। এই শ্রেণি সমাজসংস্কারের পাশাপাশি ধর্ম ও শিক্ষাসংস্কারের আন্দোলন শুরু করে মুসলিম সমাজের মানস জগতে পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়। ক্রমে এদের মধ্যে বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আয়ত্ব করবার প্রচলন শুরু হয় এবং বাংলার নবজাগরণের মূল স্রোতধারার সঙ্গে তাদের আত্মিক সংযোগ স্থপিন হলে তারা বাংলার মুসলমান থেকে বাঙালি মুসলমানে উন্নীত হয়।[৬৬] তবে সামগ্রিকভাবে বাংলার মুসলমান সমাজে জাগরণ শুরু হলেও তাদের একাংশ অর্থাৎ নারীসমাজ তখনও পর্যন্ত ছিল উপেক্ষিত এবং তাদের শিক্ষার বিষয়টি ছিল অবহেলিত। বাংলার মুসলমানদের বিষয়ে বলতে হয় এই সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ নারীশিক্ষার বিরোধী ছিল। পুরো উনিশ শতক জুড়ে মুসলিম নারী শিক্ষার হার ছিল খুবই নগণ্য। সমকালীন সমাজভাষ্যে এদের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হচ্ছে, এদের জন্য কঠোর পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল, বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল বহুল পরিমাণে, বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না, গুরুতর অসুস্থ হলেও মেয়েদের ডাক্তার দেখানো নিষিদ্ধ ছিল। এক কথায় মেয়েদের সত্তার কোনরূপ স্বীকৃতি ছিল না, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে থাকার ফলে নিজেদের দুর্গতি অনুভব করবার শক্তি তাদের ছিল না। উনিশ শতকের শেষভাগে যখন বাংলার মুসলমান সমাজে জাগরণ শুরু হয় তখন তারা উপলব্ধি করতে শেখে যে প্রতিবেশী হিন্দু ও ব্রাহ্ম নারীদের তুলনায় মুসলিম নারীরা কতটা পিছিয়ে আছে। তারা এটাও অনুধাবন করেছিলেন মুসলিম সমাজের সার্বিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ ছিল মুসলিম নারীজাতির হীনঅবস্থা।[৬৭] আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানগণ একথাও বুঝেছিলেন যে তাদের নারীসমাজের দুর্দশা ও অনগ্রসরতা মিটিয়ে নারীসমাজকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারীশিক্ষার বিস্তার, তবে বিষয়টি উপলব্ধিতে আসলেও কার্যকরী কোন পদক্ষেপ প্রাথমিকভাবে দেখা যায় না কারণ রক্ষণশীল সমাজপতিরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। মুসলিম মেয়েরা মূলত গৃহে মা এবং অন্যান্য বয়স্ক মহিলাদের তত্ত্বাবধানে ঘরের কাজ এবং রান্নার কাজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। ধর্মীয় শিক্ষার অংশ হিসেবে তাদেরকে কোরান শরীফ পরতে শেখানো হতো। ১৮৯১-৯২-তে কোরান স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪ এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৬ যা ১৮৯৭-তে বৃদ্ধি পেয়ে স্কুল সংখ্যা হয় ১১ এবং ছাত্রী সংখ্যা ১৪২; ১৯০৭-এ দেখা যায় স্কুল ১৭ টি এবং ছাত্রী ২৫৪ জন।[৬৮] বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার পথ প্রদর্শক খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। এই সময়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মিশনারী স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের দেখা যায়। ১৮২২-এ মিসেস কুক যখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন শ্যামবাজার অঞ্চলে একজন মুসলিম মহিলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাকে সাহায্য করেন, তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্কুলটির জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করেন এবং নিজের পাড়াতে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৬৯] তবে তাঁর নাম জানা যায় না। তাঁর স্কুলটি শুরু হয় ১৮ জন ছাত্রী নিয়ে, পরে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ জনে উন্নীত হয়।[৭০] কলকাতার গৌরী বাড়িতে 'ফিমেল জুভেনাইল স্কুল'-এ ১৮২৩ সনে অনুষ্ঠিত ছাত্রীদের পরীক্ষায় ১৪০ জনের উপর হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রী যোগদান করে।[৭১] মিসেস উইলসনের নেতৃত্বে ১৮২৫-এ যে লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর উদ্যোগে কলকাতার মুসলমান প্রধান অঞ্চল এন্টালি ও জানবাজারে

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং এইসব অঞ্চলের মুসলমানরা একাজে তাদের সহযোগিতা করে।[৭২] লেডিজ সোসাইটি ও লেডিজ এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত স্কুল সমূহ প্রধানত কলকাতা ও তার আশেপাশের এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং মুসলিমদের অংশগ্রহণ এই পর্যায়ে ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রথম পূর্ববঙ্গে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। তারা ঢাকা এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। তবে পূর্ব বঙ্গে মিশনারীদের প্রচেষ্টা মুসলিমদের মধ্যে খুব একটা সফল হয় নি। কারণ হিসেবে দেখা যায় প্রথমত, মিশনারীদের প্রচেষ্টা পূর্ববঙ্গে সীমিত আকারে ছিল, দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের নিকট তাদের প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হয় নি, এছাড়াও মিশনারীদের প্রচেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি বিধায় মুসলমানরা মিশনারী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে।[৭৩] মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নারীশিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক, মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় এই প্রচেষ্টারও অভাব ছিল। মুসলিম মেয়েদের করুন পরিস্থিতির প্রসঙ্গ প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় নওয়াব আব্দুল লতিফের এক প্রবন্ধে।[৭৪] ১৮৬৮ (মতান্তরে ১৮৬৭)-তে বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের সভায় তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। তবে তিনি নারীশিক্ষার বিষয়ে কোন বাস্তব পরিকল্পনার কথা বলেন নি বরং নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রক্ষণশীল।[৭৫] প্রবন্ধ পাঠ শেষে আলোচনাকালে সাহিত্যিক প্যারিচাঁদ মিত্র নারীশিক্ষা বিস্তারে মুসলমান সমাজের প্রয়াসের বিষয়ে জানতে চাইলে কলকাতা মাদ্রাসার মৌলভী জনাব আব্দুল হাকিম যে বক্তব্য প্রদান করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেন

> নারীশিক্ষা মুসলমান সমাজে অপ্রচলিত নয় এবং এর জন্য মুসলমানদের বাহির হতে কোনরূপ উৎসাহিত করে তোলার প্রয়োজনও নেই, তাদের ধর্মেই অনুরূপ নির্দেশ রয়েছে। মুসলমানদের নবীও সমভাবে নারী পুরুষের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী কন্যাগণ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের কেহ কেহ বিখ্যাত কবিও ছিলেন যে সব লেখা অদ্যাবধি বেঁচে আছে। অনুরূপভাবে বাগদাদ, দামেস্ক ও কর্ডোভার খলিফাদের স্ত্রী কন্যারাও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। দিল্লীর বেগম ও বাদশাহজাদীদের লেখা গ্রন্থ বর্তমানেও নিস্প্রভ হয়ে যায় নি। মনে হয় মুসলিম সমাজের মত অন্য কোন সম্প্রদায় নারীশিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে নাই। তারা জানে শিশুরা তাদের মায়েদের নিকট হতে প্রাথমিক ধ্যানধারণা লাভ করে থাকে, তাই শিশুরা যাতে নষ্ট হতে না পারে সে জন্য পূর্ব থেকেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে রেখেছে। অধিকন্তু একজন শিক্ষিত নারী পারিবারিক বিষয়ে তার স্বামীকে কত বেশী সাহায্য করতে সক্ষম সে সম্পর্কেও তারা ওয়াকেবহাল। তবে যে কাজটি মুসলমানরা করতে সক্ষম নয় তা হলো, অন্য জাতির মতো তাদের নারীদের স্কুল কলেজে পাঠাতে পারে না। কারণ ধর্মত তারা, তাদের নারীদের পর্দা পুষিদামত রাখতে বাধ্য।[৭৬]

বক্তব্যটিতে স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, মুসলিম সমাজ নারীদের শুধু পর্দার অন্তরালে রাখতেই অভ্যস্ত ছিল না, বরং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকেও দূরে সরিয়ে রেখেছিল এবং মুসলিম আলেমসমাজ নারীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এক্ষেত্রে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর দেখা পাওয়া যায় সৈয়দ আমীর আলীর মধ্যে। সামগ্রিকভাবে মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের এবং বিশেষত মুসলিম নারীসমাজের অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে *ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন* ও পরে সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৯৯-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত মোহামেডান কনফারেন্সের সভায় তিনি বলেন

> আমাদের নারীরা কি যে শিক্ষা আমরা আমাদের সন্তানদের দিতে চাই তা দিতে সক্ষম? এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের ধর্মে মেয়েদের বলা হোত মানুষের (পুরুষের) মা। তাদের কি আমরা এখন সে নাম দিতে পারি? ... এটি সত্য যে যদি আমরা সভ্যতায় অগ্রগামী হতে চাই, সভ্যজগতের সম্মান অর্জনে ইচ্ছুক হই, তাহলে উচিত হবে তাদিগকে পূর্বে সমাজে তাদের যে স্থান ছিল, সে স্থানে উন্নত করা ... মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলা উচিৎ। তাতই সমাজে একটা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হতে পারে।... সমাজের একজনকে শিক্ষিত করে অন্যজনকে নিরক্ষর রাখলে ফল হবে মারাত্মক। সমাজের এক অংশ যদি শিক্ষিত হয় আর অন্য অংশ থাকে নিরক্ষর তবে ফল দাঁড়ায় এরূপ–শিক্ষিতরা হয় আনন্দ ভোগের জন্য নীতিবিরোধী, সমাজ যায় অধঃপতনের চরম প্রদেশে।[৭৭]

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুব অল্পসংখ্যক মানুষ উপলব্ধি করতে পারলেও এর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকের সংশয় ছিল। মুসলিমসমাজের সংস্কার আন্দোলনের অগ্রসর নেতা স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মেয়েদের শিক্ষার প্রসঙ্গে বলেন, ''সত্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যপক সংখ্যক মুসলমান পুরুষেরা যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান মেয়েদেরও সন্তোষজনক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতে মুসলমানদের সামাজিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার যে অবস্থা তা আমার মতে পারিবারিক সুখ নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট।''[৭৮] দেখা যাচ্ছে যে, স্যার সৈয়দ আহমেদ সরাসরি নারীশিক্ষার বিরোধী না হয়েও নারীশিক্ষার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। এভাবে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা ও প্রবন্ধে সীমিত আলোচনা চলতে থাকে এবং উনিশ শতকের শেষ দুই শতকে এসে নারীশিক্ষার বিষয়ে কিছু কিছু উদ্যোগ দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, ১৮৮৩- তে ঢাকা কলেজের একদল ছাত্র (এদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মজিদ, আবদুল আজিজ, ফজলুল করিম, হেমায়েত উদ্দিন প্রমুখ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজকে আলোর পথে আনবার লক্ষে তাঁরা একটি ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরী করবেন।[৭৯] মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীশিক্ষার প্রসারে সংস্থাটি ''কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে পাঠ্যক্রম তৈরী করে বইয়ের সাথে অন্দরমহলে বিতরণ করে। গৃহশিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়। মেয়েরা গৃহের অন্তরালে পড়ার এবং পরীক্ষা দেবার সুযোগ পায়। পরীক্ষার ফল তাদের হাতে পৌছানো হতো।... সর্বমোট ৩৭ জন ছাত্রী ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ এবং কোলকাতা থেকে 'সম্মেলনীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন উর্দুতে এবং বাংলায়। তেত্রিশজন ছাত্রী পাশ করে।''[৮০] সংস্থাটির সাফল্য প্রসঙ্গে নওসের আলী খান ইউসুফজায়ী বলেন, ''পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রস্থল ঢাকা নগরীতে তত্রত্য শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ তাহাদের মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর সভা হইতে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফল নিরতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে। বঙ্গের নানা জেলার মুসলমান বালিকাগণ তাহাদের সভায় গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।"[৮১] ব্রাহ্মদের অন্তঃপুর শিক্ষার অনুরূপ প্রচেষ্টা বলা যায় এটিকে। এই প্রচেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত সংস্থাটি সক্রিয় ছিল।

সুহৃদ সম্মিলনী ছাড়া আরেকটি সম্মিলনীর উল্লেখ এ সময়ে পাওয়া যায়, সেটি হলো শ্রীহট্ট সম্মিলনী। এটি প্রথমে কলকাতায় বসবাসকারী সিলেটবাসীদের মধ্যে একতা ও সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্যায়ক্রমে এই প্রতিষ্ঠান সিলেট অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মতো কার্যক্রম গ্রহণ করে। সংস্থাটির প্রচেষ্টায় সিলেটে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুল কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩-তে এই সম্মিলনীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ১০ জন মুসলিম ছাত্রী পাশ করে, পরবর্তীতে ১৮৮৪ তে পাশ করে ২১ জন মুসলিম মহিলা এবং ১৮৮৯ তে ৭৪ জন মুসলিম মহিলার কথা জানা যায়, ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৮২] মুসলিম মহিলাদের উৎসাহিত করার জন্য মৌলভী সিরাজুল ইসলাম খান বাহাদুর ১৮৮৯-এ ১০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন, ঐ বছর ছুরতুন্নেসা খাতুন হাতের কাজের বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে পুরস্কারটি লাভ করেন।[৮৩]

১৮৭৮-এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইডেন গার্লস স্কুল। এখানে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল, তবে ১৮৮০-এর মার্চ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকার সূত্রে যানা যায়, এই বিদ্যালয়ে ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে একজন ছিলো মুসলিম।[৮৪]

বাংলায় নারীশিক্ষার পথিকৃত বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৯-এ। তবে শুরুতে এর নামকরণ করা হয় হিন্দু ফিমেল স্কুল। নামকরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে মুসলিম মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮৯৬ সালে কলকাতার বিশিষ্ট মুসলিম নাগরিক ডাক্তার জহিরুদ্দিন আহমদের কন্যা বেথুন কলেজে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় মুসলমান সমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম মেয়েদের জন্য আলাদা একটি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম নাগরিক ব্যারিস্টার ই. এ. খোন্দকারের বাড়িতে এক সভায় মিলিত হয়।[৮৫] এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ ১৮৯৭-তে কলকাতায় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় উদ্বোধন হয়, উদ্বোধন করেন লেডী ম্যাকেঞ্জী । স্কুলটির নাম রাখা হয় মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম শামসি ফেরদৌস মহল।[৮৬] স্কুলটি প্রষ্ঠার সময় ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২৫, পরের বছর ৪৬ জন ছাত্রী ভর্তি হয়।[৮৭]

মুসলিম নারীদের শিক্ষার এই সকল প্রচেষ্টা ছিল পুরুষের নেতৃত্বে। এই পর্যায়ে মুসলিম নারীদের নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা কলকাতা বা ঢাকায় দেখতে পওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে প্রথম মুসলিম নারী প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি পাওয়া যায় কুমিল্লায়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ সালে এবং প্রতিষ্ঠাতা নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। সোনিয়া নিশাত আমিন এই স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বলেন, '' ১৮৫৭-র পর এই উদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া হয় যখন মুসলমানরা পশ্চিমা শিক্ষার প্রতি মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন। নবাব ফয়জুন্নেসা এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত দেশবাসীর কোনো ভবিষ্যৎ নাই।'[৮৮] কুমিল্লা শহরে তিনি মেয়েদের জন্য আলাদা দুটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একটি কুমিল্লা নানুয়া দিঘীর পারে, যে স্কুলটির অস্তিত্ব বর্তমানে পাওয়া যায় না।[৮৯] দ্বিতীয়টি ১৮৭৩ সালে কান্দির পারে স্থাপিত হয়। এটি প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮৯ সালে নবাব খেতাবপ্রাপ্তির পর তিনি এটিকে জুনিয়র উচ্চবিদ্যালয়ে উন্নীত করেন।[৯০] এটি বর্তমানে নবাব ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে বিদ্যমান। নবাব ফয়জুন্নেসা যখন কুমিল্লাতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন নারীশিক্ষা সংক্রান্ত সকল আলোচনা, পরিকল্পনা, প্রচেষ্টাই ছিল মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক এবং কলকাতাতেও মুসলিম মেয়েদের জন্য পৃথক কোন বিদ্যালয়ের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় না, এই পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে একজন মুসলিম নারী কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে এটি কেবলমাত্র মুসলিম মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না বরং প্রথম পর্যায়ে এখানে মুসলিম ছাত্রী ছিল কিনা সে বিষয়টিতে প্রশ্ন আছে। এপ্রসঙ্গে সোনিয়া নিশাত আমিন মন্তব্য করেন, ''বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত ফয়জুন্নেসার স্কুলে কোন মুসলমান মেয়ে পড়ত কিনা সন্দেহ আছে, তাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্ম অথবা হিন্দু।''[৯১] মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় ১৯০৩-এর মে-জুন সংখ্যার বামাবোধিনী পত্রিকায়। এই সংখ্যায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় সমগ্র বাংলায় ১,০০৩২২ জন বালিকা স্কুলশিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং এর মধ্যে মাত্র ১% মুসলিম মেয়ে।[৯২] কাজেই বলা যায় যে উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মুসলিম সমাজ তেমন উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি অর্জন করতে পারে নি।

(৫)

উনিশ শতকের নবজিজ্ঞাসার প্রভাবে আলোকিত বাংলার পুরুষসমাজ তাদের অর্ধাঙ্গীনীদের অবস্থার উন্নয়নে নারীশিক্ষার প্রবর্তন করেন। এই শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথমপর্যায়ের বাক-বিতণ্ডায় নারীদের কোন বক্তব্য বা শিক্ষা প্রসঙ্গে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ে পুরুষপ্রবর্তিত শিক্ষায় শিক্ষিত নারী তাদের লেখার মাধ্যমে তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে শুরু করে। কোন সময় থেকে বাংলার নারীরা লেখনী ধরেন সে প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ বলেন ১৮৫০-এর দশকে বাঙালি মহিলাদের লেখা প্রকাশ হতে শুরু করে এবং প্রথম থেকেই, ''লেখিকারা প্রায় সকলেই এমন মত পোষণ করেন যে, শিক্ষা ব্যাতীত মহিলাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ ও অমার্জিত থেকে যায় এবং অশিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে পশুর তেমন কোনো পার্থক্য নেই।''[৯৩] স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে নারীর ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় মধুমতি গাঙ্গুলির লেখায়। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় তিনি লেখেন

Dhaka University Institutional Repository

> হে বঙ্গদেশ-বাসিনী ভগ্নীগণ পুরুষদিগকে যে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদিগকেও যেরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকেও ঐ সমস্ত বিষয়ে অধিকারিনী করিয়াছেন। তাহাতে তাহাদের বিদ্যা ও জ্ঞানবলে বলবান হইয়া জগৎ পিতার নিয়মানুযায়ী কর্ম করিয়া তাহার প্রীতির পাত্র হইবেন এবং অন্তে সদ্গতি লাভ করিবেন; আর আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিব, ইহা কি আমাদিগের উচিত?....উভয় জাতিকেই সমান সমান দৈহিক ও মানসিক বিদ্যার্জনোচিত গুণে বিভূষিত করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছেন, যে উভয়ই সমান সমানরূপে জ্ঞানোৎপাদিত বিপুল বিমল সুখের অধিকারী হয়।[৯৪]

কৈলাসবাসিনী দেবী তার ব্রাহ্ম স্বামী দূর্গাচরণের কাছে বিয়ের পর লেখাপড়া শেখেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নারীজাতির অবস্থা প্রসঙ্গে *হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা* ও *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সমাজের কাছে প্রশ্ন রাখেন, ''হায় বিদ্যা শিখিলে বিধবা হইবে? বিদ্যার কি পতিঘাতিনী শক্তি আছে যে তদদ্বারা নারীগণ পতিরত্নে বঞ্চিত হইবে?''[৯৫] তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন, '' নারীগণ বিদ্যাভ্যাস করিলে দ্বিচারিনী হইবে ও সাংসারিক কার্যে উপেক্ষা করিবে তাহার প্রমাণ কী?''[৯৬] তিনি স্ত্রীলোকের শিক্ষার বিষয়ে পুরুষদের আপত্তি ও অনাগ্রহের কারণ অনুসন্ধান করে বলেন

> তাঁহারা [পুরুষেরা] বনিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না। অথবা পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিম্বা গৃহকার্যে উপেক্ষা করতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ও অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করে অথবা পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করত অন্য পুরুষকে বরণ করিতে অভিলাষী হয়, এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহারা স্ত্রীগণকে নিতান্ত নির্বোধ ও বিদ্যাভ্যাসে অশক্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেন।[৯৭]

একইভাবে স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে কামিনী দত্ত বলেন,''অস্মদেশীয় (আমাদের দেশের) মহিলাগণের জীবন, পশুজীবন তুল্যই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেহেতু তাহারা কেবল কতকগুলি জঘন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বন্য পশুর ন্যায় আহার বিহারেই রত থাকিয়া কালক্ষেপন করিতেছেন। বিদ্যাভাবে, সত্যধর্মাভাবে উহারা কি না নীচ কর্ম করিতেছেন?''[৯৮] আবার যোগমায়া দেবীর স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে যুক্তি ছিল যে মা শিক্ষিত হলে সন্তানেরাও শিক্ষিত হবে এবং একজন শিক্ষিত গৃহকর্ত্রী সংসারের সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে ও সকলের প্রতি সমান ভালবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন।[৯৯] কৃষ্ণভাবিনী দাসও স্বামীর সাহচার্যে ও উৎসাহে শিক্ষিত হন এবং স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ড যান এবং রচনা করেন *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং দেশে ফিরে স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে মত তৈরী করবার কাজে ব্রতী হন। তিনি বলেন, ''শিক্ষার বলে বলীয়ান স্বাধীন নারী যে কেবল সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করবে না তাই নয়, নবলব্ধ শিক্ষার ফলে তারা তাদের নির্ধারিত ভূমিকা আরও সুচারুরূপে পালন করতে সক্ষম হবে।''[১০০] তিনি বাঙালি নারীর জীবন বর্ণনা করেন এভাবে,

''পশুর মতন নারীর জীবন,

Dhaka University Institutional Repository

না জানি কি গেল, কোথায় কি হলো
জগতে অথবা ভারত মাঝারে।
অধিনতা পাশে থাকি সদাই,
থাকি অন্যমনা, কেলেশ দেখি না
সুখে মগ্নভাবে জীবন কাটাই"[১০১]

পরবর্তীকালে ইন্দিরা দেবী নারীশিক্ষা মেয়েদের মধ্যে যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে তার একটি বর্ণনা দেন, যা নিম্নরূপ

- বুদ্ধির উদারতা বা সাম্যভাব। অর্থাৎ ভালোমন্দ-সত্যমিথ্যা হিতাহিত যৌক্তিক-অযৌক্তিক বুঝিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা। অন্ধ সংস্কার বা অভ্যাসের সম্পূর্ণ বশীভূত না হওয়া।
- আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান। সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী বা অতিসংকুচিতা ভীতা না হওয়া।
- সময়ের মূল্যবোধ বা নিয়মিতরূপে নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন। গৃহস্থালীতে সুশৃংখলার চেষ্টা। রন্ধনাদি ছাড়াও অপরাপর শিল্পকর্মে মনোযোগ।
- বেশভূষা ও গৃহসজ্জায় অধিকতর পারিপাট্য। কেবলমাত্র শুচিতা নহে, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার দিকেও দৃষ্টি। আধুনিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান।
- গৃহ এবং পরিবারের বাহিরেও মনকে প্রসারিত করা, সকল প্রকার সমাজে মিশতে পারা, পৃথিবীর খোঁজখবর রাখা। সামাজিক উন্নতিচেষ্টায় যোগ দেওয়া।
- স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিনী বা সকল বিষয়ে তাহার সহকারী ও হিতকারী হইবার উপযোগিতা। নানা বিষয়ে একালের পরিবর্তনশীল সমাজের যোগ্য হওয়া। সন্তানের শিক্ষার সাহায্য করিবার ক্ষমতা।[১০২]

সুদীর্ঘকাল অন্ধকার, অশিক্ষা-গোড়ামী কুসংস্কার ও পুরুষ শাসিত সমাজের নিয়ন্ত্রণে থাকবার পর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে দেখা যায় কিছুসংখ্যক নারী নিজেরাই শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছে এবং এ প্রসঙ্গে তাদের মতামত প্রকাশ করছেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে নারীরা যে শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছে তার প্রধান আদর্শ এবং লক্ষ্য কী ছিল? এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ মনে করেন যে, "যেহেতু বিবাহই ছিলো শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য, সেহেতু শিক্ষা বলতে মহিলারা সাধারণত যা বুঝতেন, তা হলো এক ধরনের প্রশিক্ষণ। যার মাধ্যমে তাঁরা আচার-আচরণ এবং অন্য কতগুলো গুণ আয়ত্ব করে সমাজ নির্ধারিত 'আধুনিক' স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারেন।"[১০৩] এই বক্তব্যের যথার্থতা তৎকালীন মহিলাদের রচনায় পাওয়া যায়, কৃষ্ণভাবিনী দাস বাঙালি গৃহে স্ত্রী শিক্ষার অভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যে অসম্পূর্ণতা থেকে যায় সে প্রসঙ্গে বলেন

> লোকে বিবাহ করে কেন? সকলেই-স্বদেশীয়, বিদেশীয় সমস্বরে উত্তর দেবেন, পৃথিবীতে জীবনের সমদুঃখভাগিনী, সহধর্মিনী, সহকারিণী, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। স্ত্রী পুরুষ সমভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করেন, একসঙ্গে ঈশ্বরের

Dhaka University Institutional Repository

> উপাসনা করেন ... আমাদের দেশের দম্পতিদের জীবন কী কষ্টকর তাহা বুঝিতে না পারিলে মনে ভয়ঙ্কর বিষাদ উপস্থিত হয়। অবরুদ্ধ স্ত্রী, স্বামী কী প্রকার সমস্ত দিন কাটান তাহা জানে না, এবং স্ত্রী কীভাবে কাল যাপন করেন তাহাও স্বামী জানেন না। বাবুদের নামে বাড়ির গৃহিণীরা ভয় পান। বাবুরা সুন্দর সাজানো বৈঠকখানায় বসিয়া হুকা টানেন, তাস পেটেন কিংবা ইয়ারবর্গের সহিত গল্প আমোদ করেন ও বেড়াইতে যান, ... স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন তিনি কী প্রকারে ভাল খাইবেন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবেন তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামী তাহার প্রতি যথার্থ ব্যবহার করেন না ... স্ত্রী পুরুষের যথার্থ কী সম্পর্ক আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই বোঝেন।[১০৪]

বামাসুন্দরী দেবীর রচনাতেও গৃহকর্মে সুনৈপুণ্য ও দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অধিক সুন্দর সম্পর্কের উপরেই গুরুত্বআরোপ করা হয়। ১৯৬১-তে তিনি *কী কী কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে* শীর্ষক এক নিবন্ধে বলেন

> Women's education can benefit the country in many ways. Women of our country are completely ignorant about good domestic management, proper behaviour with relatives and the rearing and educating of children. ..... A wife who is competent in houswork, dear to her husband, soft-spoken, modest, bashful, chaste, virtuous, paying homage to the one god, enjoys eternal happiness both in this world and the next. .... We are unable to describe in words what harm is being done by the absence of education among women. If a learned , liberal, broad-minded man marries an ignorant, quarrelsome, and mean-minded wife the company of that illiterate spouse can never give him any mental satisfaction. ..... The extreme disharmony between the two cause that which is highly respected by one, to be held in neglect and contempt by the other. Thus these couples endure intolerable suffering all their lives due to lack of knowledge and educatinon.[১০৫]

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক নারী-পুরুষ উভয়েই একই ধারণা পোষণ করতেন যে, নারীদের শিক্ষা দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ভালো স্ত্রী ও মা হওয়া। তখন পর্যন্ত এই বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত ছিল যে নারী ও পুরুষের আকারগত ভিন্নতার মত সমাজে তাদের ভূমিকাও ভিন্ন এবং এটি প্রকৃতি নির্ধারিত। যে কারণে নারীর জন্য এমন শিক্ষাই কাম্য ছিল যা তার ''সতীত্ব, আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দয়া, নিবেদন, সেবা ইত্যাদী নারীসুলভ গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবে।''[১০৬] রাধারানী লাহিড়ী এ প্রসঙ্গে বলেন

> যেমন স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন সেইরূপ তাহাদের কার্যও যে বিভিন্ন ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ... হৃদয় সম্বন্ধে যখন নারীজাতি প্রধান, তখন, তাহার পরিচালনাই যে তাঁহাদের প্রধান কার্য এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং কার্যে সেই মনোবৃত্তি সম্যক স্ফুরিত হয়, তাহাই নারীজাতির অবশ্য ও একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়। ... বিদ্যাশিক্ষা পুরুষের ন্যায় নারীরও অতীব প্রয়োজনীয়। নারীজাতি সম্পূর্ণ শিক্ষিত হইয়া আপনার কোমল ভাবকে আরও বর্ধিত করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করেন ইহাই অভিপ্রেত।[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীশিক্ষার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে মতান্তর থাকলেও সার্বিকভাবে বলা চলে উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ঘটে এবং তার ক্রমকিাশ ঘটতে থাকে। তবে সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ক প্রশ্নটি কয়েক দশক পূর্বে যা ছিল সমাজসংস্কারক এবং আলোচকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তা উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে তার গুরুত্বটি হারায়। তৎপরিবর্তে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ সেই স্থানটিতে অবস্থান গ্রহণ করে, বলা চলে সমাজসংস্কারের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু অধিক গুরুত্ববহ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। এর কারণ হিসেবে কি ধরে নেয়া হবে যে, শতকের প্রথমার্ধে যে নারী প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল শতকের শেষার্ধে তার সর্ব্বোচ্চ সন্তুষ্টি সহকারে সমাধান হয়েছিল? বর্তমানের ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই মতবাদটি মেনে নেন নি।[১০৮] আধুনিক ঐতিহাসিকরা বরং মনে করেছেন জাতীয়তাবদী মতাদর্শ নারী প্রশ্নটির সমাধান করতে পারে নি বা এই সমাধানের চেষ্টা করে নি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে জাতীয়তাবাদী ধারণা গড়ে উঠেছিল কতগুলো বৈপরীত্যকে অবলম্বন করে যেমন, ঐতিহ্য/আধুনিকতা, ঘর/বাহির, ব্যক্তিগত/জনপরিমণ্ডল, পুরুষ/নারী আধ্যাত্মিক/ জাগতিক ইত্যাদি।[১০৯] এই বৈপরিত্যসমূহকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হচ্ছে ব্যক্তির বহির্জগত (যাকে তিনি বলেছেন outer domain) ও অপরটি হচ্ছে ব্যক্তির অন্তর্জগত (যা হচ্ছে inner domain) । তিনি দেখিয়েছেন আধ্যাত্মিক (spritual) দিক থেকে উন্নত ভারত জাগতিক (material) ভাবে উন্নত বৃটিশদের কাছে বহির্জগতে পরাজিত হবার গ্লানিকে ঢাকবার জন্য তার ব্যক্তিগত জগতে অধিক মনোনিবেশ করে এবং এই পর্যায়ে তার প্রয়োজন হয় গৃহের ধারণাকে নতুন করে তৈরি করতে এবং এক নতুন নারীর ধারণা নির্মাণ করার। নব্য জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে প্রয়োজন হলো এমন এক নতুন নারী সৃজন করা যে নারী হবে প্রাচীনা থেকে পৃথক আবার বিদেশীয়ানা থেকে দূরে । এই নারীর নান্দনিক আবেদন হবে স্বদেশী সমাজের আত্মাভিমানের মূল ভিত্তি। জুডিথ ই. ওয়ালস এই ধারণাকে বলেছেন পিতৃতান্ত্রিকতার নব্য সংস্করণ বা নয়া পিতৃতন্ত্র (new patriarchy)।[১১০] ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত ধিরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত *সতির সহিত কথোপকথন* গ্রন্থে লেখক সমকালীন একজন পুরুষের কাছে কাঙ্খিত আদর্শ নারীরূপটি কেমন ছিল তাই অঙ্কন করেছেন নববিবাহিত স্বামী তার স্ত্রীকে আদর্শ স্ত্রী হয়ে উঠবার জন্য যে গুণাবলী আবশ্যক হিসেবে নির্ধারণ করে দেন তার মধ্যদিয়ে।[১১১] এসময়ে দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষা যে কেবল সমাজে স্বীকৃত হয় তাই নয় বরং আদর্শ গৃহিনী হয়ে উঠবার জন্য কিছুটা আবশ্যিক হিসেবেও পরিগণিত হতে থাকে। যুক্তি হিসেবে দেখা যায় যে এই সময়কালের মধ্যে এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ একজন নারীর জন্য অধিক মাত্রায় সংস্কৃতিবান হবার ক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে এবং তা তার গার্হস্থ্যক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে না।[১১২] কাজেই বলা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজসংস্কারকেরা নারীর উন্নয়ন কল্পে যে আন্দোলন সূত্রপাত করেছিলেন শতাব্দি শেষে জাতীয়তাবাদী

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে নারীবিষয়ক চিন্তায় ভাটা পরলেও স্বাভাবিকভাবে নারীশিক্ষা সমাজস্বীকৃত হয়। এ সময়ে সংস্কারের যুগের সমাপ্তি ঘটে।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্যবিবরণীতে তাঁর পরিকল্পিত হিন্দু মেলার প্রস্তাব করে বলেন, 'It is proposed that a society be established by the influential members of native society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal'[১১৩] এই হিন্দু মেলা প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র বাগল উল্লেখ করেন যে,

> বঙ্গে হিন্দু মেলার ভিতর দিয়াই ভারতবাসীর সর্ববিষয়ে আত্মস্থ হইবার প্রয়াস প্রথমে সূচিত হয়।--- তখনই স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের দিকে বাঙালির মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। স্বদেশী শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শিতা দেখাইয়া বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা পারিতোষিক স্বরূপ পদকাদি প্রাপ্ত হন। ইহার পর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের অন্তর্নিহিত সাজাত্যবোধ নানা দিকে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। ধর্ম সমাজ শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহারা প্রথমে সঙ্ঘবদ্ধ হন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে কেহ কেহ রাজনীতি ক্ষেত্রেও পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।[১১৪]

নব্য জাতীয়তাবাদী চেতনায় বাঙালি নারী কতটা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই হিন্দু মেলাকে কেন্দ্র করে। তখনও পর্যন্ত বাঙালি মেয়েদের পক্ষে পুরুষদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা সম্ভব না হলেও এই মেলায় মেয়েদের হস্তশিল্প প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এবং শিল্পনৈপুণ্যের জন্য মহিলাদের 'হিন্দু মেলা' নামে রৌপ্যপদক দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে মেয়েদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্ভব না হলেও তাদের মনে জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশী চেতনা সৃষ্টির প্রচেষ্টাও দেখা যায় কোন কোন পুরুষের লেখনীতে, যেমন মহিলাদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে এক প্রবন্ধে বলা হয়,

> আমাদের রমণীগণ বিলাতী আদর্শানুবর্তিনী হইয়া যে সকল সূচীকর্ম ও সামান্য সামান্য কারুকার্য প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে সকল ইউরোপীয় প্রতিরূপ দেখিয়া চিত্র করিতে শিখিতেছেন, তাহার প্রদর্শন দ্বারা সম্যক ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবহার পক্ষে সেইসব শিল্পকর্মের উপযোগিতা অতি অল্প– না সমাজের কাজেলাগে, না সমাজের উপকারে আইসে–যাহাদিগের পূর্বসমাজ ও পূর্বসভ্যতার অনিবার্য পরাক্রম অদ্যাপি দেদিপ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে বিপরীত ভাবাপন্ন অপর দেশীয় সভ্যতার প্রচলন শুভও নয়, সুসাধ্যও নয়, সুসিদ্ধ হইবারও নয়। বরং পূর্বকার সেই সকল শিল্পাদির সংশোধন ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করা উচিত।[১১৫]

এভাবে উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে স্বদেশবোধের চেতনায় উজ্জীবিত বাঙালিসমাজ অন্তত এটা স্বীকার করে নিয়েছিল যে নারীদের মধ্যেও এই বোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে দুইজন বাঙালি নারী সর্বপ্রথম যোগদান করেন। এরা হলেন কংগ্রেস নেতা জানকীনাথ ঘোষালের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তী বৎসর কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে এই দু'জন প্রতিনিধির সম্মান নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায়, উনিশ শতকে বাংলাদেশে নবজাগরণের প্রভাব বাঙালি জীবনকে বহু ধারায় প্রবাহিত করেছিল । বঙ্গরমণীরাও সেই কর্মযজ্ঞে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিলেন দক্ষতার সঙ্গেই। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে নারীদের নিজস্ব ভাবনা বিকশিত হবার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারই নারীর জীবনে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনার বীজ বপন করে। এই পালাবদলের সুযোগ প্রাথমিকভাবে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের কাছেই পৌঁছেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করে। উনিশ শতকে নবজাগরণের মূল বিষয় হিসেবে নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বলাভ করতে শুরু করে এবং মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় কুড়ি শতকে ভারতীয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মেয়েরা অংশীদার হয়। আর এভাবেই বাঙালি নারীর রাজনীতিকরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সূচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫), পৃ. ১
২. Radha Kumar, ***The History of Doing : An Illustrated Account of Movement for women's Rights and Feminism in India, 1800-1990,*** (New Delhi: Kali for Women, 2002), p. 7
৩. উদ্ধৃত : ছবি বসু, *বাংলার নারী আন্দোলন, ছবি বসুর রচনা সংকলন*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫), পৃ. ২৭১
৪. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৩), পৃ. ৪৩
৫. বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস* , পৃ. ৫
৬. ঐ, পৃ. ৬-৭
৭. A.S. Altekar, 'The Position of Women in Hindu Civilization: Retrospect and Prospect', Kumkum Roy (ed.), ***Women in Early Indian Societies***, (New Delhi: Manohar Publishers & Distributors, 2005), p. 49
৮. ibid, p. 51
৯. ড. সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, (কলকাতা: অপর্না বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ২০০৫) পৃ. ১৩১
১০. সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী', পুলক চন্দ (সম্পাদিত), *নারীবিশ্ব*, (কলকাতা : গাঙচিল, ২০০৮), পৃ. ১৭
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১২. Altekar, 'The Position of Women in Hindu Civilization: Retrospect and Prospect', p. 51
১৩. ibid', P. 55, বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৩২
১৪. মল্লিকা ব্যানার্জী, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই-একটি ভাবনা',সুপর্ণা গুপ্ত (সম্পাদিত), *ইতিহাসে নারী : শিক্ষা*, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১), পৃ. ৪৩
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৭৮
১৬. Anup Taneja, ***Gandhi, Women, and the National Movement, 1920-47,*** (Delhi: Har-Anand Publications, 2005), p. 23
১৭. ঐ, পৃ. ২৪
১৮. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালী ভদ্রমহিলা*, (ঢাকা: ইউ পি এল, ১৯৯৮), পৃ. ৪
১৯. গোলাম মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, (কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০১), পৃ. ২১
২০. ঐ, পৃ. ২১
২১. শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার নারী জাগরণ*, (কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৭
২২. ঐ, পৃ. ১৭-১৮
২৩. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ২৫৩
২৪. ঐ, পৃ. ২১১
২৫. Judith E. Walsh, ***Domesticity in Colonial India: What Women Learned When Men Gave Them Advice,*** (New Delhi: Oxford University press, 2004), p. 2
২৬. উদ্ধৃত: চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালী ভদ্রমহিলা*, পৃ. ৪৭
২৭. বিনয়ভূষণ রায়, 'উনবিংশ শতকের স্ত্রীশিক্ষার একটি ধারা: অন্তঃপুর শিক্ষা', পুলক চন্দ (সম্পাদিত), *নারীবিশ্ব*, পৃ. ৮৯-৯০
২৮. ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পৃ. ২২১-২২২
২৯. চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালী ভদ্রমহিলা*, পৃ. ৩৩
৩০. ঐ, পৃ. ৩৭
৩১. ব্যানার্জী, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই-একটি ভাবনা', পৃ. ৪৪
৩২. ঐ
৩৩. ঐ
৩৪. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ২৬
৩৫. বসু, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ২৮৩
৩৬. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ২৭
৩৭. ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পৃ. ২১৪
৩৮. বসু, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. ব্যানার্জী, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই-একটি ভাবনা, পৃ. ৫১
৪০. ঐ
৪১. ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পৃ. ২১৫
৪২. চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালী ভদ্রমহিলা*, পৃ. ৪৫
৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৩৫
৪৪. ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পৃ. ২১৫-১৬
৪৫. ঐ, পৃ. ২১৭
৪৬. বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পৃ. ১৭৪
৪৭. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ২৯
৪৮. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯), পৃ. ১৬
৪৯. ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পৃ. ২২২
৫০. ব্যানার্জী, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই-একটি ভাবনা, পৃ. ৪৫
৫১. বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ১৭
৫২. ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পৃ. ২২৩
৫৩. ঐ
৫৪. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ৩১
৫৫. রায়, 'উনবিংশ শতকের স্ত্রীশিক্ষার একটি ধারা : অন্তঃপুর শিক্ষা', পৃ. ৯২
৫৬. ঐ, পৃ. ৯৩
৫৭. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ৩১
৫৮. চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালী ভদ্রমহিলা*, পৃ. ৬৩
৫৯. মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, নারী শিক্ষা : উনিশ শতক কিছু কথা, সুপর্ণা গুপ্ত (সম্পাদিত), *ইতিহাসে নারী শিক্ষা*, পৃ. ৮৭
৬০. রায়, 'উনবিংশ শতকের স্ত্রীশিক্ষার একটি ধারা : অন্তঃপুর শিক্ষা', পৃ. ৯৬-৯৭
৬১. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ৩৯
৬২. চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালী ভদ্রমহিলা*, পৃ. ৭১-৭২
৬৩. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ৩৬
৬৪. ঐ, পৃ. ৩৭
৬৫. আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩–১৯৪৭)*, (কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৪৯
৬৬. ঐ
৬৭. ঐ
৬৮. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৩৯
৬৯. ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পৃ. ২১৪
৭০. ঐ
৭১. বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, পৃ. ৩৯
৭২. ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পৃ. ২১৪
৭৩. বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, পৃ. ৩৯
৭৪. হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩–১৯৪৭)*, পৃ. ৫০
৭৫. ঐ
৭৬. বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, পৃ. ৪৪
৭৭. উদ্ধৃত, ঐ
৭৮. উদ্ধৃত, সোনিয়া নিশাত আমিন (অনুবাদ : পাপড়ীন নাহার), *বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২) পৃ. ১০৯
৭৯. ঐ, ১২১
৮০. ঐ
৮১. উদ্ধৃত,বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, পৃ. ৪৬
৮২. হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩–১৯৪৭)*, পৃ. ৭৫
৮৩. ঐ
৮৪. বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩–১৯৪৭)*, পৃ. ৭৫
৮৬. ঐ
৮৭. ঐ
৮৮. আমিন, *বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, পৃ. ১১৪
৮৯. বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, পৃ. ৩৮
৯০. ঐ
৯১. আমিন, *বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, পৃ. ১১৫
৯২. বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, পৃ. ৪৭
৯৩. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ৪৪
৯৪. ঐ
৯৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৭৯
৯৬. ঐ
৯৭. চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালী ভদ্রমহিলা*, পৃ. ৪১
৯৮. ঐ
৯৯. ঐ
১০০. বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৮৭
১০১. ঐ, ১৮৬
১০২. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, *নারীর উক্তি*, (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯২০), পৃ. ১৪-১৫
১০৩. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ৪৯-৫০
১০৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৮৭
১০৫. Bamasundari Devi, `What are the Superstition That Must be Removed for the Betterment of Our Country', Malini Bhattacharya and Abhijit Sen (ed). ***Talking of Power:Early Writtings of Bengali Women,*** (Kolkata: Stree, 2003), p. 19,20,21
১০৬. মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পৃ. ৪৯-৫০
১০৭. ঐ
১০৮. Partha Chatterjee, `The Nationalist Resolution of the Women's Question', Kumkum Sangari & Sudesh Vaid (ed.), ***Recasting Women: Essays in Colonial History***, (New Delhi: Zubaan, 2006), p. 233
১০৯. Ibide, p. 244
১১০. Walsh, ***Domesticity in Colonial India: What Women Learned When Men Gave Them Advice*** , p. 52,
১১১. ১৮৮৪ তে সত্যচরণ মিত্র প্রণীত *সতীর প্রতি স্বামীর উপদেশ*, ১৮৮৮ তে গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রনীত *গৃহলক্ষ্মী*, ঐ বছরেই জয়কৃষ্ণ মিত্র ও গিরিবালা মিত্র প্রণীত *রমণীর কর্তব্য*, ১৯০০ তে নগেন্দ্রবালা দাসী রচিত *নারী ধর্ম* সহ গার্হস্থ্য জীবনে নারীর নতুন কর্তব্য নির্ধারন করে নারীর প্রতি উপদেশমূলক বহু রচনা এসময়ে পাওয়া যায়। (সূত্র : *Domesticity in Colonial India: What Women Learned When Men Gave Them Advice*)
১১২. Chatterjee, `The Nationalist Resolution of the Women's Question', p. 244
১১৩. বসু, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ২৯৫
১১৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১
১১৫. বসু, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

স্বদেশী যুগ : ১৯০৫-১৯১৯

দেশাত্মবোধের চেতনায় উজ্জীবিত নারী

উনিশ শতকের সূচনায় অজ্ঞ, অশিক্ষিত, গৃহের চার দেয়ালে বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সর্বপ্রকার অধিকার বঞ্চিত বাঙালি নারীর যে চিত্রটি দেখতে পাওয়া যায় শতকের শেষ দশকে এসে সমাজের একাংশের ক্ষেত্রে সেই চিত্রটির আংশিক পরিবর্তন ঘটে, যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আবার এই উনিশ শতকের শেষার্ধেই দেখা যায় শতকের প্রারম্ভে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, পশ্চিমী উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার ধারক এবং পশ্চিমী নারীমুক্তির ভাবধারায় বিশ্বাসী যে পুরুষসমাজ নারীর শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করে তা পরিবর্তনের জন্য সংস্কার আন্দোলনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তাদের সংস্কারবাদের স্থানটি দখল করে জাতীয়তাবাদ। এর কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন বৃটিশ শাসনের প্রতি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত-অভিজাত শ্রেণির মোহভঙ্গকে। বৃটিশ শাসকেরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণিটির বিকাশ ঘটিয়েছিল তাদের মিত্র হিসেবে তাদের শাসন ও শোষণ কাজে এই শ্রেণিকে ব্যবহারের উদ্দেশে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই শ্রেণি বৃটিশ শাসনকে ভারতবর্ষের জন্য উন্নতির সহায়ক হিসেবে মেনে নিয়ে শাসকবর্গের সহযোগী হিসেবেই কাজ করে আসছিল, কিন্তু অচিরেই তাদের ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষের উন্নয়নে সহায়ক না হয়ে এর বিকাশসাধনকে বাধাগ্রস্ত করছে এই চেতনা থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলায় যেমন বৃটিশ শাসন সর্বাধিক ব্যাপ্তিতে বিকাশলাভ করেছিল, জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রেও বাংলার ভূমিকা ছিল অগ্রণী। জাতীয়তাবাদ বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন হয় নিজেদের অতীত ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কার ও সামাজিক সংগঠনগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক এই নতুন নেতৃত্বের কাছে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারীর প্রশ্নটিও নতুন মাত্রায় দেখা দেয়।

এই পর্যায়ে এসে দেখা গেলো, বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সংস্কারবাদের পরিবর্তে সচেষ্ট হলেন প্রাচীন ভারতে নারীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার ধারণা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। একই সঙ্গে আরেকটি বোধের জন্ম হয় আর সেটি হলো দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা। পাশাপাশি নারীকে শক্তিরূপে পূজা করবার প্রাচীন ভারতীয় রীতিটির পুনঃপ্রচলনও এই সময়ে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৮৮২ সালে রচিত *আনন্দমঠ* উপন্যাসে প্রথম দূর্গা-কালী রূপে নারীশক্তির সঙ্গে ভারতমাতার তুলনা করেন[১] এবং এভাবে শক্তিরূপে নারীর পূজাকে নূতন করে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।[২] বঙ্কিমের রচিত *বন্দেমাতরম* (মাতৃভূমির বন্দনা কর) ধ্বণিটি পরবর্তীতে স্বদেশী আন্দোলনে মন্ত্র হিসেবে জনগণকে উজ্জীবিত

Dhaka University Institutional Repository

করবার কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে তিনি তাঁর উপন্যাসে নারীর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করেছেন, পরিবর্তে তিনি বাঙালি সনাতন হিন্দু রমণীর ধারণাটিই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, যে নারী হবে প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত, সত্যিকার অর্থে ধার্মিক, অল্প বয়সে বিবাহিত,যার আচরণ হবে নম্র, ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারে যে হবে পতিব্রতা এবং পারিবারিক যে কোন প্রযোজনে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।[৩] লক্ষণীয় বিষয় হলো, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির ভেতরে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটলেও তা শিক্ষিত ভদ্রমহিলাদের ততটা অনুপ্রাণীত করে নি, এর কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, যেহেতু শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণি জনপরিমণ্ডলের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং অনেকেই বৃটিশ প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন, কাজেই তারা সহজেই বৃটিশ শাসনের অন্তঃসারশূন্যতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণসমূহ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।[৪] অপরপক্ষে বৃটিশ প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভাবে এই উপলব্ধি শিক্ষিত ভদ্রমহিলাদের মধ্যে সেভাবে জাগ্রত হয় নি, উপরন্তু নারীশিক্ষার প্রসারের মতো উন্নয়নকে তারা উন্নততর সভ্যতা বৃটিশদের শাসনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং বৃটিশ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট বলে মেনে নিয়েছিলেন।[৫] এছাড়া তখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নারীর জন্য উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র নয়, এই অভিমতই ছিল সর্বজনস্বীকৃত। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৭৫ সালে যখন ***বঙ্গ মহিলা*** নামে মহিলাদের জন্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় তখন তাতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়

> In this journal we will make special efforts to assemble as much as possible on current events. We will not discuss political events and controversies because politics would not be interesting or intelligible to women in this country at present. But we will not be adverse to describing them insofar as they touch on social customs and behavior.[৬]

১৮৮৪ সালে ***বামাবোধিনী*** পত্রিকা যখন রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে তখন তারা ব্যাখ্যা প্রদান করে এই বলে যে

> in Bengal the time to teach women about politics has not yet come. In a country where many well- educated youths are incapable of understanding politics it will be a long time before the way can be prepared for teaching politics to women. But whether our women understand politics or not, it is essential that they possess a general knowledge of the past and present state of the country.[৭]

কাজেই বলা যায় সচেতনভাবেই নারীদেরকে রাজনীতির বাইরে রাখা হতো। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫-তে। এর চার বছর পর ১৮৮৯-এ কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে দশজন নারী প্রতিনিধির উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন বাঙালি। একজন স্বর্ণকুমারী ঘোষাল এবং অপরজন কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। তবে তাঁদের উপস্থিতি ছিল শুধুমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দর্শকসাড়িতে। বক্তব্য প্রদানের কোন অধিকার তাদের তখন পর্যন্ত দেয়া হয় নি।[৮] কংগ্রেস অধিবেশনে কখন মহিলারা প্রথম বক্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

রাখেন সে বিষয়টি নিয়ে গবেষকদের কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগল-এর মতানুসারে ১৮৯০-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে এই দুইজন বাঙালি নারী প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং ''কাদম্বিনী অধিবেশন শেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দান প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতা করেন। অ্যানি বেসান্ট এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে ভারতীয় নারী জাতিরও উন্নতির দ্যোতক, এ ব্যাপারে তাহাই সূচিত হইল।''[৯] ঐতিহাসিক রাধাকুমার উল্লেখ করেন,''Another writer puts the date ten years later, saying 'the first lady speaker of the Congress was Mrs. Kadambini Ganguli, who moved the customary vote of thanks to the president of the Sixteenth Congress in 1900 (Calcutta)'.'' [১০] সময় প্রসঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও দু'টি বক্তব্যে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট তা হচ্ছে, কংগ্রেস অধিবেশন মঞ্চে প্রথম যে নারী কণ্ঠটি শোনা গিয়েছিলো সেটি একজন বাঙালি নারীর। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় ১৯০১-এ কংগ্রেস অধিবেশনে আরেক বাঙালি নারী সরলা দেবীর বিখ্যাত 'হিন্দুস্থান' সঙ্গীতটি গাইবার ব্যবস্থা করা হয়, পরবর্তী সময়ে ১৯০৫-এ কংগ্রেসের বারানসী অধিবেশনে সরলা দেবী 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি কিছু পরিবর্তন করে নিজ সুরে গেয়েছিলেন।[১১] তবে কংগ্রেস-এর এই পর্যায়ে যে নারী প্রতিনিধিত্ব দেখতে পাওয়া যায় তা প্রধানত তাদের পিতা, স্বামী, ভাই বা বলা চলে পারিবারিক সূত্রে ঘটেছিলো। অনেকাংশেই এই প্রতিনিধিত্ব ছিলো অলংকারিক ও প্রতীকি।[১২]

বাংলার নারীদের প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগটি অবশ্য স্থাপিত হয়েছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮৮৩ সালে 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ১৮৮৩-এর ফেব্রুয়ারিতে কোর্টনী ইলবার্ট ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মফস্বলের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করবার ক্ষমতা প্রদান করবার সুপারিশ করে একটি বিল প্রণয়ন করেন। এর পূর্বে কেবল শেতাঙ্গ ম্যাজিস্টেট বা জজ ব্যতীত অন্য কেউ শেতাঙ্গ অপরাধীদের মামলার বিচার করতে পারতো না। লর্ড রিপন কোর্টনী ইলবার্টের বিলে সহমত পোষণ করলে ইউরোপীয়ানরা এর বিরুদ্ধে 'ইউরোপীয়ান এ্যান্ড এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করে।[১৩] এদের প্রতিরোধের কাছে নমনীয় হতে বাধ্য হন রিপন। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শেতাঙ্গদের বিচারকালে সমান সংখ্যায় ভারতীয় এবং শেতাঙ্গ সমন্বয়ে জুরীবোর্ড গঠন করা হবে। এই সিদ্ধান্ত ভারতীয়দের কাছে অসম্মানজনক বিবেচিত হয় এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে। ইতোমধ্যে ১৮৮৩-এর মে মাসে আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর দু'মাস জেল হয়।[১৪] এই ইলবার্ট বিল আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই প্রথম বাঙালি নারীদের সরব হতে দেখা যায়। এসময়ে লর্ড রিপনের কাছে বাংলার শিক্ষিত ভদ্রমহিলাদের এক প্রতিনিধি দল এই বিলের পক্ষ সমর্থন করে আবেদন করেন। এতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন, বিনোদিনী, সুলোচনা, চপলা, ভাবিনী, মনোরমা, হরোসুন্দরী, থাকোমনি সহ আরো অনেকে।[১৫] ইলবার্ট বিল আন্দোলন চলাকালে বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকে উপলব্ধি করলেন নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করতে পারে। ১৮৮৩-তে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রথম সুপারিশ করলেন নারীজাতিকে দেশের রাজনৈতিক মানোন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত করবার জন্য।[১৬] ইলবার্ট বিল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন কবি কামিনী রায়, অবলা বসু সহ ছাত্রীরা। এদের মধ্যে ছিলেন বেথুন স্কুলের নিচু শ্রেণীর ছাত্রী সরলা দেবী, তাঁর ভাষ্যমতে

> ''এদিকে স্কুলে উপর ক্লাসের কতকগুলি মেয়েদের নেতৃত্ব-প্রভাবে আমার জাতীয়তার ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল। তাদের মধ্যে অন্যতম নেত্রী ছিলেন-কামিনী দিদি ও অবলা দিদি। তাঁদের নির্দেশগুলি আমাদের কাছে প্রবাহমান হয়ে আসত আমার দিদি ও তাঁর সহপাঠিনীদের মধ্য দিয়ে। সব সময় সব ব্যাপারগুলি না বুঝেও তাঁদের আদেশানুযায়ী কাজ করতুম। ইলবার্টবিলের আন্দোলনে সুরেন বাঁড়ুজ্য যখন জেলে যান, তখন সবাই একটা কালো রঙের ফিতে অস্তিনে বাঁধলুম। কেন তা ঠিক জানতুম না।''

এভাবে উনিশ শতকের আশির দশকে এসে বাঙলায় শিক্ষিত নারীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা কিছু মাত্রায় সঞ্চারিত হতে থাকে। তবে এই চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল শহরের শিক্ষিত ভদ্রমহিলা শ্রেণির একাংশের মধ্যে। বঙ্গভঙ্গ পূর্ব ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় এই পর্বে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে সরলা দেবীর মধ্যে। বাল্যে ইলবার্ট বিল আন্দোলনে যোগ দেয়ার মধ্যেদিয়ে তার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে তার জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। 'ভারতী' পত্রিকায় বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে তিনি দেশবাসীর মনে বৃটিশবিরোধী মনোভাব তৈরী করতে সচেষ্ট হন। তার লক্ষ্য ছিল, ''শুধু শরীরগত দৌর্বল্য হটালে হবে না, বাঙালীর মন থেকে ভীরুতা অপসারিত করতে হবে। দেখা যায়, পশ্চিম ও পাঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানেরাও সাহেব-ভীতিতে ভরা। এই সাদা চামরার ভয় সরাতে হবে।'' তাই তিনি ভারতীতে 'মৃত্যুচর্চা, 'ব্যায়ামচর্চা, 'বিলেতি ঘুষি বনাম দেশী কিল প্রভৃতি প্রবন্ধে বাঙালী জাতিকে সুস্থ-সবল হতে এবং বিদেশীদের অপমানের প্রতিবাদ করে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে আহ্বান জানান। এর ফলে উদ্বুদ্ধ স্কুল-কলেজের ছাত্ররা দলে দলে সরলা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে থাকে এবং সরলা দেবী এদের মধ্যে থেকে বাছাইকরা ছেলেদের নিয়ে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলেন। এই দলের সদস্যরা ভারতের মানচিত্রে প্রণাম করে শপথ করতেন তারা 'তনু, মন,ধন' দিয়ে ভারতের সেবা করবে। এবং এই শপথের সাক্ষী হিসেবে তাদের হাতে রাখি বাঁধা হতো। সরলা দেবী নিজ বাড়িতে এই তরুণদের জন্য ব্যায়াম এবং কুস্তি শেখাবার কেন্দ্র স্থাপন করেন। সরলা দেবী এর পরবর্তীতে বাঙালির মধ্যে স্বদেশ গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী ব্রত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তিনি প্রথমে ১৯০৩ সালে মহারাষ্ট্রের শিবাজী উৎসবের আদলে বাংলায় প্রতাপাদিত্য উৎসব চালু করেন। এর পর একই বছর তিনি উদয়াদিত্য উৎসবও চালু করেন। এই উৎসবের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সরলা দেবীর বক্তব্য ছিল, ''রাজপুত বীরবালক বাদল প্রভৃতির কীর্তি পড়ে আমরা বাঙালিরা অভিভূত হই, তাদের গৌরবে গৌরবানুভব করি, কবিতা বানাই, কিন্তু বাঙালীর ঘরের ছেলে উদয়াদিত্য যে মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায়

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখ-সমরে দেহপাত করেছিলেন–তার খবর কিছুই রাখিনে। তাঁর স্মৃতি বাঙালি যুবকের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত করে দেওয়া দরকার।" এই উৎসবের মধ্যদিয়ে তিনি বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই বাঙালি তরুণদের স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ১৯০৪-এ সরলা দেবী বাঙালিকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য প্রচলন করলেন বীরাষ্টমী ব্রতের। দূর্গা পূজার সময় মহাষ্টমীর দিন তরুণেরা তলোয়ারকে ফুল এবং চন্দন দিয়ে সজ্জিত করে ভারতের সকল বীরদের নামে স্তোত পাঠ করে অঞ্জলি দিত, মায়েরা শক্তিমন্ত্রের চিহ্ন স্বরূপ নিজের সন্তানের হাতে রাখী বেধে দিতেন, নানান ধরনের খেলার আয়োজনও এই দিন করা হতো। এই ব্রত উদযাপনের কারণ হিসেবে দেখা যাবে

> ''বহুকাল ধরে বাংলাদেশের সংস্কারে যা রয়েছে কিন্তু বাঙালীর ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে তারই পুনরুদ্ধার করা। বাঙালী মায়েদের বীরমাতা হওয়ার লক্ষপথে আবার নিয়ে আসা, সে বিষয়ে তাদের ব্রত পুনঃপ্রচলন করা। ভীরু বাঙালী মাদের হাত দিয়েই ছেলেদের রক্ষাবন্ধন করিয়ে মায়ের নিজমুখে 'বীরভব' বলে ছেলেকে বীরোচিত খেলাধূলায় কাজেকর্মে প্রবৃত্তি দেওয়ান। মাতায় পূত্রে মিলিত হয়ে দেশকে গৌরবশিখরে সমুন্নত রাখার প্রকৃষ্ট সাধনা যে দেশের ধর্মোৎসবের একটি অঙ্গ ছিল–সে দেশ আজ এত হীন এত পতিত হয়ে আছে কেমন করে।"

সরলা দেবী কর্তৃক প্রচলিত এসব অনুষ্ঠান বিশ্লেষণে বলা যায়, যে তিনি উপনিবেশিক শাসকবর্গের তুলনায় বাঙালি জাতির শারীরিক এবং মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার পূর্ব থেকেই দেশীয় পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন স্বদেশী ভাণ্ডার খোলা হতে থাকে। সরলা দেবীও এসময় নিজ খরচে একটি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' খোলেন। এটি ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা শুধু মেয়েদের জন্য একটি স্বদেশী বস্ত্রের ও দ্রব্যের ভাণ্ডার। ১৯০৪ - এ বম্বে কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন দেশীয় পণ্য প্রেরণ করা হয় এবং প্রদর্শনীতে সরলা দেবী স্বর্ণপদক লাভ করেন। সরলা দেবীর আরো একটি কৃতিত্ব হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম গানটিতে সুর দিয়ে বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে গাওয়ানো। গানটিতে প্রথমে দুটি পদে রবীন্দ্রনাথ সুর বসিয়েছিলেন, পরে তিনি তাঁর সুযোগ্য ভাগ্নি সরলাকে দায়িত্ব দেন সম্পূর্ণ গানটিতে সুরারোপ করবার জন্য। সরলা দেবীর দেয়া সুরেই গানটি সভা-সমিতিতে গাওয়া হতে থাকল। আর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির প্রচলন হয় সরলা দেবীর ভাষ্যমতে, ''বন্দে মাতরম্ শব্দটি মন্ত্র হল সর্বপ্রথম যখন মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রসেশন করে নিয়ে যাবার সময় ঐ শব্দ দুটি হুংকার করে যেতে থাকল। সেই থেকে সারাবাংলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ঐ মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ল–বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যখন গবর্নর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল আহিমালয়-কুমারিকা পর্যন্ত ঐ বোলটি ধরে নিলে।''[১৭] সরলা দেবীর স্বদেশী প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে থেকেই শুরু হয় এবং বঙ্গভঙ্গ পূর্ব সময়ে বাংলার তরুণসমাজের মনে জাতীয়তাবোধের চেতনা বিকাশে এবং তাদের স্বদেশহিতের ব্রত গ্রহণে সরলা দেবী একক নারী হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তবে যে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হলো তিনি বিশেষভাবে কেবল নারীদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচি এই পর্যায়ে গ্রহণ করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের সময় সরলা দেবীর জীবনের পটপরিবর্তন ঘটে। এই সময় বিবাহসূত্রে তিনি পাঞ্জাবে বসবাস শুরু করেন এবং তার কর্মক্ষেত্র হয় পাঞ্জাব। তবে পরবর্তী সময়ে ১৯১০-এ তিনি 'ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল' গঠন করেন এবং বাংলাতেও এর শাখা খোলা হয়।

বাঙালি জাতি বৃটিশ শাসনের মোহভঙ্গ হয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনায় যখন পরিপুষ্ট হচ্ছে ঠিক তখনই বঙ্গভঙ্গ নামক কার্জনীয় চক্রান্তের আকস্মিক ক্রুরতায় তারা প্রকাশ্য বিদ্রোহের পথে নেমে আসে। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম প্রচারিত হয়েছিল ৬ জুলাই ১৯০৫-এ। এরপর ১৯ জুলাই ১৯০৫-এ ভারত সরকার সিমলায় বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২০ জুলাই সিমলা থেকে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক চূড়ান্ত প্রস্তাব বিশদভাবে প্রকাশ করা হয়।[১৮] একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। ৬ জুলাই প্রথম প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে সকলকে প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানান। জনসাধারণের মধ্যেও ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিভিন্ন সভায় মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং অন্যান্যরা সভাপতিত্ব করেন।[১৯]

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ১৯০৫ সালে গৃহীত হলেও এই চক্রান্ত চলছিল বহুদিন ধরেই। বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের পরিচয় পেয়ে একে বাধাগ্রস্থ করবার জন্য এ প্রচেষ্টা বহুদিন ধরে চলে আসছিল। বাঙালির ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে নিজেদের স্বার্থ পূরণের নীতিতে বিশ্বাসী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী বাঙালি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাবার প্রক্রিয়া হিসেবে বঙ্গভঙ্গ-এর পথ বেছে নিয়েছিলো। আসাম বাংলা থেকে ছিন্ন হয় ১৮৭৪-এ। এই সময়ে বাংলা ভাষাভাষী সিলেট (শ্রীহট্ট), কাছাড় ও গোয়ালাপাড়াকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করে একজন চিফ কমিশনারের অধীনে আলাদা প্রদেশ গঠন করা হয়।[২০] পরবর্তী পর্যায়ে ১৯০১-এ পুনরায় বাংলাকে বিভক্ত করবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এসময় এন্ড্রু ফ্রেজারের প্রস্তাব অনুসারে উড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এন্ড্রু ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট নিযুক্ত হবার পর ১৯০৩-এ পুনরায় বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এবার প্রস্তাব নেওয়া হয় চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে কিছু কিছু আঞ্চলিক পরিবর্তনসহ যুক্ত করা হবে আসামের সঙ্গে। কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, এ প্রস্তাব কার্যকর হলে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি কলকাতার অনিষ্টকর প্রভাব থেকে মুক্ত হবে এবং পূর্ববাংলার মুসলমানরা ন্যায়বিচার পাবে।[২১] এই প্রস্তাব প্রকাশ হয় ১২ ডিসেম্বর ১৯০৩ এবং সঙ্গে সঙ্গে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, শুরু হয় বিক্ষোভ প্রতিবাদ। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৪-এর জানুয়ারির মধ্যে ৫০০ প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ববাংলায়।[২২] এদিকে ১৮ মার্চ ১৯০৪, কলকাতার টাউনহলে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। টাউন হলের দ্বিতীয় তলায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় একই সঙ্গে একতলাতেও প্রতিবাদসভা হয়। সঞ্জীবনী পত্রিকায় লেখা হল, "এমন সভা কেহ কখনও দেখে নাই।"[২৩] সরলা দেবী ২৯ এপ্রিল ১৯০৪ তারিখে প্রতাপাদিত্য উৎসবের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন

Dhaka University Institutional Repository

করলেন ক্লাসিক থিয়েটারে।[২৪] সর্বক্ষেত্রে প্রবল জনবিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও কার্জন নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে ১৯০৫-এর জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ায় ২০ জুলাই ১৯০৫ তারিখেই কৃষ্ণকুমার মিত্র সঞ্জিবনী পত্রিকার মাধ্যমে বিদেশী পণ্য বর্জন এবং ত্যাগস্বীকার করেও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করেন। বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ চলতে থাকে। সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর বাড়িতে এক সভায় সর্বজনীনভাবে বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ প্রচার ও প্রয়োগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জাতীয় কর্তব্য নির্ধারনের জন্য নেতৃবৃন্দ ৭ আগষ্ট ১৯০৫ কলকাতা টাউন হলে এক সভা আহ্বান করেন। এই সভা থেকেই নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন ঘোষণা করেন। সভায় সাংবাদিক নরেন্দ্র সেন বিদেশি দ্রব্য বর্জন সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৫]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সব থেকে সফলরূপ বিদেশী পণ্য বর্জন, এবং এই বিদেশি দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রচার এবং দেশীয় পণ্যের প্রসারের আন্দোলনকে শক্তিশালী এবং সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের সাহায্য বাঙালি পুরুষদের প্রয়োজন হয়[২৬]। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সম্পৃক্ত জাতীয়তাবাদী নেতারা এটি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, গৃহের নারীদের সচেতন করতে না পারলে তাদের আন্দোলন পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারবে না। অতএব তারা এবার উদ্যোগী হলেন নারীদের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে। তবে এই উদ্যোগ নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অথবা মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তির লক্ষে ছিল না, ছিল পুরুষদের নিজেদের আন্দলোনকে সফল করবার জন্য। এই উদ্যোগের পথম প্রয়াস হিসেবে ঐ বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রাক্কালে স্বদেশী নেতৃবৃন্দ মেয়েদের কাছে একটি আবেদন রাখলেন। ভাইফোঁটা উপলক্ষে তাঁদের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে জাতীয় ধনভাণ্ডারে দান করবার জন্য প্রচারিত এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবেদনে বলা হয়

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও ধনভাণ্ডার

বন্দেমাতরম্

ভগিনীগন, ভাইদ্বিতীয়ার আর বিলম্ব নাই।

ঈশ্বরের কৃপায় এই বৎসর হইতে তোমাদের ভাই দ্বিতীয়ার যজ্ঞ বৃহৎ হইয়া উঠিতেছে। এবার রাখীসূত্রে সমস্ত বাঙ্গালি ভাই হইয়া মিলিয়াছে। এবারে তোমরা ভাইকে নিমন্ত্রণ করিবার বেলায় দেশভাইকে ভুলিও না। ভগিনি! আমরা তোমাদের দেশভাই, সেই শুভদিনে সমস্ত বঙ্গরমণীর কোমল-হৃদয়ের কল্যাণ-কামনার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিব। সেদিন তোমাদের ঘরের ভাইয়ের অন্নের থালায় যখন অন্ন পরিবেশন করিবে, তাহাদের বস্ত্রের থালায় যখন বস্ত্র সাজাইয়া রাখিবে তখন হে কল্যাণি মনে রাখিও, ভাই তোমাদের একটি দুটি নহে – সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া বহু কোটি তোমাদের ভাই; তাহাদের অন্নের স্বচ্ছলতা নাই, তাহাদের শরীর রোগে জীর্ণ, তাহাদের পরিধানের বস্ত্রটুকু সমুদ্রপার হইতে আহরণ করিতে হয়। তাহারা অন্নবান হউক, তেজস্বী হউক, নীরোগ হউক, তাহারা নিজের দুঃখ নিজে মোচন করিবার শক্তি লাভ করুক, এই কামনা করিয়া, ভগিনীগণ সেই দেশ-ভাইদের অন্ন ও বস্ত্রের উদ্দেশ্যে সেদিন যথাসাধ্য

Dhaka University Institutional Repository

কিঞ্চিৎ দান করিও। তোমাদের কল্যাণ কামনায়, তোমাদের মঙ্গলদানে আমাদের দেশের সমস্ত ভ্রাতৃগণের ললাটের তিলক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, যমের দ্বারে যথার্থই কাটা পরিবে – এবং যে বিধাতা তোমাদিগকে বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম দিয়া বাঙালীর ভগিনী করিয়াছেন তিনি প্রসন্ন হইবেন। তাঁহার প্রসাদেই তোমাদের দেশের ও ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘরের ভাইদেরও যথার্থ মঙ্গল হইবে, ইতি। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ,/" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,/" আনন্দমোহন বসু,/" জগদিন্দ্রনাথ রায়,/" নলিনবিহারী সরকার,/" মতিলাল ঘোষ,/" ভূপেন্দ্রনাথ বসু,/" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,/"।[২৭]

এই আবেদনে সাড়া দিয়ে মেয়েরা ভাইফোঁটার খরচ বাঁচিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় তহবিলে দান করতে থাকে। পাশাপাশি রাখীবন্ধনের জন্য অন্দরমহলে বসে প্রদীপের সলতে পাকানোর মতো রাখী তৈরির কাজেও মেয়েরা ব্রতী হয়। প্রবাসী পত্রিকায় একজন লেখকের লেখায় জানা যায়, ''সেই রাখীবন্ধন দিবসে ঊষাকালে যখন আমার পূজনীয়া জননী রাখী প্রস্তুতকরণোদ্দেশে কতকগুলি উপবীতসূত্র লইয়া হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিলেন তখন আমার মনে হইল সদ্যপ্রস্তুত সূত্র দ্বারা এ রাখী প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তাঁর মাকে একথা জানাতেই তিনি টাকু বের করে সুতো তৈরি করলেন। প্রস্তুত রাখী পাড়ার ছোট ছেলেরা আকাশ-ফাটানো 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে পূর্ণ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিয়ে এল।''[২৮]

১৩১২ বঙ্গাব্দের (১৯০৫ খৃস্টাব্দ) ভাদ্র মাসে প্রকাশ হয় ***ভারত মহিলা*** পত্রিকাটি। প্রথম সম্পাদকীয়তে লেখা হল, ''রাজনীতিই হউক আর শিল্পবিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে পুরুষের শক্তি কখনও সম্যক বিকশিত হইতে পারে না।''[২৯] এই প্রথম দেখা গেল রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্রে মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে আসার পক্ষে আহ্বান জানান হল। ঐ সংখ্যাতেই কুমুদীনি মিত্র লিখলেন ***মাতৃভূমির দুর্দিনে মহিলাগণের কর্ত্তব্য***, তিনি বঙ্গনারীকে আহ্বান জানালেন

> দুর্দ্দিনে দেশের সুপুত্রগণ স্বদেশের জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা নির্জ্জীব প্রাণেও আশার সঞ্চার করে।... স্বদেশের জন্য এই যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহার উত্তাপ কি নারীজাতিকে স্পর্শ করিতেছে না? স্বদেশভক্তগণ মাতৃভূমির নামে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, নারীগণেরও কি তাহা পালনীয় নহে? দেশের এই দুর্দ্দিনে নারীগণ যদি পুরুষের সাথে সম্মিলিত না হন তবে আর আশা কোথায়?
>
> বিদেশী অশনবসনে অনুরাগ আমাদের অস্থিমজ্জায়, শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে। এতদিন স্বদেশের দ্রব্য তুচ্ছ করিয়া বিদেশী দ্রব্যের যে অত্যধিক আদর করিয়াছি, তাহার ফলে এক্ষণে দেখিতেছি যে, স্বদেশী শিল্প অনাদরে বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে। সামান্য দ্রব্যের জন্যও বিদেশের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইতেছি। আমরা স্বদেশের অকল্যাণ করিয়া বিদেশের ধনগমের পথ প্রশস্ত করিতেছি। মহিলাগণ কি স্বদেশের দুঃখে মর্ম্মাহত হইতেছেন না? তাঁহারা কি ইহার নিবারণার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? এই জাতীয় বিপদে নারীগণ কি স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রানিত হইয়া উঠিবেন না?... নারীগণ কি আজ নিস্তেজ, নিস্প্রভ হইয়া থাকিবেন? তাঁহারা কি স্বদেশের কল্যাণের জন্য বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিব না এই সামান্য প্রতিজ্ঞাটিও করিতে প্রস্তুত হইবেন না? ... রমণীগণ স্বদেশানুরাগে পুরুষদিগের পশ্চাতে পরিয়া থাকিবেন কেন? তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হইলে পুরুষেরা কখনও এই শুভকার্যে সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

তবে একবার জাগিয়া উঠি, একবার সবলে সমুদয় বিঘ্ন অপসারিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই।[৩০]

কাজেই বলা যায় যে, শুধুমাত্র স্বদেশী নেতৃবৃন্দই নয়, একই সাথে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত নারীর মনেও এই উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছিল যে স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করতে এই আন্দোলনে সকল পর্যায়ের নারীদের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তবে এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন তা হলো, নারীদের ক্ষেত্রে বয়কট আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার প্রধান লক্ষ্য ছিল পুরুষদের সৃষ্ট আন্দোলনকে সফল করা, জাতীয়তাবাদী চেতনা বা রাজনৈতিক সচেতনতা মূখ্য প্রণোদনা হিসেবে এ পর্যায়ে কাজ করে নি। বঙ্গরমণীদের বয়কট আন্দোলনে উৎসাহিত করতে *ভারত মহিলা*-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় ''স্বদেশী দ্রব্য ও বঙ্গনারী'' প্রবন্ধে লেখা হল

> বঙ্গব্যাবচ্ছেদ আন্দোলনে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে দেশের লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে নারীগণও এই সময়ে আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। নারীগণের মধ্যে অনেকে রাজনৈতিক আন্দোলন বুঝিতে না পারেন, কিন্তু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দায়িত্ব বরং বেশী। কারণ সাধারণত স্ত্রীলোকদিগের পছন্দ অনুসারেই প্রত্যেক পরিবারের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করা হয়। তাঁহাদের উৎসাহ ও সহানুভূতি না পাইলে পুরুষগণ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সংকল্প বড় বেশীদিন রক্ষা করিতে পারিবেন না। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে মহিলাগণ আপনাদিগের দায়িত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন শহরে মহিলাগণ সমবেত হইয়া এবিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন। গত ৫ই আশ্বিন নাটোরের মহারানী শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর আহ্বানে মেরি কার্পেন্টার হলে কলিকাতার মহিলাদিগের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। প্রায় এক হাজার মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। অসুস্থতা বশতঃ নাটোরের মহারানী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বি.এ. মহারানীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সভাস্থলে চারিটি প্রবন্ধ পাঠ ও উদ্দিপনাপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি এবং জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছিল। কলিকাতায় মহিলাগণের এইরূপ সম্মিলন বোধহয় এই প্রথম।[৩১]

১৬ অক্টোবর ১৯০৫, ৩০ আশ্বিন প্রতিবাদস্বরূপ ঘরে ঘরে অরন্ধনের প্রস্তাব আনলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বঙ্গব্যবচ্ছেদের দিন মুর্শিদাবাদের জেমোকান্দি গ্রামে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাড়িতে পাঁচশতাধিক নারী তার মায়ের আহ্বানে একত্রিত হন এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচিত *বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা* তাঁর কন্যা শ্রীমতী গিরিজা দেবী পাঠ করে সমবেত মহিলাদের শোনান।[৩২] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নারীদের প্রতি আহ্বান করলেন

> প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিনীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সেদিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর শুশ্রূষা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্ব্বদিনের রাঁধা ভাত ভোজন চলিবে।
>
> পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘটস্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লাগাইবেন। হরীতকী বা সুপারি ফল হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথা শেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বামহস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন।... সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশীদ্রব্য বিশেষত বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবেন। পুত্র কন্যাকে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে প্রশ্রয় দিবেন না। স্বদেশী থাকিতে বিদেশী জিনিষ গ্রহণ অধর্ম্ম

Dhaka University Institutional Repository

> বলিয়া জানিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।[৩৩]

এই প্রথম দেখা গেল নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হল। এখানে লক্ষণীয় যে স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের আহ্বান করবার জন্য ধর্মের পথকে বেছে নেয়া হয়। বাইরের জগতে নারীর প্রবেশের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাতে বিঘ্ন না ঘটিয়ে তাদের জন্য নির্ধারিত নিত্যদিনের ধর্মীয় আচার, ব্রত, প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তাদেরকে রাজনীতিতে সংযুক্ত করা হল। নিঃসন্দেহে বলা চলে মহিলাদের আন্দোলনে আনবার জন্য অরন্ধন খুবই কার্যকর একটি প্রথা ছিল। এই প্রথা অনুসারে ঘরের বাইরে বের না হয়েও নারীরা দেশের প্রতি তাদের সচেতনতা প্রদর্শনে সক্ষম হতেন। অরন্ধন ছিল একাধারে রাজনৈতিক কর্মসূচী ও ধর্মীয় আচার।

ঠিক একইভাবে রাখীবন্ধন নামক সামাজিক প্রথাও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয় এবং বঙ্গনারীর রাজনীতিতে সংযুক্তির পথ প্রশস্ত করে। দেশকে মাতৃরূপে পূজা করবার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এবং বাঙালির অসন্তোষকে সম্মিলিতরূপে প্রকাশ করবার জন্য নারীকে এই স্বদেশী আন্দোলনে শরীক করা হয় এবং এই সকল কার্যক্রমকে বেছে নেয়া হয়।[৩৪] এতদিন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং রাজনৈতিক সচেতনতার সংস্পর্শ থেকে বাংলার নারীদের দূরে রাখবার যে প্রচেষ্টা ছিল, বঙ্গভঙ্গের ঘোষণায় পর্যায়ক্রমে সেই চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটল। বাংলার পুরুষরা অনুভব করলেন সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না করেও তাদের নারীসমাজকে কিছুটা দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন, অন্যথায় তাদের বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলন সফল হবে না। এ কারণে বার বার দেখা যায় বাঙালি নারীকে দেশমাতৃকার দুঃখ অনুভব করবার এবং সেই দুঃখ মোচনে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা চলে। বঙ্গভঙ্গ রদ এবং স্বদেশী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বাঙলার নারীদের আহ্বান জানালেন

> জগতে স্ত্রীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে; সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যখন ভাবি তখন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্র শক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই; স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্য দ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।
>
> আজ আমাদের বঙ্গপ্রদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রত গ্রহণ করিব। আজ আমরা কোন ক্লেশকে ডরিব না। উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।
>
> দেশের জিনিসকে রক্ষা করা, এও তো রমণীর একটা বিশেষ কাজ...একবার ভাবিয়া দেখুন, যেখানে বাঙালি পুরুষ বিলাতি কাপড় পরিয়া সর্বত্র নিঃসংকোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন সেখানে তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণ বিদেশী বেশ ধারণ করিতে পরেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজাতীয় বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হইবে ইহা আমাদের স্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

> প্রকৃতির সঙ্গে এতই একান্ত অসংগত যে, বিলাতের মোহে আপাদমস্তক বিকাইয়াছেন যে পুরুষ তিনিও আপন স্ত্রী কন্যাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।
>
> এই রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই দেশের দেশীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মাতৃক্রোড়েই রক্ষা পায়। নূতনত্বের বন্যায় দেশের অনেক জিনিস, যাহা পুরুষসমাজ হইতে ভাসিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে।... আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্য কামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালির সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্য যদি সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যায় দেশের মঙ্গল হইবে–তবে এই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।[৩৫]

দেখা যাচ্ছে যে, নারীকে স্বদেশব্রতে আহ্বান করলেন পুরুষেরা এবং তাদের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করলেন পুরুষেরা। সেই কর্মপন্থাও পিতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। এখানে নারীকে ঘরের বাইরে বের হয়ে পুরুষের কাতারে এসে আন্দোলনে শরিক হবার সুযোগ দেয়া হলো না। তাকে দেয়া হলো সহযোগির ভূমিকা। পুরুষেরা যে আন্দোলন তৈরি করলেন তাকে সফল করবার জন্য নারী হলেন সহায়ক। বাংলার নারীরা এই সহায়কের ভূমিকাই মেনে নিলেন। তারা পুরুষদেরকে নিশ্চয়তা দিলেন পুরুষদের প্রতিজ্ঞা তারা ভঙ্গ করবেন না, তাদের উৎসাহে বাধা দেবেন না।[৩৬] ব্রতধারিণীরা ঘোষণা করলেন

> তোমরা নির্ভয় হও, আজ আমাদের পরমানন্দের দিন, আজ আমাদের মহোৎসব।... এ ব্রত অভূতপূর্ব্ব ব্রত। ইহাতে উপবাস নাই, শরীর পতন নাই, কোন কষ্টই নাই, ইহা নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই ব্রত। তবে তোমরা কি মনে করিতেছ এ ব্রত পালনে আমরা অসমর্থ হইব? বিলাতি চুড়ি ফেলিয়া দিয়া আমরা যদি দেশের শাঁখারুলি পরি বিলাতি সাবান বিলাতি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা দেশী সাবান চিরপ্রচলিত আতর গোলাপ ব্যবহার করি, যদি ফিতায় চুল না বাঁধিয়া আগের মত চুলের দড়ি ও জরী দিয়া চুল বাঁধি, যদি জ্যাকেটে বিলাতি লেশ না দিয়া দেশী চিকন লাগাইয়া পরি, সুক্ষ্ম বিলাতি মজলিন পয়নাপল প্রভৃতির বদলে, দেশের চেলি বারাণসীতেই সুসজ্জিত হই আর বিলাতি সুলভ শাড়ির বদলে, সামান্য বেশিদরের শাড়িই ব্যবহার করি, তাহা কি ত্যাগ স্বীকার? না কোন কষ্টনামবাচ্য?.... আজ ধনী মধ্যবিত্তের এক উদ্দেশ্য এক ব্রত। একের অর্থ অন্যের পরিশ্রম মিলিত করিয়া তাঁহারা দেশের কলকারখানা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সফল হইলে ধনী গরিব নির্ব্বিভেদে সকলেই দেশীবস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম হইবেন। এসময়ে আমরা ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরণীগণ, যদি বিলাতি তেল, বিলাতি সুগন্ধী, বিলাতি জ্যাকেট, এবং অন্যান্য নানাবিধ সৌখিন বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করি, তবে কত অপব্যয় নিবারণ করিতে পারি এইরূপ সমস্ত অর্থ দেশের উন্নতিতে প্রদত্ত হইলে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যসাধনে আমরা কতদূর সহায়তা করিতে পারি? দেশের কার্য্য করিবার, স্বামী ও পিতাপুত্রের সহায়তা করিবার এই সুযোগ এই অবসর কোন বঙ্গ রমনী না হাস্যমুখে গ্রহণ করিবেন।...অতএব হে বঙ্গসন্তানগণ, যদি তোমাদিগের মাতৃস্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত বঙ্গরমণীর পক্ষ হইতে এই অভয়বানী প্রচার করিতেছি যে তোমাদিগের সঙ্কল্পই আমাদিগের সঙ্কল্প, তোমাদিগের ব্রত আমাদিগেরও ব্রত। তোমরা নির্ভয় হও, তোমাদের প্রতিজ্ঞা অটল রহুক্, তোমাদিগের ব্রত অবাধে উদ্‌যাপিত হউক।
>
> –ব্রতধারিণীদিগের পক্ষে নিবেদিকা

Dhaka University Institutional Repository

কোন ব্রতধারিনী।[৩৭]

বঙ্গভঙ্গকালীন এই সকল রচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নারীর স্বদেশব্রত গ্রহণের পশ্চাতে জাতীয়তাবোধের পাশাপাশি, জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী স্বামীপুত্রের পাশে এসে দাঁড়ানোর প্রেরণা তাঁদের আরো বেশি করে অগ্রসর করে দিয়েছিল। এরফলে পুরুষের মত নারীরাও গ্রামে এবং শহরে নিজেরা সংগঠিত হয়ে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা করতে থাকে। কোন কোন সভায় মহিলারা পুরুষদের উদ্দীপ্ত করছেন আবার ঘরে ঘরে প্রভাব বিস্তার করে স্বামী, ভাই ও সন্তানদের মাতৃপূজায় দীক্ষিত করছেন।[৩৮] স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্ততার কয়েকটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, কলকাতায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র বিভিন্ন সভায় যোগ দিয়ে এবং দেশাত্ববোধক সঙ্গীত রচনা করে জনসাধারণকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন।[৩৯] তার মা লীলাবতী মিত্র, ডাঃ নীলরতন সরকারের স্ত্রী নির্মলা সরকার, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী সুবলা আচার্য , ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের স্ত্রী নির্মলা সরকার তাদের নিজেদের ঘরে ও এলাকায় তাঁত চরকা প্রবর্তনে তৎপর হন।[৪০] ভারতী পত্রিকায় হিরন্ময়ী দেবীর সূত্রে মাহলাদের দুটি ব্রত সম্পর্কে জানা যায়।[৪১] প্রথম ব্রতটিকে তিনি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এই ব্রত যারা গ্রহণ করেন তারা প্রতিদিন চরকায় কিছু পরিমাণ সূতা কেটে, আসন্ন পূজার পূর্বে অন্ততঃ একটি শাড়ির পরিমাণ সূতা কেটে সেই সূতায় শাড়ি প্রস্তুত করে সেই শাড়ি পরে পূজা সম্পন্ন করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন এবং অপর ব্রতটি মায়ের কৌটা বিশেষণে ভূষিত হয়। এটি ছিল মুষ্টি অন্ন সংগ্রহের ব্রত। এত ব্রতধারীরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে স্বদেশের উদ্দেশে একটি মাটির বা যে কোন পাত্র স্থাপন করে তাতে প্রতিদিন একমুষ্টি পরিমাণ চাল রাখবেন। স্নেহশীলা চৌধুরী গ্রামবাংলার নেত্রী হিসেবে খুলনা জেলায় মহিলা সমিতি গঠন করে গৃহিনীদের বিদেশের তৈরী রেশমী চুড়ি বর্জন করে শুধুমাত্র শাঁখা পরতে উদ্বুদ্ধ করেন।[৪২] সঞ্জীবনী পত্রিকা লিখেছিল, স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল তিন জেলার তিনজন মহিলা, এরা হলেন ময়মনসিংহের দীনমনি চৌধুরী, জলপাইগুড়ির অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্ত এবং মৌগঞ্জে লক্ষণ চৌধুরীর বিধবা পত্নী।[৪৩] স্বদেশী আন্দোলন শুরুর পর দেখা গেলো নারীদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য পুরুষদের প্রচেষ্টা প্রয়োজন হচ্ছে না। ১৯০৫-এর নভেম্বরে বামাবোধিনী পত্রিকায় বলা হয় মহিলারা নিজেরাই নিজেদের সংগঠিত করে জনসভা করে পুরুষদের স্বদেশী কর্মযজ্ঞে যোগ দিতে উদ্দীপ্ত করছেন এবং যার যার গৃহে স্বামী, সন্তান, ভাইকে স্বদেশীব্রত গ্রহণ করতে প্রভাবিত করছেন।[৪৪] নীরদ চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন কীভাবে তার অভিভাবকেরা সন্তানদের সমস্ত বিদেশী পোষাক বাতিল করে দেশী পোষাক কেনেন এবং পরে তার মা বাড়িতে থাকা একটি বিলাতি কাঁচের জগ ভেঙে ফেলবার জন্য ছেলেকে নির্দেশ দেন।[৪৫] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিচারণ করেছেন

> তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা, বাড়ীর গিন্নী থেকে চাকর-বাকর, দাস-দাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘড় ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

> দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন। বাড়ীতে তাঁত বসে গেলো–খটাখট শব্দে তাঁত চলতে লাগল।... ছোট ছোট গামছা, ধুতি তৈরী করে মা আমাদের দিলেন, সেই ছোট ছোট ধুতি হাঁটুর ওপর উঠে যাচ্ছে তাই পরে আমাদের উৎসাহ কত।[৪৬]

সুধা মজুমদারের পিতা তারাপদ ঘোষ ছিলেন জমিদার এবং জীবন-যাপনে ইউরোপীয়ান। সুধা মজুমদারের মা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহিনী। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সুধা মজুমদার ছিলেন ৭ বছরের শিশু এবং সেই সময়েই তিনি তার মায়ের মাধ্যমে এই আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন হন। তাঁর স্মৃতিচারণায় দেখা যায়

> My Introduction to politics was in 1905 when I was seven years old and mother served us with a *phal-ahar* [fruit meal] When it was neither a fast day nor a *puja* day. It was not a holyday nor did I hear of any holy purpose, so I was somewhat puzzled to notice the unusual silence in the kitchen and find that no fire were burning at all. On enquary I learnt it was associated with the *Swadeshi* movement.[47]

স্বদেশী আন্দোলন যে বাড়ির অন্দরমহলকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা সুধা মজুমদারের মায়ের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যিনি ছিলেন একজন জমিদারপত্নী এবং যার স্বামী ইংরেজভাবাপন্ন। কয়েক স্থানে মহিলা জমিদারেরা তাদের প্রজা ও অধিনস্তদের শুধু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করেন।[৪৮]

ভারত মহিলা পত্রিকায় শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত-এর রচনায় জানা যায় ময়মনসিংহের মহিলাদের সভার কথা। নারীদের মধ্যে তারাই অগ্রণী হয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সভা করেন এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের সংকল্প করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন ময়মনসিংহের মহিলারা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে শোকচিহ্ন স্বরূপ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেছেন এবং তিনদিন তারা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও তারা বিদেশী কোম্পানীর অপমানিত কেরাণীদের জন্য চাঁদা তোলেন।[৪৯] ঢাকা, বরিশাল সর্বত্র স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে মহিলাদের সভার বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।[৫০]

কর্ম্মাটার অঞ্চলে রাখীবন্ধনের দিন পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা নিজেদের পৃথক সভা অনুষ্ঠিত করেন। সেই সভায় মহিলারা পরস্পরের হাতে রাখী বাধেন এবং বিদেশী দ্রব্য আর ব্যবহার করবেন না বলে সংকল্প করেন। পাশাপাশি তাঁরা স্বদেশী আন্দোলনে সহায়তা করবার জন্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করেন।[৫১]

বাঁকিপুরে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র রায়ের বাড়িতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে নারীরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সমবেত নারীরা শহরের গণ্যমান্য পুরুষদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন এবং স্বদেশভক্তিমূলক গান, আবৃত্তি ও প্রার্থনা পরিবেশন করেন। তাঁরা নারীজাতির অবস্থার উন্নতি করতে এবং স্বদেশব্রতে নারীদের সঙ্গী করতে পুরুষদের অনুরোধ জানান। সভা শেষে পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও উচ্চকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করেন।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

বরিশালে মহিলারা বিয়ের অনুষ্ঠানে 'শয্যাতুলুনী' নামক আনুষ্ঠানিকতা থেকে প্রাপ্ত টাকা জাতীয় ভাণ্ডারে দান করতে শুরু করেন।[৫৩] কলসকাঠি গ্রামের মহিলাদের অনেকে বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত গেরুয়া পোষাক পরবার প্রতিজ্ঞা করেন।[৫৪] ১৯০৬ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সম্মেলনে তিনশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং পুলিশ সভা ভেঙ্গে দিলে তারা প্রতিবাদস্বরূপ প্রখর রৌদ্রে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে যান।[৫৫] এই সভার প্রাক্কালে বন্দে মাতরম্ ধ্বনির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হলে সরোজিনী বসু নামের একজন মহিলা প্রতিজ্ঞা করেন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তিনি ডান হাতে কোন স্বর্ণালঙ্কার পরবেন না। এই মর্মে লিখিত প্রতিজ্ঞা করে তিনি তাঁর হাতের সোনার বালা বরিশালের স্বদেশী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে জাতীয় ভাণ্ডারে দান করবার জন্য পাঠান। তিনি লেখেন

> পূজ্যপদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়
>
> শ্রীচরণকমলেষু
>
> শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে আমার ক্ষুদ্র দান গৃহীত হইয়াছে। খোকামনিকে দিয়া ডান হাতের বালা পাঠাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যে পর্য্যন্ত ''বন্দে মাতরম্'' বলা নিষেধি সার্কুলার রহিত না হইবে সে পর্য্যন্ত ঐ হাতে আর সোনার বালা পরিব না। ''বন্দে মাতরম্''।
>
> সেবিকা-শ্রীসরোজিনী বসু।[৫৬]

উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণে সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে, বঙ্গভঙ্গ এবং এর ফলে সৃষ্ট বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলন সাধারণ বাঙালি নারীর মধ্যেও একধরনের জাতীয়তাবোধের জন্ম দেয়, আর এভাবে স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে যে নারীরা জাতীয়চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন, তাদেরই একটি বড় অংশ পরবর্তীতে সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হন। মনোরমা বসুর স্মৃতিচারণায় জানা যায় ৩০ আশ্বিন রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে মানুষের মিছিল চলেছিল। ৮ বছরের বালিকা মনোরমাও এদের দলে মিশে যান, হাতে হলদে সূতোর রাখী বেঁধে দীক্ষা নেন এক নতুন জীবনের।[৫৭] যে জীবনে পরবর্তীতে পাড়ি দিয়েছেন দীর্ঘ পথ। আশালতা সেন তাঁর দশ বছর বয়সে যখন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তখনই এর বিরুদ্ধে একটি কবিতা লেখেন যেটি *সুহৃদ* পত্রিকায় ছাপা হয় এবং *অমৃতবাজার* ও *বেঙ্গলি* পত্রিকায় তার প্রশংসা বের হয়।[৫৮] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর করা হলে আশালতা সেনের মাতামহী নবশশী দেবী তাঁর এগারো বছরের নাতনীকে বিলেতি পণ্য বর্জনের সংকল্পপত্র স্বাক্ষর করিয়ে স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং গ্রামের মেয়ে বৌদের স্বাক্ষর করাবার ভারও আশালতার ওপর দেন।[৫৯] আশালতা সেন তাঁর স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন কীভাবে প্রাচীনপন্থী পর্দানশিন মহিলারা পর্যন্ত বিদেশী জিনিষ বয়কটের আন্দোলনে সক্রিয় ভাগ নিতে শুরু করলেন।[৬০] বিক্রমপুর অঞ্চলে নবশশী দেবী, সুশীলা সেন, কমলেকামিনী গুপ্তা সহ অন্যান্য মহিলারা মহিলা সমিতি, স্বদেশীভাণ্ডার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশী প্রচারে উদ্যোগী হন।[৬১] খুলনাতে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের এক ভাষণের শেষে সভায় উপস্থিত মহিলারা তাদের কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে ফেলে।[৬২] বিপীনচন্দ্র পাল ১৯০৭ সালে পূর্ববাংলা

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমণকালে হবিগঞ্জ ও ভোলায় মহিলাদের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আবার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ময়মনসিংহে গেলে মহিলারা তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।[৬৩] কমলা দাশগুপ্ত তার *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী* গ্রন্থে ঢাকা ও ঢাকার গ্রামাঞ্চলে যে সব মহিলারা ১৯০৫-এ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় সভা-সমিতি করে স্বদেশী ব্রত গ্রহণে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করতেন তাদের কয়েকজনের নাম লিপিবদ্ধ করেন যা নিম্নরূপ:

১. মুক্তকেশী দেবী (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্বশ্রুমাতা)

২. চিন্ময়ী দাস – সোনারং গ্রাম

৩. সুশীলাসুন্দরী সেন (ঢাকার দীননাথ সেনের কন্যা)

৪. প্রিয়বালা গুপ্তা

৫. গিরিজা গুপ্তা

৬. সুরমা সেন

৭. কমলেকামিনী গুপ্তা

৮. সুশীলা সেন

৯. নবশশী দেবী।

কেবল বিদেশী পণ্য বর্জনের মাধ্যমেই নয়, স্বদেশী নেতৃবৃন্দের উপর বৃটিশ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বাংলার নারীরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। *যুগান্তর* পত্রিকার সম্পাদক ভুপেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকায় বিপ্লববাদ প্রচারের অভিযোগে ১৯০৭ সালের ২৪ জুলাই তারিখে এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।[৬৪] এই ঘটনায় বাঙালি নারীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কলকাতায় লীলাবতী মিত্রের সভাপতিত্বে এক সভায় মহিলারা ভুপেন্দ্রনাথের বৃদ্ধা মা ভুবনেশ্বরীকে অভিনন্দন জানান।[৬৫] অভিনন্দনপত্রে লেখা হয়

> আমরা কতিপয় বঙ্গনারী যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদভার লইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। আপনার পুত্র অকুণ্ঠিত সাহসভরে স্বদেশের সেবা করিতে গিয়া রাজদ্বারে যে নিগ্রহপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেক বঙ্গনারী অসীম গৌরব পুনরায় লাভ করিতে গিয়া পদে পদে যখন তীব্র অপমান ভোগ করেন, তখন সে নিগ্রহ উজ্জ্বল মনির ন্যায় জাতীয় জীবনের শোভাবর্ধন করিয়া থাকে। বিধাতার শুভ করে আপনার পুত্র অদ্য যে স্পৃহনীয় আভরণ অর্জন করিয়া আনিয়াছেন, তাহার দীপ্তিতে কেবল আপনার কুল নহে–সমগ্র বঙ্গদেশ আলোকিত হইয়াছে। এরূপ সন্তানের জন্মে কুল পবিত্র, জননী ধন্যা ও জন্মভূমি আলোকিত হইয়া থাকেন। আপনার পুত্রের ন্যায় নির্ভীক স্বদেশ সেবক পুত্র প্রতি বঙ্গনারীর অঙ্কে অবতীর্ণ হউক, এই আশীর্বাদ অদ্য আমরা বিধাতার নিকট ভিক্ষা করিতেছি।[৬৬]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব থেকে সাহিত্যজগতও মুক্ত ছিল না। এ ক্ষেত্রটিতেও মহিলারা তাদের স্থান করে নিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে দেখা যায় নারীদের রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে স্বদেশবন্দনা একটি বড় স্থান দখল করে। এক্ষেত্রে *অন্তঃপুর* পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় কেবল মেয়েদের লেখাই ছাপা হতো। হেমন্তকুমার চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বহু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশ করে

Dhaka University Institutional Repository

এবং স্বয়ং সম্পাদিকাও স্বাদেশিকতা প্রচারে লেখনী ধরেন।[৬৭] মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রকাশ করলেন *স্বদেশিনী* কাব্যগ্রন্থ । কাব্যগ্রন্থে 'অঙ্গচ্ছেদ' কবিতায় তিনি লিখলেন, ''কে বলে ভেঙেছে অঙ্গ ভেঙ্গেছে মোহের বাসা,–/জাগিয়া উঠিছে বঙ্গ-হৃদয়ে তরুণ আশা।''[৬৮] 'রাখীমন্ত্র' কবিতায় তিনি বঙ্গনারীকে ইতিহাসে বঙ্গনারীর গৌরবদীপ্ত ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আহ্বান করলেন, ''ভুলি হিন্দু-মুসলমান/ প্রীতিসূত্র কর দান;/ বাঁধ সূক্ষ্ম সুত্রমূলে বিরাট জীবন।/ কর মনে দ্রৌপদীর বেনীবাঁধা পণ।''[৬৯] স্বর্ণকুমারী দেবী লিখলেন, ''আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,/ এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।/ সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,/ ঘুচাব মায়ের দৈন্য, – করিলাম এ শপথ।''[৭০]

সাহিত্য পত্রিকায় সরলাবালা সরকার *স্বদেশসেবায় বঙ্গরমণী* প্রবন্ধে লিখলেন, ''.... এখন যদি আমাদের দেশে মোটা ছালার অপেক্ষা সূক্ষ্ম কাপড় না পাওয়া যায়, তবে আমাদের সেই ছালাই পরিতে হইবে।.... বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিতে গেলে কলাশিল্প সম্বন্ধেও কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে।... চরকা কাটা অভ্যাস করিলে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। দেশীয় দিয়াশলাই, দেশী সাবান ভিন্ন অন্য সাবান স্পর্শ করিব না এই প্রতিজ্ঞা যথার্থ প্রতিপালিত হইলে এতদিন আর দোকানগুলিতে বিদেশী সাবান দেখা যাইত না।''[৭১]

বামাবোধিনী পত্রিকায় জীবনবালা দেবী লিখলেন,''প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের কত লক্ষ টাকা বিদেশীদের করতলগত হচ্ছে, আমরা বিদেশী বাণিজ্যের উন্নতির অনেক সহায়তা করছি, কিন্তু নিজের দেশের জন্য কি করছি?''[৭২] সরলা দত্ত বললেন, '' বঙ্গমাতার চক্ষুজল মুছাইবার জন্য ভ্রাতার পার্শ্বে ভগিনীগণ যখন দাঁড়াইবে তখন সমগ্র ভারতে নতুন জীবনীশক্তি জাগিয়া উঠিবে।''[৭৩]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-এর প্রভাবে নারীদের মধ্যে যে দেশাত্ববোধের চেতনা গড়ে ওঠে এই প্রথমবারের মত দেখা গেল তা কেবল শহরকেন্দ্রিক হয়ে না থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির গণ্ডি অতিক্রম করে প্রান্তিক শ্রেণির নারীদেরও উদ্বুদ্ধ করে।

(২)

বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি আরেকটি ধারা ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম, যা অনেকক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে সন্ত্রাসবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হবে না এর নেতিবাচক অর্থের কারণে। বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের জন্ম বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, যদিও এর বীজ রোপিত হয়েছিল উনিশ শতকেই। ১৮৯৩-এ অরবিন্দ ঘোষ বিলেত থেকে কলকাতায় ফিরে বাঙালিকে স্বাদেশিকতার নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন।[৭৪] তবে সে প্রচেষ্টা বিশেষ সাফলের মুখ দেখে নি। তবে বাংলার তরুণ প্রজন্ম ইউরোপের কতিপয় দেশের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ শতকের প্রথম দিকেই বাংলায় বিপ্লববাদের পটভূমি রচিত হয়। এর এই কাজের পুরোভাগে ছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানী। বাংলার যুবশক্তিকে বৈপ্লবিক

Dhaka University Institutional Repository

চেতনায় দীক্ষা দেওয়া এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করে সর্বপ্রকার ভয়মুক্ত হয়ে শক্তির পথে পরিচালিত হবার পথটি তার সূত্র ধরেই রচিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯০২-এ বাংলায় অরবিন্দ ঘোষ-এর দূত হয়ে আসেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৭৫] ১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং এর সভ্য জোগার করবার ভার দিয়ে যতীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি দিয়ে সরলা দেবীর কাছে পাঠান। সরলা দেবীর সহায়তায় ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডে ইষ্ট ক্লাব নাম নিয়ে গড়ে ওঠে বাংলার প্রথম বিপ্লবী সংঘ।[৭৬] এই ক্লাবেই ছেলেদের মধ্যে বক্তৃতা দিতেন ভগিনী নিবেদিতা। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলায় বিপ্লববাদ বিস্তারে যে দুজন নারী বিশেষ ভূমিকা রাখেন তাদের একজন হচ্ছেন সরলা দেবী, অপরজন যদিও বাংলার নন তথাপি ভারতঅন্তপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার নাম বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে অবশ্যই নিতে হয়। বাংলায় যে পাঁচজন সভ্য নিয়ে Revolutionary National Council গঠিত হয়, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০১-এ সরলা দেবীর সঙ্গে নিবেদিতা পরিচিত হন। এর পর তিনি অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর মধ্যে নিজ আদর্শের সন্ধান পান। বলা হয় নিবেদিতার সঙ্গে আইরিশ বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।[৭৭] ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের বিপ্লবী কেন্দ্রের গ্রন্থাগারটি তাঁর সংগ্রহের বই দ্বারা গঠিত হয়। সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন।[৭৮] ১৯০৫-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে লর্ড কার্জন যে বক্তব্য প্রদান করেন সেখানে নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। লর্ড কার্জন এই অভিভাষণে ভারত প্রসঙ্গে তার যে মতবাদ ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল নিতান্ত অপমানসূচক। কার্জন বলেন

> I hope I am making no false or arrogant claim when I say that the highest ideal of truth is to a large extent a Western conception. I do not thereby mean to claim that Europeans are universally or even generally truthful, still less do I mean that Asiatics deliberately or habitually deviate from the truth. The one proposition would be absurd, and the other insulting. But undoubtedly truth took a high place in the moral codes of the West before it had been similarly honoured in East.[79]

নিবেদিতার নেতৃত্বে কার্জনের এই ভারতবিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। এবং তাঁর প্রচেষ্টাতেই ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫, অমৃতবাজার পত্রিকায় কার্জনের এই মনোভাবে ভ্রান্ততা প্রমাণ করে প্রবন্ধ প্রকাশ করে।[৮০] তিনি এই সময়ে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও বিপ্লবী চেতনা বিস্তারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন। ১৯০৬-এ বরিশালে বন্যা-দুর্ভিক্ষের সময় তিনি সেখানে যান এবং জনসাধারণের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সেখানে বাড়ি বাড়ি ঘুরে দুর্গতদের সাহায্য করতেন এবং পরামর্শ দিতেন। তিনি সেখানে নারীদের স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে ও ব্যবহারে তৎপর হতে পরামর্শ দেন। সেই সময়েই তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সেখানকার নারীদের আর্থিক সংস্থানের উপায় হিসেবে চরকা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত রচনায় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উৎঘাটন করে তিনি উল্লেখ করেন

> Under Western imperialism the methods of exploitation are different from those of the past. The subjection has become financial and growing exploitation proceeds along building of rail-roads, the destruction of native industries and the creation of widespread famine – there are so many landmarks, as it were, in a single process of subordination and exploitation.[81]

বাংলায় বিপ্লববাদের প্রসারে নিবেদিতার ভূমিকা ফরাসী ভাষায় রচিত তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে

> She [Nivedita] taught them first the mechanism of secret societies, such as Ireland had known. These samities existed already plentifully in the Indian villages, but they remained fragmentary. ..... Then Nivedita insisted on the absolute security of the immense network of secret communication stretched throughout the country like the protecting spider's web. It was necessary that orders should be transmited as rapidely as by post, from man to man by signs and messages learnt by heart. The appeal was heard.The couriers allowed themselves to be butchered rather than let themselves be corrupted. The ends assigned were pursude with a devotion almost superhuman. From one village to another the cry re-echoed ``we are ready".[82]

এভাবেই ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলার বিপ্লবী দলগুলো সমৃদ্ধ হতে থাকে। এই পটভূমিতে ১৯০৫-এ ঘোষিত হলো বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন বিপ্লবী দলগুলোকে প্রকাশ্য কাজের সুযোগ করে দিল। অরবিন্দ ঘোষ বঙ্গভঙ্গকে বাঙালির জন্য পরম আশীর্বাদ মনে করলেন। তিনি বললেন, " বাঙ্গালী জীবনে এক নতুন চেতনার জন্ম হল। বাঙ্গালী যেন দেড়শত বছরের ঘুমঘোর থেকে জেগে উঠল।"[৮৩] অরবিন্দের সম্পর্কিত বোন *সঞ্জীবনী* পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র *সুপ্রভাত* পত্রিকায় লিখলেন মাতৃভূমির রক্তের প্রয়োজন।[৮৪]

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়কালে সশস্ত্র বিপ্লববাদের জন্ম হয়, যদিও প্রথম পর্যায়ে এতে মেয়েদের সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা হতো না। বঙ্গভঙ্গবিরোধী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে যেরূপ নারীদের প্রকাশ্য সম্পৃক্ততা দেখা যায়,তাদের এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করবার যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, বিপ্লববাদের ক্ষেত্রে তা এই পর্যায়ে ছিল অনুপস্থিত। তবে সরাসরি সম্পৃক্ততা না থাকলেও বিপ্লববাদের পরোক্ষ সংস্পর্শে কেউ কেউ এসেছিলেন, আর তাঁরা ছিলেন বিপ্লবীদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। *অগ্নিযুগের কথা*-তে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী বলেন

> মেয়েদের রাজনীতি শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার না থাকায় তাদের দলে আনার কোন কল্পনা তখন ছিল না। কিন্তু মা, বৌদি, স্ত্রী ও বোনরূপে তাদের সাহায্য অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। ফেরারী বা পলাতক কর্মীদের অতি সংগোপনে

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয় দেওয়া, পিস্তল-রিভলবার রাখা বা স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া, চিঠি আদান প্রদানের পোষ্টবক্স হিসেবে কাজ করা – কোন কোন বিপ্লবী পরিবারের মেয়েরা এ সকল কাজ করেছেন।[৮৫]

কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যায় বিপ্লববাদে মেয়েদের ভূমিকা ছিল : বিপ্লবীদের আশ্রয়দান; বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা ও ক্ষেত্রবিশেষে গোপন তথ্য আদানপ্রদান করা এবং এই কাজে জড়িত নারীরা সকলেই বিপ্লবীদের সঙ্গে পারিবারিক বা আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত। জানা যায় মেদিনীপুরের চারুশিলা দেবীর সঙ্গে পরিচয় ছিল ক্ষুদিরাম-এর। ১৯০৫-এ ক্ষুদিরাম বিপ্লবীদলে যোগদান করলে চারুশীলা দেবীকেও একদিন রক্ততিলক পরিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন। পরবর্তীকালে ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে যাওয়ার আগে ক্ষুদিরাম চারুশীলা দেবীর বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন এবং ক্ষুদিরামের মামলার সময় পুলিশ চারুশীলা দেবীকে খোঁজ করতে থাকে। তিনি তখন আত্মগোপন করে থাকেন।[৮৬] আবার মোস্তফা কামাল তাঁর *বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে শ্রীহট্ট* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ক্ষুদিরামকে লুকিয়ে রেখে ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন একজন মুসলিম নারী। এই অজ্ঞাতনামা মুসলিম নারী মৌলভী আবদুল ওয়াহেদের ভগিনী এবং তিনি ঐ সময় সমগ্র ভারতে 'কিংবদন্তি দিদি' নামে পরিচিত ছিলেন এবং বৃটিশদের গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তিনি জার্মানীতে আশ্রয় নেন। প্রভাবতী মির্জা যিনি পরবর্তীকালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জড়িত ছিলেন, তিনি ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির সময়ে দশ বছরের ছিলেন এবং ঐ সময়ে তিনি তাঁর বিপ্লবী ভাই-এর প্রভাবে ক্ষুদিরামের ফাঁসির প্রতিবাদে অনশনে যোগদেন। লীলাবতী মিত্র এ সময়ে বিপ্লবী ছাত্রদের আশ্রয় দিতেন। ১৯০৮-এ তার স্বামী কৃষ্ণকুমার মিত্র স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত থাকবার অভিযোগে কারাবরণ করলে তিনি সরকার প্রদত্ত ভাতা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং ১৯০৯-এ অরবিন্দ ঘোষ কারাগার থেকে মুক্ত হলে তিনি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করেন। ১৯১১-তে তার স্বামী কারামুক্ত হলে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সড়ে দাঁড়ান এবং ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। কুমুদিনী মিত্র শিক্ষিত ব্রাহ্মণ মহিলাদের একটি দল গঠন করেন যারা আত্মগোপনে থাকা বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতো।[৮৭]

১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পরে এবং ১৯১৪-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার প্রেক্ষাপটে বিপ্লববাদ জোরদার হতে থাকে। বিপ্লবীদের কার্যক্রমের বড় শর্ত ছিল পুলিশের চোখের অন্তরালে থেকে কাজ করা। যে কারণে দেখা যায় তাদের অধিকাংশ সময় আত্মগোপন করে থাকতে হতো। এই আত্মগোপনে থাকবার জন্য তাদের প্রয়োজন হতো কোন না কোন নারীকে আত্মীয় পরিচয় দিয়ে বাসা ভাড়া নেবার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা পরিকল্পনা করলেন জার্মানীর কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর। এটি ইতিহাসে ভারত-জার্মান পরিকল্পনা নামে খ্যাত। পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়, পুলিশ বিপ্লবীদের খুঁজতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে। এই সময়ে দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজনে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসেন নারীরা। ১৯১৫ সালে যুগান্তর দলের নেতা যদুগোপাল মুখার্জি ও তাঁর সহযোগী অমর চ্যাটার্জি, নলিনীকান্ত কর ও অতুল ঘোষের আত্মগোপন করবার প্রয়োজন হয়। এগিয়ে আসেন ননীবালা দেবী। তিনি ছিলেন বিপ্লবী অমর চ্যাটার্জির পিসীমা। অমর চ্যাটার্জির মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তিনি ছিলেন বিধবা এবং বিপ্লবীদের প্রয়োজনে তিনি পরিবারকে ছেড়ে বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার জন্য বার হয়ে আসেন। প্রথমে তিনি রিষড়ায় এক বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে গৃহকর্ত্রী সেজে দুইমাস বিপ্লবীদের সঙ্গে থাকেন। এসময়ে বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের সময় তিনি একটি মসার পিস্তল লুকিয়ে রেখে যান, যার সন্ধান তিনি তাঁর দলের লোকদের দিয়ে যেতে পারেন নি। তখন ননীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সেই পিস্তলটির সন্ধান জেনে আসেন। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে একজন বিধবা নারীর পক্ষে অপরিচিত লোকের স্ত্রী পরিচয়ে দিয়ে, পুলিশের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে এভাবে বিপ্লবীদের সহায়তা করা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এরপর পুলিশ রিষড়ায় বিপ্লবীদের সন্ধান পেলে বিপ্লবীরা ১৯১৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগরে পালিয়ে যান। এখানেও তাঁদের বাড়িভাড়া নেবার জন্য প্রয়োজন হয় ননীবালা দেবীর সহায়তার, কারণ একজন নারীর উপস্থিতিভিন্ন বাড়ি ভাড়া নেওয়া সম্ভবপর হতো না। বিপ্লবীরা দিনে ননীবালা দেবীর আশ্রয়ে থাকতেন এবং রাতের অন্ধকারে বের হয়ে যেতেন। পর্যায়ক্রমে চন্দননগরে বিপ্লবীদের এই কার্যক্রমের দিকেও পুলিশের নজর পরে। বিপ্লবীরা চন্দননগর ত্যাগ করলে ননীবালা তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদার সঙ্গে পেশোয়ারে চলে যান। প্রায় ষোল সতেরো দিন পরে পুলিশ তাঁকে পেশোয়ার থেকে গ্রেফতার করে। তাঁকে প্রথমে নেয়া হয় পেশোয়ার জেলে, সেখান থেকে তাঁকে কাশী জেলে স্থানান্তর করা হয়। এখানে বিপ্লবীদের সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য কাশীর ডেপুটি পুলিশ-সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট প্রতিদিন তাঁকে জেরা করতেন, তথ্য আদায়ের জন্য নানা ধরনের নির্যাতন তাঁর উপর করা হয় এমনকি মাটির নীচের পানিশমেন্ট সেলে (সম্পূর্ণ বদ্ধ একটি ঘর, যেখানে কোনো আলো-বাতাস প্রবেশ করে না) তাঁকে প্রতিদিন আধঘণ্টা করে আটকে রাখা হতো। এরপরেও ননীবালা দেবী বিপ্লবীদের সম্পর্কে কোন তথ্য পুলিশকে দেন নি। এরপর তাঁকে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসা হয় এখানে তিনি টানা ২০ দিন অনশন করেন। ননীবালা দেবীকে ১৯১৮ সনের ৩নং রেগুলেশনে স্টেট প্রিজনার করে রাখা হয় কলকাতা জেলে এবং তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার।[৮৯] ১৮১৯ সালে তিনি মুক্তি পান তবে তাঁর পরিবার তাঁকে গ্রহণ করে নি। পরবর্তীতে তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা সে সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় না।

ভারত-জার্মান পরিকল্পনায় বিপ্লবীদের আশ্রয়দানের সঙ্গে জড়িত থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন সিন্ধুবালা ঘোষ। তাঁর স্বামী দেবেন ঘোষ ছিলেন তিলজলা রেলওয়ে কেবিনের কেরানি। ১৯১৭-এ স্বামীর সহযোগিতায় তিনি রেল কোয়ার্টারে যুগান্তর দলের আত্মগোপন করা বিপ্লবী ভুপেন্দ্রকুমার দত্ত, কুন্তল চক্রবর্তী ও অমর চ্যাটার্জিকে

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয় দেন। পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে পৌছাবার আগেই বিপ্লবীরা সরে যায়। পুলিশ সিন্ধুবালা ঘোষের স্বামী দেবেন ঘোষকে গ্রেফতার করে। সিন্ধুবালা ঘোষ তখন ছিলেন বাকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে। পুলিশ সেই গ্রামে যায়। সেখানে দুজন সিন্ধুবালার সন্ধান পেলে পুলিশ দু'জনকেই গ্রেফতার করে। দেবেন ঘোষের স্ত্রী সিন্ধুবালা তখন আসন্নপ্রসবা, সেই অবস্থায় পুলিশ তাঁকে হাঁটিয়ে ইন্দাস গ্রাম থেকে বাকুড়া রেল স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে আসে এবং বাকুড়া জেলে বন্দী করে রাখে। সেই বছর হুগলিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত এই বর্বর ঘটনার তীব্র পতিবাদ করেন এবং আসন্নপ্রসবা হবার কারণে তাঁকে মাসখানের পরে মুক্তি দেয়া হয়।[৯০]

এই পর্বে আরো একজন নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি ময়মনসিংহের ক্ষীরোদা সুন্দরী চৌধুরী। তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের বিপ্লবী ক্ষিতীশ চৌধুরীর জেঠীমা। ময়মনসিংহের বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং ক্ষিতীশ চৌধুরীর মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরেন। ১৯১৬-এর জুন মাসে কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি পুলিশ-সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট বসন্ত চৌধুরীর হত্যার পর গ্রেফতারী পরোয়ানা বের হয় সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং ক্ষিতীশ চৌধুরীর নামে। বিপ্লবীরা এসময়ে ময়মনসিংহে একটি বাড়ি ভাড়া করে আত্মগোপন করে। সেখানে বিধবা ক্ষিরোদাসুন্দরী বিপ্লবীদের মা সেজে বাড়ির গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পুলিশের নজর এড়াতে এরপর বিপ্লবীরা যান নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ এবং তারপর জামালপুর। ক্ষিরোদাসুন্দরী তাদের সাথেই ছিলেন। জামালপুরে দেড়মাস থাকার পর বিপ্লবীরা আশ্রয় নেন সিরাজগঞ্জে। সেখানেও ক্ষিরোদাসুন্দরী বিপ্লবীদের অসুস্থ মায়ের ভূমিকায় থাকেন। এখান থেকে বিপ্লবীরা তিনমাস পর তাঁকে নিয়ে চলে যায় আসামের ধুবড়ীতে এবং সেখান থেকে তাঁরা চলে যান আসামের বিন্নাখাতা গ্রামে। দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজ করতে শুরু করে। এসময়ে নিরাপত্তার কারণে বিপ্লবীরা প্রথমে তাঁকে কাশীতে পাঠিয়ে দেয়, সেখান থেকে তিনি তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহের খাড়ুয়া গ্রামে চলে যান। পুলিশ প্রথমে তাঁকে সন্দেহ করলেও ধরতে পারে নি, কারণ তিনি কাশীতে থাকাকালীন দলের পরামর্শমত সেখানে বাড়িতে নিজের নাম ঠিকানা লিখে আসায় পুলিশের সন্দেহ করার অবকাশ না থাকায় তিনি গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন।[৯১]

এই পর্যায়ে বিপ্লববাদকে কেন্দ্র করে যেমন বাংলার প্রথম মহিলা রাজবন্দী হলেন ননীবালা দেবী, তেমনিভাবে এইপর্যায়ে ভারতের অস্ত্র আইনে দণ্ডিত প্রথম নারী হলেন দুকড়িবালা দেবী। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার বন্দুক ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর আমদানী করা অস্ত্রবোঝাই জাহাজে ছিল জার্মানীর তৈরি করা মসার বা মাউজার পিস্তল। জাহাজ থেকে মাল কলকাতায় আনার পথে পঞ্চাশটি পিস্তল এবং পঞ্চাশ হাজার গুলিবোঝাই বাক্স রাস্তা থেকে নেই হয়ে যায়। আত্মোন্নতি সমিতির নেতা অনুকুলচন্দ্র মুখার্জী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ নেতাদের পরিকল্পনা অনুসারে অতুল নামে এক বিপ্লবী (মতান্তরে যুগান্তর দলের

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবী হরিদাস দত্ত) গাড়ির গাড়োয়ান সেজে অস্ত্রসহ গাড়িটি আত্মোন্নতি সমিতির আড্ডায় নিয়ে আসেন। নেতারা এইসব অস্ত্র বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীকে ভাগ করে দেন। এরই সাতটি পিস্তল ও কিছু কার্তুজ লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব পান যুগান্তর দলের বিপ্লবী নিবারণ ঘটক। দুকড়িবালা দেবী ছিলেন নিবারণ ঘটকের মাসীমা। দুকড়িবালা দেবী প্রথম স্বাদেশীকতার মন্ত্রে দীক্ষা পান তার স্বামীর কাছে। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় তাঁর স্বামী তাঁকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে প্রতিজ্ঞা করান। তাঁর ভাষ্যে

> আমার স্বামী তখন আসানসোলে রেলওয়ে টেলিগ্রাফি চাকরি করিতেন। ২রা কার্তিক তিনি কর্মস্থলে চলে যান। পৌষ কিংবা মাঘ মাসে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজে কিছু অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিড়ে আসেন এবং এসেই আমার বিলাতি কাপড়ের বাক্সের উপর নজর দেন এবং কয়খানি শান্তিপুরী শাড়ি ছাড়া ১০/১২ শাড়ি নিয়ে তাহা পোড়াইবার বন্দোবস্ত করেন।... আমার পূজনীয়া শাশুড়িঠাকুরাণী ও মাতাঠাকুরানী এবং পিসিমাতা ঠাকুরানী সকলের অনুরোধে তিনি নিরস্ত হন। কিন্তু গোপনে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্যি করান যে জীবনে কখনও বিলাতি জিনিষ ব্যবহার করিব না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কাহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিলে? আমি উত্তরে বলি আমার দেবতার কাছে, মৃত্যু পর্যন্ত একথা ভুলিব না। এই আমার স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা।

এরপর তিনি নিবারণ ঘটকের মাধ্যমে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহী হন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, "নিবারণের সমস্ত কথা শুনে আমার প্রাণেও দেশের কাজের জন্য একটা যেন সাড়া জেগে উঠলো। নিবারণ কাজের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলল, জেল ফাঁসি সংসার ত্যাগ–এগুলোর জন্য প্রস্তুত হতে হবে, পারবে কি? আমার অদম্য উন্মাদনায় আমি নিজ হাতে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়িলাম।" তিনি নিবারণ ঘটকের মাসীমা হিসেবে বিপ্লবী মহলেও মাসীমা নামে পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবী বিপীন গাঙ্গুলী এবং জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের লেখা গীতার ব্যাখ্যা দলের সদস্যদের মধ্যে বিলি করবার জন্য নকল করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দুকড়িবালা। ১৯১৬-তে নিবারণ ঘটক অস্ত্র লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব পেলে তা তাঁর মাসী দুকড়িবালার কাছে বীরভূমের নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে লুকিয়ে রাখেন। দুকড়িবালা অস্ত্রগুলি দুটি ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রাখেন। ১৯১৭ সালের জানুয়ারিতে পুলিশ তথ্য পায় বীরভূমের ঝাউপাড়ায় বিপ্লবীদের ছিনতাই করা অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। পুলিশ দুকড়িবালার বাড়ি ঘিরে ফেললে তিনি অস্ত্র সহ ট্রাঙ্ক তার প্রতিবেশী সুরধনী মোল্লানীর বাড়ি রেখে আসেন। পুলিশ দুকড়িবালার বাড়ি তল্লাশী করে কিছু না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল এমন সময় কেউ একজন অস্ত্রের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য পুলিশকে জানিয়ে দেয়। পুলিশ সেখানে তল্লাশী করে এবং অস্ত্রের সন্ধান পায় এবং পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা দুকড়িবালা দিয়েছেন

> আমার ডাক পড়িল সুরধনীর বাড়িতে। আমি বলিলাম আমি রেখেছি। কি আছে বাক্স দুটিই রাখিলেন? বলিলাম বাক্স আমার নয় নিবারণের বন্ধু সিউড়ির সাবজজের ছেলে তার মা (মারা গেছে)-র গয়না ও দামী শাড়ি আছে বলে রেখে গেছিলো। সে কোথা? বলিলাম তার যক্ষা হয়েছে সে মধুপুরে গেছে। আপনার কাছে কে রেখে গেছে? বলিলাম নিবারণ ও অবনী দুজনেই এসেছিল। চাবি দেন। চাবি আমার কাছে নেই, পরের চাবি আমার কাছে রাখিব কেন? বাক্স

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙ্গা হলো পিস্তল ৭টি পাওয়া গেলো এবং কার্টিজ ১২০০র কম। ... পিস্তলের বাক্স কার্টিজ ও আমাকে ও সুরধনীকে সঙ্গে করে পুলিশ চলে গেলো রামপুরহাটে সাবজেলে, কিছুদিন থেকে সিউড়ির গেলাম।

স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে দুকড়িবালা ও নিবারণচন্দ্র ঘটকের শাস্তি হয়। রাজসাক্ষী হবার কারণে সুরধনী বেকসুর খালাস পান। দুকড়িবালার জেল হয় দু বছরের জন্য। রামপুরহাট ও সিউড়ির পর তাঁকে আনা হয় প্রেসিডেন্সী জেলে। যেহেতু তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল অতএব জেলে তাঁকে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। এই সময়ে রাজবন্দী হিসেবে প্রেসিডেন্সি জেলে আসেন ননীবালা দেবী। তিনি ব্রাহ্মণের রান্না ছাড়া খাবেন না এই দাবীতে অনশন শুরু করেন এবং ২০ দিন পর জেল কর্তৃপক্ষ ঐ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন দুকড়িবালা দেবীকে।

কারামুক্তির পর তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের কাজকর্মের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। তিনি জেল থেকে মুক্ত হবার কিছুদিন পরে তার স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে তিনি স্বামীগৃহ ত্যাগ করে পৈত্রিক বাড়িতে বসবাস শুরু করেন।[১২] এপর্যায়ের অন্যান্য বিপ্লবী নারীদের বিশেষত ননীবালা দেবীকে যেমন দেখা যায় কারা পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, বিপরীতে দুকড়িবালা দেবী পরবর্তীকালে কংগ্রেস কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন। পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে বিপ্লবী জীবনে প্রবেশ করলেও এর ফলে দুজনকেই পাবিবারিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়, কাজেই বলা যায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড যেমন সমাজের চলমান স্রোতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তেমনি এতে সম্পৃক্ত নারীদের সংখ্যা ছিল সীমিত এবং সমাজে অনাকাঙ্খিত।

ভারত-জার্মান পরিকল্পার সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের সহায়ক আরেকজন নারীর সন্ধান পাওয়া যায় নোয়াখালীতে। তাঁর নাম সুশীলা মিত্র। তিনি নোয়াখালীর গাবুয়া গ্রামের কুমুদিনীকান্ত মিত্রের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর দুই দেবর সত্যেন বসু ও শচীন বসু যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন, তাদের সূত্রে তিনি এই বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তাঁর বাড়িতে বিপ্লবীদের একটি আড্ডা ছিল এবং তিনি তাঁদের দেওয়া বিভিন্ন নিষিদ্ধ জিনিষপত্র লুকিয়ে রাখতেন।[১৩০] দুকড়িবালা দেবীর মত তিনিও পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সদস্য হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, পলায়নের ব্যবস্থা করা, অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ও অন্যান্য সহায়তা করেন এমন মহিলাদের একটি তালিকা পাওয়া যায় কমলা দাশগুপ্তের লেখায়। তালিকাটি নিম্নরূপ :

১. সৌদামিনী দেবী (ফরিদপুর) – ১৯১০ সাল থেকে
২. ব্রহ্মময়ী সেন (ঢাকা, বিক্রমপুর) – ১৯১০ ,, ,,
৩. চিন্ময়ী সেন (ঢাকা, বিক্রমপুর) – ১৯১০ ,, ,,
৪. জগৎতারা সেন (ঢাকা, সোনারগাঁ) – ১৯১০ ,, ,,

Dhaka University Institutional Repository

৫. সরোজিনী দেবী (বরিশাল) – ১৯১০ ,, ,,

৬. প্রিয়বালা দাশগুপ্ত (বরিশাল) – ১৯১০ ,, ,,

৭. মৃণালিনী দাশগুপ্ত (বরিশাল) – ১৯১০ ,, ,,

৮. বগলাসুন্দরী দেবী (ঢাকা, চুড়াইল) – ১৯১৪ ,, ,,

৯. বিন্দুবাসিনী সোম (ঢাকা, বজ্রযোগিনী) – ১৯১৪ ,, ,,

১০, দুর্গামনি পাইন (ফরিদপুর) – ১৯১৬ ,, ,,

তবে এদের বিস্তারিত পরিচয় বা কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, যা জানা যায় তা হচ্ছে দুর্গামনি পাইন ছিলেন হাটুরিয়ার নিশি পাইনের মা এবং তিনি ঢাকায় স্বগৃহে বন্দী ছিলেন।[৯৩]

বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ব্যপকতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে সাধারণ মহিলাদের এই কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তা একেবারে সীমিত আকারে হলেও লক্ষণীয়, যদিও এই মহিলারা সকলেই ছিলেন কোন না কোনভাবে বিপ্লবীদের পরিবারভুক্ত। যেহেতু বিপ্লবী দলগুলি তাদের কার্যক্রম প্রকাশ্যে চালাতো না এবং সাধারণভাবে সমাজের কাছে বিপ্লবীদের কার্যক্রম ছিল নিষিদ্ধ অতএব মহিলাদের এক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করবার যে প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিদেশী পণ্য বয়কট ও স্বদেশী পণ্যের প্রসার আন্দোলনে দেখা যায় বিপ্লববাদে তা দেখা যায় না।

(৩)

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে অবস্থানগ্রহণ করেছিল এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে তাদের সংযোগ ছিল না বরং তারা ছিল এর বিরোধী। এর প্রমাণ হিসেবে ঐতিহাসিকরা উপস্থাপন করেন ১৯০৬-এ মুসলিম লীগ এর প্রতিষ্ঠাকে। মূলত উপনিবেশিক শাসকবর্গের বাঙালিদের ঐক্যে ফাটল তৈরির নীতি অনুসারে কার্জন-ফুলার মহল বঙ্গভঙ্গের প্রথম থেকেই পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মনে হিন্দু বিদ্বেষ সঞ্চারে সচেষ্ট হন। তারা প্রচার করতে থাকে পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করছে, বঙ্গভঙ্গের ফলে সে সুবিধা চলে আসবে মুসলমানদের হাতে। অতএব হিন্দুদের স্বার্থানুকূল স্বদেশী আন্দোলন সমর্থন করা থেকে মুসলিমদের বিরত থাকা উচিত। বৃটিশদের এই অপপ্রচারের পাশাপাশি ঐতিহাসিকরা মুসলমানদের এই আন্দোলনে জড়িত না হবার অপর একটি কারণ উল্লেখ করেন, ''রাজনীতির আবরণে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন যেখানে লক্ষ্য, কালী-ভবানীর আরাধনা ও শীবাজী-উৎসব যে-আন্দোলনের প্রাণ, গীতার আদর্শে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াস যেখানে সুস্পষ্ট, সেই আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সহযোগিতা একরূপ অসম্ভব।''[৯৪]

বাঙালি সাধারণ মুসলিমসমাজের একাংশ যেমন বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিল, বিপরীতে বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে সামান্য হলেও মুসলানদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারিতে

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতায় সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন একটি সভা করে যেখানে বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বরিশালের জমিদার মীর মোতাহার হোসেন, চট্টগ্রামের প্রভাবশালী নেতা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *দ্যা মুসলিম ক্রনিকল* পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল হামিদের উপস্থিতিতে সৈয়দ আমির হুসানির মাধ্যমে এই সভা বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করে সরকারের কাছে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করে।[৯৫] ১৯০৫-এর ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে কলকাতার মুসলিম নাগরিকদের এক সম্মেলন থেকে বয়কট আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়।[৯৬] এর পূর্বে ৭ আগস্ট, ১৯০৫ কলকাতার টাউন হলে ও ময়দানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলিমরা যোগদান করে, পাশাপাশি দেখা যায় ঐদিন দুপুরে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে ছাত্রদের যে মিছিল বের হয় তাতে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে কলকাতা মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্ররাও উপস্থিত ছিল। পূর্ববঙ্গেও মুসলমানদের মধ্যে বঙ্গবঙ্গ-এর প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ১৯০৫-এর ২৭ আগস্ট ঢাকার জগন্নাথ কলেজের মাঠে আনন্দ চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে যে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে আবদুল হালিম গজনভী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও বয়কটের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। ১৯০৬-এর এপ্রিল মাসে বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল। তিনি সভাপতির ভাষণে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন

> কোনো কোনো মুসলমান নেতা দলস্থ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করছেন যে, ইহা একটি হিন্দু আন্দোলন ও সেই কারণে 'ডিস্‌লয়্যাল্'। আমি বলি, নেতাদের বাক্য অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে না নিয়ে যদি তারা নিজেদের মনে একটু চিন্তা করে দেখে তাহলেই বুঝতে পারবে যে, হিন্দুগণ অপেক্ষা এই আন্দোলনে মুসলমানদের উপকার হচ্ছে বেশি। কোনো মুসলমান একথা কি অস্বীকার করতে পারবে যে, স্বদেশী আন্দোলনে দেশের বয়ন-শিল্পের যে উন্নতি হয়েছে, তাতে মুসলমান তাঁতিগণ উপকৃত হচ্ছে না? একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে যে কলিকাতার বহু দরিদ্র মুসলমান পরিবার, যারা এতদিন অনাহারে মারা পড়ছিল, তারা এক্ষণে বিড়ি শিল্পের উন্নয়নে ভালভাবে জীবিকা উপায় করছেন না?[৯৭]

আরেকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২০ মে ১৯০৬, বরিশাল শহরে হিন্দু-মুসলমান জনতার এক যৌথ মিছিল বের হয়। এটি পরিচালনা করেন অশ্বীনীকুমার দত্ত, ব্যরিস্টার মোতাহার হোসেন, চরমুদ্দের জমিদার চৌধুরী ইসমাইল খাঁ ও মহম্মদ আসুফ এবং এই মিছিলে বন্দেমাতরম ধ্বনির পাশাপাশি আল্লা-হো-আকবর ধ্বনিও দেয়া হয়।

অনেক মুসলমান লেখকরাও স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। আশ্বিন ১৩১২-তে *নবনুর*-এর তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় মৌলভী একিনউদ্দীন আহমদ লেখেন

> লাট সাহেব ইঙ্গিত ইসারায় বলিয়াছেন যে, নতুন বাঙ্গালা প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী হইবে; তাহাতে কিন্তু মুসলমানগণ সন্তুষ্ট নহে। মুসলমানগণ একমত হইয়া লাট বাহাদুরের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছে। দেশের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার ভার ইন্ডিয়া গবর্ণমেন্ট নিজ হাতে লইয়াছেন। যে উদারনীতি লর্ড মেকলে, মেটকাফ ও ক্যানিং প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সুফল আমরা চারিদিকের উন্নতিতেই দেখিতে পাইতেছি। লাট সাহেবের নূতন ব্যবস্থা সে উদার উন্নতি-বিধায়িনী শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ... দেশের যে সামান্য উন্নতি এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ কলিকাতা মহানগরীর জ্ঞানী লোকগণের সমবেত চেষ্টা। গবর্নমেন্ট নতুন প্রদেশ সংস্থাপিত করিয়া এই উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছেন। অধুনা কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে যে সমস্ত কঠোর আইন প্রবর্ত্তন হইয়াছে, শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত কঠোর নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশবাসী মুসলমানগণের শিক্ষালাভ করা অতীব কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ... মুসলমানগণ নূতন প্রদেশে সংখ্যায় বেশি হইলে কি উপকার হইবে? যদি তাহাদের অত্যাবশ্যক শিক্ষার পথই বন্ধ হয়, যদি তাহাদের উন্নতির আশা তিরোহিত হয়, তাহা হইলে কাঠ ও জলবাহকরূপী লোকের সংখ্যার বেশী করিয়া গবর্নমেন্ট মুসলমানগণের কি উপকার ও উন্নতি করিবেন?[৯৮]

অর্চ্চনা, তৃতীয় বর্ষ, বৈশাখ ১৩১৩ সংখ্যায় মৌলভী আব্দুল করিম মুসলমানদের উদ্দেশ্যে লেখেন

ইংরেজের ভেদনীতি আপাত মনোরম মাকাল ফল বই আর কিছুই নহে। উহার বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া মুসলমানগণ যতই নাচিতেছেন, ততই যে তাহারা প্রতারিত হইতেছেন, তাহা আজও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন যুগে কাফেরী ভাষা অপাঠ্য ইত্যাদী হেতু দেখাইয়া আমাদের মৌলবী সাহেবগণ মুসলমানদিগকে উহা অধ্যয়নে বিরত করেন। তাহার ফলে আজ মুসলমানগণ মস্তিষ্ক ও মানসিক বলে সমান বলশালী হইয়াও হিন্দুর কত পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছেন।। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও আমরা যদি উদাসীন থাকি, তবে আমাদের সেইরূপ দুর্দ্দশাই হইবে :– ব্যবসায় বাণিজ্যেও আমরা অধঃপতিত হইব।। স্বদেশীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হইলে দেশে বহুবিধ কলকারখানার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হইবে। যদি সেরূপ শুভদিন ঘটে, তাহাতে মুসলমানেরই বিশেষ সুবিধা ও লাভের সম্ভাবনা হইবে। ... অতএব আইস ভাই! সকলে মিলিয়া সমস্বরে সোণার বাঙ্গালার জয়গীতি গাহিয়া জীবন সার্থক করি! এস সকলে, হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া একপ্রানে সমস্বরে গাহি 'বন্দে মাতরম্'![৯৯]

১৯০৬-এ কলকাতা কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করে প্রস্তাব আনেন ঢাকার নবাব পরিবারের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব খাজা আতিকুল্লা। মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল কাশেম, আবদুল গফুর সিদ্দিকি, আবুল হোসেন, দীন মোহাম্মদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, দেদার বক্স প্রমুখ মুসলিম নেতা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অংশ নেন।[১০০]

কাজেই বলা যায় মুসলানদের একাংশ বঙ্গভঙ্গের নেপথ্যে বৃটিশ প্রসাশনের ষড়যন্ত্রমূলক দিকটি উপলব্ধি করেছিল এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। বাঙলার মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তাদের মনে উপনিবেশবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হলেও প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো তারা তাদের মহিলাদের সচেতন করবার জন্য কোন কার্যকর পন্থা গ্রহণ করে নি বা সে সম্পর্কে সচেতনও ছিল না। কারণ হিসেবে বলা যায় উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের পর্যায়ে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ফলে হিন্দু নারীদের সামাজিকায়নের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা

Dhaka University Institutional Repository

ছিল অনুপস্থিত। ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধে উপনিবেশিকতার বিপরীতে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে উত্থান দেখা যায় তা হিন্দু নারীদের যতটা প্রভাবিত করে মুসলিম নারীদের তা করে নি।

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত যে ব্যক্তিত্ব তিনি বেগম রোকেয়া। যে বছর বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়, সেই ১৯০৫-এ, বেগম রোকেয়া রচনা করেন ***Sultana's Dream*** এবং সে বছরেই রচনাটি সরোজিনী নাইডু সম্পাদিত *ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিনে* প্রকাশিত হয়।[১০১] বেগম রোকেয়ার এই পর্যায়ের লেখনীসমূহ ছিল মহিলাদের বিশেষত মুসলিম মহিলাদের অশিক্ষা-কুশিক্ষা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, অন্যায় অবরোধ ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে। বেগম রোকেয়ার স্বাদেশিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় পরবর্তীকালের (১৯২০ পরবর্তী) লেখনী ও কর্মকাণ্ডে। বঙ্গভঙ্গ পর্বে তাঁর লেখনীতে বাঙালি মুসলিম নারীদের স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস দেখা যায় না। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে মুসলিম নারীদের তৎকালীন সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের পরিবর্তে নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিষয়টি তাঁর নিকট অধিক গুরুত্ববহ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবোধ বা রাজনৈতিক সচেতনতার বাইরে ছিলেন সেটি বলা চলে না। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত *নিরীহ বাঙালি* -তে বাঙালি জাতির হীন অবস্থার কারণ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন

> আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে স্বচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না। দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তা'তে আমাদের কি?
>
> আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। যথা:
>
> (১) রাজ্য স্থাপন অপেক্ষা 'রাজা' উপাধি লাভ সহজ।
>
> (২) শিল্প কার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা ই.ঝপ ও উ.ঝপ পাশ করা সহজ।
>
> (৩) অল্পবিস্তর অর্থব্যায়ে দেশের কোন মহৎ কার্য্য দ্বারা খ্যাতিলাভ করা অপেক্ষা ''খা বাহাদুর'' বা ''রায় বাহাদুর'' উপাধিলাভের জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।
>
> (৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোকে দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড় লোকেদের মৃত্যুদুঃখে ''শোক সভার'' সভ্য হওয়া সহজ।
>
> (৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।
>
> (৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।
>
> (৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য্য বর্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্কগন্ডে!) কালিডোর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (kalydore, milk of rose & vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।
>
> (৮) কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষনাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।[১০২]

Dhaka University Institutional Repository

এই লেখার মধ্যদিয়ে তিনি বাঙালিকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠে আত্মসচেতন হবার পরামর্শ দিয়েছেন। আর এভাবেই তিনি তাঁর দেশাত্ববোধ প্রকাশ করেছেন। ১৯০৮-এ বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী কানাইলালের ফাঁসি হলে বেগম রোকেয়া তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন *নিরুপম বীর* কবিতায়।[১০৩] তবে এই পর্যায়ে বয়কট আন্দোলন বা স্বদেশী কর্মকাণ্ডে বেগম রোকেয়ার সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া যায় না।

বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে যে অগ্রণী দল স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মহিলাদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত। এক্ষেত্রে যে নামটি একমাত্র হিসেবে পাওয়া যায় সেটি খায়রুন্নেসা খাতুন-এর। সময়কালে তিনি বেগম রোকেয়ার প্রায় সমসাময়িক। তাঁর জন্মসাল ১৮৭৪-১৮৭৬ এর মধ্যে।[১০৪] *নবনূর* পত্রিকায় খয়ের খাহ্ মুনসী ছদ্মনামে তিনি একাধিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন এবং সরাসরি বৃটিশবিরোধী ভূমিকা অবলম্বন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম নারী হিসেবে তিনিই প্রথম মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে বলেন

> মুসলমানগণ একযুগ ধরিয়া গবর্ণমেন্টের কৃপাভিখারী হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল লাভ হইয়াছে? মুসলমানগণ এই দীর্ঘকালমধ্যে কোন অধিকার কোন স্বত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? ... মুসলমানগণের অবনতি চরমে উঠিয়াছে। এখন আর বাকবিতণ্ডার সময় নাই। প্রকৃত কার্যের সময় আসিয়াছে; সর্ববিষয়ে উন্নতি সাধন জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। সমাজ শরীরের একাঙ্গ অপুষ্ট রাখিয়া অন্যান্য অঙ্গের পুষ্টিসাধনের আশা সুদূর পরাহত। ফলতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিতে হইবে।[১০৫]

বঙ্গভঙ্গ-এর ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ঘটবে বলে বৃটিশ সরকারের প্রচারণা যে ভ্রান্ত ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণীত এ বিষয়টি মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন খায়রুন্নেসা ছিলেন তাঁদের অন্যতম এবং উপনিবেশনিক শাসকের মানসিকতা বিশ্লেষণ করে তিনি বলে

> গবর্ণমেন্টের নিকট হিন্দু মুসলমান উভয়েই বিজাতি, উভয়ের ক্ষমতা লাভই ইংরাজের সমান স্বার্থবিরোধী। ইংরাজের রাজনীতি শিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টও বুঝিয়াছেন যে, শুধু ফাঁকা কথায় শিক্ষিত মুসলমানকে পরিতৃপ্ত রাখা সম্ভবপর নহে। ইহার ফলে ইংরাজের মুসলমানপ্রীতিতে ভাটা দেখা দিয়াছে। লর্ড কার্জন ময়মনসিংহে গমন করিয়া তত্রত্য মুসলমান সভার রাজকার্য্য প্রার্থনার উত্তরে কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করেন। ফলতঃ কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের পক্ষেই রাজনৈতিক আন্দোলন সমান প্রয়োজনীয়। এই জন্যই দেখা যাইতেছে যে, আজকাল হিন্দু মুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।[১০৬]

বৃটিশবিরোধী অবস্থান গ্রহণের পাশাপাশি খায়রুন্নেসা নারীদের স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য নবনূর পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে সচেষ্ট হন। তিনি মহিলাদের আহ্বান করেন

466881

> এই মহা আন্দোলনের সময় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিৎ নয়। আমাদেরও সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্তব্য। তাই বলিয়া আমি তোমাদিগকে বিরাট সভার আয়োজন করিতে বলিতেছি না, অথবা বক্তৃতার জন্য টাউন হলে ও রাস্তাঘাটে দণ্ডায়মান হইতে বলিতেছি না। আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে ঘরের একপার্শ্বে বসিয়াই পুরুষজাতির যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিব।....ভগ্নিগণ, আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশী শাড়ি পরিত্যাগ করি, বিলাতী বডিজ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

> সেমিজ ও মোজা ঘৃণার চক্ষে দেখি, লেভেন্ডারের পরিবর্ত্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি এবং লেডি-সু পায়ে দিয়া হুচট্ খাওয়ার দায় হইতে নিস্কৃতি পাই। তবেই আমরা স্বদেশের অনেক উপকার করিতে পারিব। .... ভগ্নিগণ, তোমরা কি চেয়ে দেখ না যে আমরা একেবারে উৎসন্নে গিয়াছি। আমরা নির্ব্বোধ না হইলে সাত সমুদ্র পার হইতে বণিকগণ আমাদিগকে সামান্য জার্ম্মান সিলভারের গহনা ও বেলোয়ারী চুড়ির দ্বারা প্রতারিত করিয়া জাহাজ ভরিয়া ভারতের ধন ও ধান্য লইয়া যাইতেছে আর আমরা মনে করিতেছি যে, বহুমূল্য দ্রব্য লাভ করিলাম। এইসব কি আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ নয়? .... তোমরা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিলে এই দরিদ্র ভারতের আর উপায় নাই। এখন আমাদের ঘুম ভাঙিবার সময় হইয়াছে। এখনও চাহিয়া দেখিলে আমাদের চেষ্টায় অনেক কার্য হইবে, আশা করি।[১০৭]

খায়রুন্নেসার জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করে গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ খায়রুন্নেসা খাতুনের এই রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, এমন কঠোর ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখার দৃষ্টান্ত সমসাময়িক অনেক লেখকের লেখাতেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।[১০৮] অসাম্প্রদায়িক এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিসচেতন মুসলিম নারী হিসেবে খায়রুন্নেসা বৃটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁর স্বদেশচেতনা মূলক লেখার মাধ্যমে, পাশাপাশি তিনি উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হবার পর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক মুসলিম নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দেন, কিন্তু খায়রুন্নেসা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।[১০৯] ১৯১০-এ অল্প বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তবে খায়রুন্নেসাকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখলে, সার্বিকভাবে বলা যায় বাঙালি মুসলিম মহিলাদের কেউই বিদেশী পণ্য বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হন নি তার কারণ প্রধানত মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশের স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধীতা এবং মুসলিম নারী সমাজের পশ্চাদপদ সামাজিক অবস্থান।

(৪)

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের ফলে ১৯১১-তে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করলে কংগ্রেস পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে ভাটা পরে এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে ভাটা পরার কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণ নারীদের উদ্বুদ্ধ করবার প্রচেষ্টাও মন্থর হয়ে পরে, এই সময়টি বরং বলা চলে নারীদের নিজেদের সংগঠিত হবার সময়। এই পর্যায়ে বিভিন্ন নারী সংস্থা গঠিত হয় এবং তা শুধু বাংলায় নয়, দেখা যায় সর্বভারতীয় পর্যায়ে নারী সংস্থা স্থাপিত হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলায় এই সময়ে যে দুটি উল্লেখযোগ্য নারী সংস্থা দেখা যায় সে'দুটি হচ্ছে বঙ্গ-মহিলা সমাজ এবং অঘোরকামিনী নারী সমিতি। অঘোরকামিনী নারী সমিতির লক্ষ্য ছিল মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলা এর পাশাপাশি তাদের অসুস্থদের সেবা করতে এবং নিজেদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজেও প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। সরলাদেবী চৌধুরানী ১৯১০ সালে গড়ে তোলেন ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল যার একটি শাখা স্থাপিত হয় কলকাতায়। এই সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল সকল নারীর জন্য অধিকার আদায়ের লক্ষে সমাজের সর্বস্তরের নারীদের একত্রিত করা এবং এর মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটি সর্বসমক্ষে নিয়ে আসা। তবে সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রথম সার্থক সংগঠন হিসেবে যে প্রতিষ্ঠানটির নাম আসে সেটি 'উইমেন্স ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডরোথী জিনারাদেশা, মার্গারেট কুজিন্স ও এ্যানি বেসান্ত। ১৯১৬-তে হোমরুল আন্দোলনের মাধ্যমে এ্যানি বেসান্ত-এর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান ভারতীয় নারীদের সাথে সাথে বাংলার নারীদেরও ভবিষ্যত রাজনৈতিক পথ সুগম্য হয়ে ওঠে। হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ্যানি বেসান্ত কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদসহ বিভিন্ন স্থানে "ভারত জাগো" শিরোনামে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি জাতীয়তাবাদ, হিন্দুধর্মের পুনঃজাগরণের পাশাপাশি নারী প্রসঙ্গেও বক্তব্য প্রদান করেন।[১১০] এ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত 'উইমেন্স ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এর লক্ষ্য ছিল

- To Present to women their responsibilities as daughters of India
- To help them to realise that the future of India lies largely in their own hands; for as wives and mothers they have the task of training and guiding and forming the character of the future rulers of India
- To secure for women the vote for Municipal and legisletive councils as it is or may be granted to men
- To secure for women the right to be elected as members of all Municipal and legislative councils.
- To band women into groups for the purpose of self-development, education and for the definite service of others.[111]

বাঙালি নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে ভোটাধিকারের দাবি এবং নির্বাচিত হবার অধিকারের দাবি এই প্রতিষ্ঠানটিই প্রথম সামনে নিয়ে আসে। সারা ভারতজুড়ে এই প্রতিষ্ঠানটির শাখা স্থাপিত হয় এবং সবধর্মের নারীরা এর সদস্য হতে পারত। সংস্থাটি স্ত্রী-ধর্ম নামে একটি নিজস্ব সাময়িকী প্রকাশ করত। তবে প্রতিষ্ঠানটির সদস্যরা প্রত্যেকেই ছিলেন শিক্ষিত এবং সকলেই সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রগতিশীল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং পরিবারের সমর্থনপুষ্ট। ১৯১৭-এর নভেম্বরে ভারত সচিব এডউইন মন্টেগু ভারত সফরে আসলে এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় নারীদের জন্য ভোটাধিকার এর দাবি তোলে। কিন্তু মন্টেগু প্রথমে কেবল ভারতীয় পুরুষদের সঙ্গে হোমরুল-এর দাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করে। এসময়ে মার্গারেট কসিন্স সহ মহিলারা মন্টেগুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন এবং ১৮ ডিসেম্বর ১৯১৭ সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ১৪ জন মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এই প্রতিনিধি দলে সরোজিনী নাইডু ব্যতীত অপর একজন বাঙালি নারীর নাম পাওয়া যায়, সেটি অবলা বোসু-র।[১১২] নারীর অধিকার আদায়ে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য সরোজিনী নাইডু নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে জোর দেন। প্রতিনিধিদল বলেন আইনসভায় নারীর

Dhaka University Institutional Repository

অনুপস্থিতির কারণে তাদের নারীর উন্নয়নের বিষয়টি উপেক্ষিত হচ্ছে। প্রতিনিধিদল বলেন, "When such a franchise is being drawn up, women may be recognised as 'people', and that it may be worded in such terms as will not disqualify our sex, but allow our women the same opportunities of representation as our men."[113]

এই প্রথম নারীরা তাদের নিজস্ব দাবি নিয়ে প্রকাশ্যে বের হলো, বলা চলে এটি ভারতীয় নারীদের সংগঠিত রাজনৈতিক কর্মসূচির সূচনা। এবং এইক্ষেত্রে বাঙালি নারীর প্রতিনিধিত্ব বাংলার নারীর রাজনৈতিকায়নের ইঙ্গিতবহ যদিও এই প্রতিনিধিত্ব ছিল অভিজাতশ্রেণির। স্বাভাবিকভাবে ১৯১৮-তে প্রদত্ত মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে নারীদের এই দাবির বিষয়টি উল্লেখিত হয় নি। ভারতীয় নারীরা এর প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠে। ভোটাধিকার তাদের জন্য ছিল একটি ন্যায়সঙ্গত দাবি। তারা যুক্তি দেখান যে, যেহেতু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিসহ সব বিষয় নারী এবং গৃহকে প্রভাবিত করে অতএব দেশের উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। এই প্রতিবাদের ফলে নারীর ভোটাধিকারের বিষয় অনুসন্ধানে সাউথবরো ফ্রান্টাইস কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯১৯-এ এই কমিটিতে ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারে পক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদানের জন্য একটি নারী প্রতিনিধিদল লন্ডন যান।[১১৪] এই প্রতিনিধিদলে সরোজিনী নাইডু অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বৃটিশ সরকার এই বিষয়ে কোন সমাধান প্রদান না করে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভার ওপর ন্যাস্ত করে। এভাবে নারীর ভোটাধিকার প্রসঙ্গটি প্রাদেশিক রূপ গ্রহণ করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে অবিভক্ত বাংলায় বঙ্গীয় নারীসমাজ বাঙালি নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের আন্দোলন করে।

১৯১৭-এর কলকাতা কংগ্রেস নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এই অধিবেশনে এ্যানি বেসান্ত কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। এই কলকাতা কংগ্রেসে প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীর ভূমিকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। তবে সরোজিনী নাইডু এবং এ্যানি বেসান্ত উভয়েই নারীর ভূমিকাকে মুখ্য হিসেবে না দেখে সহকারী হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেন এবং বেসান্ত তাঁর সভাতির ভাষণে নারীদের পক্ষ থেকে বলেন

> I am only a woman, and I would like to say to you all, when your honour strikes, when you need torch bearers in the darkness to lead you, when you need standard bearers to uphold your banner and when you die for want of faith, the woomanhood of India will be with you as the holders of your banner, and the sustainers of your strengh. And if you die, remember that the spirit of padmini of chittor is enshrined with the manhood of India.[115]

স্পষ্টতঃই তিনি নির্দিষ্ট করে দিলেন যখন প্রয়োজন হবে পুরুষের আন্দোলনে তখনই নারী তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। সার্বিকভাবে বলা যায় অবিভক্ত বাংলায় বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন সমাপ্ত হবার পরবর্তী সময়ে এবং বিশের দশকে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার মধ্যবর্তী সময়টিতে বাঙালি নারীর

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিকায়নের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় নি। যদিও এই সময়কালে সর্বভারতীয় পর্যায়ে নারীর ভোটাধিকারের দাবি উত্থাপিত হয় এবং সেখানে বাঙালি নারীর প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়, তথাপি সর্বস্তরের নারীদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবার জন্য পরবর্তী দশক (বিশের দশক)পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। স্বদেশী আন্দোলনে নারীর ভূমিকার সীমাবদ্ধতা হিসেবে এই পর্যায়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নারীনেতৃত্বের অভাবকে চিহ্নিত করা যায়। পাশাপাশি এই আন্দোলনের রক্ষণশীল ভূমিকা নারীর অংশগ্রহণকে পরোক্ষ করে রাখে যার প্রমাণ পাওয়া যায় নারীর জন্য নির্ধারিত কর্মসূচির মধ্যে, যে কর্মসূচি নারীকে তার নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করার অনুমতি প্রদান করে নি। এছাড়া মুসলিম নারীদের অনুপস্থিতি এই আন্দোলনের সার্বজনীনতা অর্জনে ব্যর্থ করে। এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে বলা যায় স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুরুষরা প্রথমবারে মত উপলব্ধি করলেন যে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না করেও নারীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করা যায় তাদের আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আর নারীরা পুরুষদের নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিজেরা নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে এবং স্বদেশীব্রত গ্রহণ করতে থাকে। এসময়ে বৃটিশ এম.পি (যিনি পরবর্তীতে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হন) জেমস্ ম্যাকডোনাল্ড-এর স্ত্রী ভারত ভ্রমনে এসে বাংলার নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন

> A tremendous movement going on amongst the women. We are fond of labelling the Indian aspiration as sedition, when if they were amongst ourselves we should call them patriotism. This movement seems to be spreading as much amongst the women as amongst the men. ... Take for instance the Swadeshi movement. This could not have succeeded in the way it has done without women. They have meetings in each others houses and determine only to buy goods made at home and not to buy goods made by foreigners. The women in the Zenanas often do not know how to read or write. but inspite of this the Swadeshi movement is spreading very much in the places where one could hardly think there would be opportunity for its growth.[116]

প্রায় একই বক্তব্য পাওয়া যায় একজন বৃটিশ সাংবাদিক Valentine Chirole- এর লেখায়। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার নারীদের সম্পৃক্তি সম্পর্কে বলেন

> The revolt seems to have obtained a firm hold in the zenana and the hindu women behind the purdah often exercises a greater influsence on her husband and sons than the English Women who move so freely about the world.... In Bengal even small boys of so tender an age as still have the run of the zenana have, I have been told, been tought the whole pattern of sedition and go about from house to house dressed up as little sanyasis in little yellow robes preaching hatred of the English.[117]

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের শেষার্ধে বৃটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলায় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। এর ফলে বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির নিকট গোষ্ঠী হিসেবে জাতিসত্তা প্রাধান্য পায়। আর এর মধ্যদিয়েই বাংলার নারীদের জন্য লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে আলাদা শ্রেণি হিসেবে বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, যার সূত্রপাত উনিশ শতকের শুরুতে সংস্কারবাদী শিক্ষিত বাঙালি নেতৃবৃন্দের সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছিল। যখন বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি নিজেদের পরনির্ভরশীল এবং অধঃস্তন অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে, এমন এক পরিস্থিতিতে বাঙালি নারীরসমাজের পক্ষে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য বা নারীর অধঃস্তন অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ সৃষ্টি হয় নি। এর বিপরীতে তারা বাঙালি জাতি হিসেবে উপনিবেশিক শাসকদের শোষণ এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতন হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই। এই প্রেক্ষাপটে উপনিবেশিক শাসকবর্গ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে বাঙালির উপনিবেশবিরোধী চেতনা তাত্ত্বিক ধারণা ও লেখার পর্যায় অতিক্রম করে বিধিবদ্ধ সক্রিয় রাজনীতির রূপ পরিগ্রহ করে এবং বাঙালি নারীর জন্য রাজনৈতিক অঙ্গণে প্রবেশের পথটির সূত্রপাত ঘটে এভাবে। তবে দেখা যায় যে, এই পর্যায়ে বাঙালি নারী তাদের চিরায়ত ভূমিকার বাইরে বের হবার সুযোগ পায় নি। এই পর্যায়ে বরং তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে (বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার) স্বদেশচেতনায় দীক্ষালাভ করে। বলা যায় বাঙালি নারীর জন্য স্বদেশচেতনা তাদের গার্হস্থ্য জীবনের অংশ হিসেবেই বিকাশলাভ করে। একই সাথে অপর লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, বিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালি নারী দেশাত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া বা তাদের রাজনৈতিকায়নের যে সূত্রপাত হয়, সেটি কোন নির্দিষ্ট ঘটনা বা নিয়ামক না হয়ে বরং ঘটনার ফলাফল হিসেবেই ঘটে। এ কারণে দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন সমাপ্ত হবার পর নারীর রাজনৈতিকায়নের বিষয়টি স্থবির হয়ে থাকে বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত। বঙ্গভঙ্গ রদ পরবর্তী এবং মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ববর্তী সময়টি নারীর সামাজিকায়ন বা বা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত হবার পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পরিশেষে এটা বলা যায় যে, সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন বাংলার সাধারণ নারীদের প্রথমবারের মত তাদের গার্হস্থ্য জীবনের বাইরে একটি জগতের সঙ্গে পরিচিত করে তোলে। যদিও এই বহিঃজগতে প্রবেশের পূর্ণাঙ্গ অধিকার বাঙালি নারীরা এই পর্যায়ে লাভ করে নি। নিঃসন্দেহে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন পরবর্তী দশকগুলোতে বাঙালি নারীর রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তির পথ প্রশস্ত করে যা পরবর্তী অধ্যায় সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. Dagmar Engels, ***Beyond Purdah? women in Bengal 1890-1939,***(New Delhi: Oxford University Press, 1996), p. 23
২. Ibid, p. 23
৩. Ibid, p. 24
৪. Meredith Borthwick, ***The Changing Role of Women in Bengal: 1849-1905,***(Princeton: Princeton University press, 1984) p. 336
৫. Ibid, p. 337
৬. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ৩৩৭
৭. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ৩৩৭
৮. Kumar, ***The History of Doing***, p. 34
৯. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ৩,
১০. Kumar, ***The History of Doing***, p. 34
১১. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ৫
১২. Geraldine Forbes, ***Women in Modern India***, (New York: Cambridge University Press, 1998), p. 122
১৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস(১৯০৫-১৯৪৭)*, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ৩৯
১৪. ঐ, পৃ. ৪০
১৫. Borthwick, ***The Changing Role of Women in Bengal***, p. 338
১৬. ঐ
১৭. সরলা দেবী চৌধুরানী, *জীবনের ঝরাপাতা*, (কলকাতা: রূপা এন্ড কোম্পানী, ১৯৮২), পৃ. ২৮, ৪৭,৪৮, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৪১, ১৫২, ১৫৩
১৮. হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ৩৬, ৩৭
১৯. কমল চৌধুরী (সম্পাদিত ও সংকলিত), *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গ সমাজ*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫), পৃ. ৩৩
২০. ঐ
২১. ঐ
২২. বারিদ বরণ ঘোষ (সম্পাদিত), *সমকালীন সাহিত্যে বঙ্গ ভঙ্গ*, (কলকাতা: পুনশ্চ, ১৯০৫), পৃ. ১
২৩. ঐ, পৃ. ১
২৪. ঐ
২৫. মুখোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, পৃ. ৩৬, ৩৭
২৬. ভারতী রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ(১৯১১-২৯)', রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত), *ভারত ইতিহাসে নারী*, (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৯), পৃ. ৪৬
২৭. ঘোষ (সম্পাদিত), *সমকালীন সাহিত্যে বঙ্গ ভঙ্গ*, পৃ. ৯
২৮. ঐ
২৯. শ্রী সরযুবালা দত্ত (সম্পাদিত), *ভারত মহিলা : সচিত্র মাসিক পত্রিকা*; প্রথম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র-১৩১২, (কলকাতা: ২১০/৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট)
৩০. ঐ
৩১. দত্ত (সম্পাদিত), *ভারত মহিলা : সচিত্র মাসিক পত্রিকা*; প্রথম ভাগ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন-১৩১২
৩২. শ্রী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, *বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা*, (কলকাতা: বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ: ভূমিকা
৩৩. ঐ, পৃ. ১২
৩৪. Engels, ***Beyond Purdah?***, p. 29
৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রতধারণ, ঘোষ (সম্পাদিত), *সমকালীন সাহিত্যে বঙ্গ ভঙ্গ*, পৃ. ৩২৯
৩৬. অভয়বাণী, ঘোষ (সম্পাদিত), *সমকালীন সাহিত্যে বঙ্গ ভঙ্গ*, পৃ. ৩৪৩
৩৭. ঐ
৩৮. শ্যামলী গুপ্ত, *বাংলার নারী আন্দোলন (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)*, একসাথে; আষাঢ়, ১৪১৫ (কলকাতা)

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ৮
৪০. ঐ
৪১. ঐ
৪২. শ্যামলী গুপ্ত, *বাংলার নারী আন্দোলন (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)*
৪৩. ঐ
৪৪. Borthwick, ***The Changing Role of Women in Bengal***, p. 350
৪৫. Forbes, ***Women in Modern India***, p. 123
৪৬. উদ্ধৃত : বসু, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ৩১৬
৪৭. Geraldine Forbes (edited), Sudha Mazumder, ***Memoirs of an Indian Women,*** (New York; M. E. Sharpe, Inc., 1989), p. 45
৪৮. Borthwick, ***The Changing Role of Women in Bengal***, p. 350
৪৯. শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ মহিলা', শ্রী সরযুবালা দত্ত (সম্পাদিত), *ভারত মহিলা : সচিত্র মাসিক পত্রিকা*; প্রথম ভাগ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ-১৩১২
৫০. Borthwick, ***The Changing Role of Women in Bengal***, p. 351
৫১. শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ মহিলা'
৫২. ঐ
৫৩. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ৯
৫৪. ঐ
৫৫. Borthwick, ***The Changing Role of Women in Bengal***, p. 353
৫৬. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ৯
৫৭. মনোরমা বসুর *আত্মস্মৃতিকথা*, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য ও শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *মনোরমা বসু স্মারক গ্রন্থ*, (কলকাতা : সমন্বয়, ১৯৮৭), পৃ. ১০৬
৫৮. আশালতা সেন, *সেদিনের কথা*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ১৪
৫৯. ঐ
৬০. ঐ
৬১. কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, (কলকাতা: জয়শ্রী প্রকাশনী, আষাঢ়-১৩৯৬), পৃ. ১০০
৬২. Kumar, ***The History of Doing***, p. 41
৬৩. Ibid
৬৪. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৩
৬৫. ঐ
৬৬. ঐ
৬৭. গুপ্ত, *বাংলার নারী আন্দোলন (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)*
৬৮. ঘোষ (সম্পাদিত), *সমকালীন সাহিত্যে বঙ্গ ভঙ্গ*, পৃ. ৫৪
৬৯. ঐ
৭০. ঐ, পৃ. ৭৯
৭১. গুপ্ত, *বাংলার নারী আন্দোলন (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)*
৭২. ঐ
৭৩. ঐ
৭৪. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *বাংলায় বিপ্লববাদের পালাবদল*, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২), পৃ. ১
৭৫. তীর্থা মন্ডল, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গনারা (১৯০৫-৩৯)*, (কলকাতা: মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩) পৃ. ৮
৭৬. ঐ
৭৭. Manmohan Kaur, ***Women in India's Freedom Struggle***, (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1985) p. 93
৭৮. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ১১
৭৯. মুখোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, পৃ. ২৯
৮০. Kaur, ***Women in India's Freedom Struggle***, p. 93
৮১. Ibide, p. 94
৮২. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

৮৩. মন্ডল, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গনারা* , পৃ. ৯
৮৪. ঐ
৮৫. বসু, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ৩১৬
৮৬. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ৬৭
৮৭. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, *ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে শ্রীহট্ট*, (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১০) পৃ. ৫৪
৮৮. Kumar, ***The History of Doing***, p. 49
৮৯. কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ৩৬
৯০. মন্ডল, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গনারা* , পৃ. ১০
৯১. ঐ
৯২. অরুণ চৌধুরী (সম্পাদিত), *আগুনের পরশমণি : ভারতের অস্ত্র-আইনে দণ্ডিত প্রথম নারী দুর্কাড়বালা দেবী*, (কলকাতা: মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও অবভাস, ২০০৩), পৃ. ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ২৩,২৪, ৩৮
৯৩. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ২০২, ২০৩, ২৭২, ২৭৩
৯৪. মুখোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, পৃ. ১৪৫
৯৫. রথীন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন : শতবর্ষ স্মারক সংগ্রহ*, (কলকাতা: নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, ২০০৬), পৃ. ১৮
৯৬. ঐ
৯৭. মুখোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, পৃ. ১৪৫, ১৪৬, ১৫১,১৫২
৯৮. মৌলভী একিনউদ্দীন আহমদ,'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ', চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন : শতবর্ষ স্মারক সংগ্রহ*, পৃ. ৯০-৯২
৯৯. মৌলভী আবদুল করিম, 'স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ', চক্রবর্তী(সম্পাদিত), *বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন : শতবর্ষ স্মারক সংগ্রহ*, পৃ. ১২৮
১০০. চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন : শতবর্ষ স্মারক সংগ্রহ*, পৃ. ১৭
১০১. মফিদুল হক, *নারীমুক্তির পথিকৃৎ* , (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭), পৃ. ১৫৮
১০২. বেগম রোকেয়া রচনা সমগ্র, পৃ. ৩৪
১০৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৬
১০৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ১৯
১০৫. খয়েরখাহ্ মুন্শী, 'রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান', কমল চৌধুরী (সম্পাদিত ও সংকলিত), *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গ সমাজ*, পৃ. ৩৩৬
১০৬. ঐ
১০৭. খায়রন্নেসা, স্বদেশানুরাগ, চৌধুরী (সম্পাদিত ও সংকলিত), *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গ সমাজ*, পৃ. ৩৩৩
১০৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন*, পৃ. ৪৬
১০৯. ঐ, পৃ. ২৫
১১০. Kumar, ***The History of Doing***, p. 54
১১১. Rozina Visram, ***Women in India and Pakistan : The Struggle for independence from British rule***, (New York: Cambridge University Press, 1992), p. 17
১১২. রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ(১৯১১-২৯)', পৃ. ৪৬
১১৩. Visram, ***Women in India and Pakistan*** , p. 17
১১৪. ঐ
১১৫. Kumar, ***The History of Doing***, p. 57
১১৬. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৫
১১৭. Visram, ***Women in India and Pakistan***, p. 20

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
সক্রিয় রাজনীতিতে নারী : ১৯২০-২৯

১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদ-এর মধ্যদিয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন সমাপ্ত হবার পর অবিভক্ত বাংলা তথা সমগ্র বৃটিশভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কিছুটা স্থবিরতা দেখা যায়। পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভারতীয় রাজনীতি পুণরায় সক্রিয় রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, বৃটিশ সরকার তাদের প্রতিশ্রুত রাজনৈতিক সংস্কার করবে না এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভারতবাসীদের দেয়া হবে না। ১৯১৯-এ মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে বৃটিশ পার্লামেন্টে Government of India Act পাশ হয়। এই আইনে ভারতীয়রা বিভিন্ন প্রদেশের জন্য প্রাদেশিক আইনসভা লাভ করে, যে সভা কেবল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ক সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার রাখত। এই সিদ্ধান্তকে উপনিবেশিক সরকার উপেক্ষা করতে পারত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই সংস্কার আইন খুশি মনে মেনে নেয় নি। একই সময়ে রাওলাট এ্যাক্ট পাশ করা হয়, যাতে করে বৃটিশ পুলিশকে কোন প্রকার পূর্ব অনুমতি ছাড়াই যে কাউকে আটক ও বিচার করবার অধিকার দেয়া হয়। ভারতীয়রা একে মানবাধিকারের লংঘন এবং তাদের জন্য অপমানজনক হিসেবে গণ্য করলেন। স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এবার দেখা গেলো সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিবাদ-আন্দোলন শুরু হলো। পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এপ্রিলের ১৩ তারিখে জেনারেল ও'ডায়ার নিরস্ত্র মানুষের এক সমাবেশে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ভারতের সব প্রদেশের নেতৃবৃন্দ সোচ্চার হলেন। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে নাইট উপাধি বর্জন করেন। এসময়ে সরোজিনী নাইডু ইংল্যান্ডে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখানে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি ভারতসচিব মন্টেগু-এর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে বিতর্ক করেন এবং নিজ বক্তব্যের সপক্ষে কংগ্রেস রিপোর্ট থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেন।[১] ১৯২০-এ কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং নাগপুরের বার্ষিক অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবিত অহিংস-অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব পাশ করার মাধ্যমে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন পর্যায় শুরু হয়। বাংলার রাজনীতিও পুণরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। চিত্তরঞ্জন দাস বাংলায় ফিরে আসেন এবং আইন ব্যবসা ছেড়ে গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রেক্ষাপটে বাংলার নারীদের রাজনৈতিকায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটে।

১৯২০-এর বৃটিশবিরোধী এই গান্ধীবাদী আন্দোলনে বাঙালি মহিলাদের যোগদানের ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন ভারতী রায়, প্রথমত, দেশপূজার সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের একাত্মকরণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি ও নারীশক্তির জাগরণের বন্দনা এই পর্বে এসেও চলতেই থাকে, যার ফলে মহিলাদের যোগদান সহজ হয়ে ওঠে। যার উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় *দৈনিক বসুমতীতে* ১৯২১-এর ডিসেম্বরে বলা হয় ''হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে অনাচারের অবসান ঘটাতে যখন দেবশক্তি সক্ষম হয় নি একমাত্র নারীশক্তিই তখন সাফল্য লাভ করেছে।'' এ বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নেই যে, বৃটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ ও সহঅবস্থান বাংলার নারীদের জন্য এই আন্দোলনে যোগদানের পথ প্রশস্ত করে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় নেতারূপে গান্ধীর উত্থান মহিলাদের যোগদানকে সাহায্য করে। সুচেতা কৃপালনির সূত্রে ভারতী রায় উল্লেখ করেন, ''গান্ধীর চরিত্র ছিল মহৎ...। মহিলারা যখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল এবং রাজনীতির মঞ্চে কাজ শুরু করল, পরিবারের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধতার মুখোমুখি তাদের হতে হয় নি কারণ তারা জনত যে মহিলারা সুরক্ষিত।'' তৃতীয়ত, ''আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপিনচন্দ্র পালের মত জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতা এবং বাসন্তীদেবী ও হেমপ্রভা মজুমদার-এর মত নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ মহিলাদের উত্থান ঘটে। মহিলা নেতৃবৃন্দ নারীদের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেন।''[২]

বাঙালি তথা সমগ্র ভারতীয় নারীর রাজনৈতিয়ায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর উত্থানকে সবচেয়ে কার্যকর সূচক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণে দেখা যায়, গান্ধীর উপলব্ধি ছিল অহিংস নীতিকে ভিত্তি করে দেশব্যাপী বিস্তৃত একটি শক্তিশালী গণআন্দোলন-এর মধ্যদিয়ে জনগণকে সক্রিয় করে বৃটিশ রাজশক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব। গান্ধীর রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বাস ছিল বৃটিশ শাসন-এর বিপরীতে স্বাধীনতা অর্জন অল্প সময়ে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে সম্ভব হবে না, তাঁর কৌশল ছিল গঠণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে গণমানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা। তিনি যে গঠণমূলক কর্মসূচির ধারণা তৈরি করেন সেই কর্মসূচি মানব জীবনের দুইটি দিককে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করা হয়। একটি তার বহির্জগৎ,যেখানে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, দ্বিতীয়টি ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জগৎ যা ব্যক্তির আদর্শ এবং নৈতিকতা নিয়ন্ত্রণ করে।[৩] গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয়দের এই দুই ধারায় উন্নয়নে সচেষ্ট ছিল। গঠনমূলক কর্মসূচিকে গান্ধীজী অধিক গুরুত্ব দেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর প্রণীত গঠনমূলক কর্মসূচি আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসরণ করলে বৃটিশবিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কোন প্রয়োজন হবে না এবং এই আন্দোলনের বিশেষ দিক ছিল এতে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রণের সুযোগ তৈরি করা হয় এবং বাংলাসহ সম্পূর্ণ ভারতের নারীরা এতে সাগ্রহে এবং সানন্দে শরিক হন। দেশমুক্তির মাধ্যমে নারীমুক্তি এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে গান্ধীজী মনে করতেন অহিংস আন্দোলন-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে মেয়েরা দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করলে তাদের নিজেদেরও মুক্তি আসবে এর বিপরীতে তাদের মুক্তি না এলে দেশের মুক্তি সম্পূর্ণ হবে না। তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয়

Dhaka University Institutional Repository

সেটি হলো, মেয়েদের মুক্তি বলতে গান্ধী তাদের গৃহজীবনকে তাৎপর্যময় করে তোলা এক পরিপূরক কর্মজীবনের কথা বলেছিলেন, যে কারণে তাঁর আঠারো দফা গঠনমূলক কর্মসূচীর মধ্যমণি ছিলো চরকা-যা নারীর গার্হস্থ্যকর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনেও নারীর ভূমিকা নির্ধারিত হয় সমাজের ঐতিহ্য ও নারীর চিরায়ত ভূমিকা অনুসারে। গান্ধীজী অভিমত পোষণ করলেন যে

> সমভাবেই সত্য যে আকৃতিতে উভয়ের মধ্যে জন্মগত পার্থক্য আছে। সুতরাং উভয়ের বৃত্তিও পৃথক হওয়া দরকার। যে মাতৃত্বের দায়িত্ব অধিকাংশ নারীকে গ্রহণ করতেই হবে তার জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন তা পুরুষের না থাকলেও চলে। আবার পুরুষ যেখানে সক্রিয়, নারী সেখানে নিষ্ক্রিয়। সে মুখ্যতঃ গৃহকর্ত্রী। পুরুষ আহার্য সংগ্রহ করে--নারী তা সংরক্ষণ ও বিভাজন করে। ভাষাগত অর্থেই নারী তত্ত্বাবধায়িকা।--- আমার মতে নারীকে গৃহত্যাগী করে সেই ঘর রক্ষা করার জন্য তাকে বন্দুক ধরতে আহ্বান করা বা প্রবুদ্ধ করা নর ও নারী উভয়ের পক্ষেই লজ্জাকর। এ অসভ্যতায় প্রত্যাবর্তন ও বিনাশের সূচনা করে। যে ঘোড়ায় পুরুষ আরোহন করে আছে তাতে আরোহী হবার চেষ্টায় দুজনেই পড়ে যায়। নিজের সাথীকে তার বিশেষ বৃত্তি ত্যাগ করতে জোর করা বা প্রলুব্ধ করার অপরাধ পুরুষের ওপরেই পড়বে।[৪]

পরবর্তী সময়ে দেখা যায় একজন আমেরিকান মহিলার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ''নারীর উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমি বিশ্বাস করি। এও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নারী পুরুষের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে বা তার ভাবভঙ্গি নকল করে জগতে কোন অবদান করতে পারবে না। প্রতিযোগিতা সে করতে পারে কিন্তু পুরুষের ভাবভঙ্গির নকল করে সে তার অধিগম্য শীর্ষস্থানে পৌঁছুতে পারবে না। তাকে পুরুষের পরিপূরক হতে হবে।''[৫]

দেখা যাচ্ছে যে, মহাত্মা গান্ধী সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরোধী ছিলেন। তবে নারীর অবস্থান উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেও নারীর কাজের নির্দিষ্ট গণ্ডিতে তিনি বিশ্বাস করতেন। কাজেই তিনি ভারতীয় নারীদের কাছে সীতার উদাহরণ তুলে ধরলেন এবং তাদেরকে সীতার আত্মত্যাগ ও স্বামীর প্রতি আনুগত্যের প্রেরণায় নিজেদের জীবন পরিচালনা করবার জন্য উৎসাহিত করলেন। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯২০-এ ডাকোর অঞ্চলে মহিলাদের এক সমাবেশে গান্ধী তাদের উদ্দেশে বলেন

> We can set ourselves free this very day if India adopts *swadeshi*, if all women take to the good old spinning-wheel and if they put on clothes made only with yarn spun by themselves. To the women of the past, virtue was beauty. --- what is our image of Sita and Damyanti, whom we adore? Is it that of women clad in finery? We revere Damayanti who wandered in the forest, half-clad, and Sita who suffered *vanavasa* for fourteen years. ---- if you want to follow your *dharma*, you must first understand the *swadeshi dharma*. It consists in using cloth made with yarn spun by yourselves and

Dhaka University Institutional Repository

> woven by your menfolk. singing as they work. --- when the women in the country have woken up, who can hinder Swaraj? *Dharma* has always been preserved through women. Nations have won their independence because women had brave men for sons. By preserving purity of character, they have kept *dharma* alive. There have been women who sacrificed their all and saved the people. When women, who have done all this, have become alive to the suffering of the country, how long can that suffering last?[৬]

গান্ধী বিশ্বাস করতেন নারী প্রকৃতিপ্রদত্ত নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং দুঃখ গ্রহণের অসীম ক্ষমতার অধিকারী আর তাই বৃটিশবিরোধী অহিংস আন্দোলনে নারীর এই আত্মত্যাগের শক্তিকে ব্যবহার করার কথা তিনি বলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল

> ... to call women the weaker sex is a libel; it is man's injustice to women. If by strength is meant brute strength, then indeed is a women less brute than man. If by strength is meant moral power then women is an immeasurably man's superior. Has she not great intuition, is she not more self-sacrificing, has she not great powers of endurance, has she not great courage? Without her, man could not be. If non-violence is the law our being, the future is with women.[৭]

এভাবে দেখা যায় ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদান এবং নারীর প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি প্রদানের কারণে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন অংশগ্রহণের প্রকৃতিও সক্রিয় হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সবচাইতে বড় সাফল্য ছিল এতে বিভিন্ন প্রদেশের নারীদের সম্পৃক্ততা। তারা একদিকে মিছিল-মিটিং-এ যেমন অংশ নেয়, তেমন খাদি ও চরকা প্রচলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহ্য অনুসারে নির্ধারিত নারীর ভূমিকার নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ কর্যক্রম দেয়া স্বত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। এ প্রসঙ্গে অরুণা আসফ আলী বলেন

> Gandhiji's appeal was something elemental. At last, a women was made to feel the equal of man; that feeling dominated us all, educated and non-educated. The majority of women who came into the struggle were not educated or westernised. --- The real liberation or emancipation of Indian women can be traced to this period,----No one single act could have done what Gandhiji did when he first called upon women to join and said: 'They are the better symbols of mankind. They have all the virtues of a *satyagrahi*.' All that puffed us up enormously and gave us a great deal of self-confidence.[৮]

Dhaka University Institutional Repository

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পটভূমিতে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে বলেন, "and from the time Gandhiji's leadership arose, I became much more attracted towards the political question. Before that of course I was reading so much about the other leaders and about the political question --- but there was a difference in the message that he bought to me." [৯]

বিশ শতকের বিশের দশকে বাঙালি নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রকৃতি বিশ্লেষণে যে ধারাগুলি দেখা যাবে তা হচ্ছে-

১. কংগ্রেসের নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে নারীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ।

২. ভোটাধিকারের দাবীতে নারীর আন্দোলন।

৩. লীলা রায়ের নেতৃত্বে "দিপালী সংঘ"-এর প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে নারীর বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

৪. এই পর্যায়ে ছাত্রী সংগঠনের অধীনে ছাত্রীরা আন্দোলনে এগিয়ে আসে।

৫. এই পর্যায়ে খিলাফত আন্দোলন শুরু হবার ফলে মুসলিম সমাজ বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হলে স্বল্প মাত্রায় হলেও মুসলিম নারীর রাজনৈতিকায়ন শুরু হয়।

৬. কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হবার পর এই দশকে শ্রমিক আন্দোলনে বাংলার নারীর সীমিত আকারে অংশগ্রহণ।

রাজনৈতিকায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাঙালি নারীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রিত হয় কংগ্রেসের মাধ্যমে। ১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে গঠিত হয় "নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী"। সংঘবদ্ধভাবে বাঙালি নারীর প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এই প্রথম।[১০] ১৯২০-এ কলকাতায় গান্ধীর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হন রেনুকা রায় সহ *ডায়োশেসান* কলেজের ছাত্রীরা। তাঁরা তাঁদের অলংকার গান্ধীকে প্রদান করেন এবং রেনুকা রায়সহ তাঁদের অনেকে কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।[১১] বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব চিত্তরঞ্জন দাস গ্রহণ করলে তাঁর সাথে এগিয়ে আসেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী। বাসন্তী দেবীর রাজনীতিতে যোগদান বাংলার নারীদের রাজনৈতিকায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলায় মেয়েদের আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ-এর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও বোন উর্মিলা দেবী। বাসন্তী দেবী স্বামীর সঙ্গে অবিভক্ত বাংলার বহু জেলা ভ্রমণ করেন এবং সর্বত্রই মেয়েদের নিয়ে সভা, শোভাযাত্রা করেছেন, সূতোকাটা এবং স্বদেশী জিনিস প্রচারে উদ্বুদ্ধ করেছেন, একই সঙ্গে মেয়েদের কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাতেন।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতায় বিভিন্ন বিদেশী পণ্য বিক্রয়কেন্দ্রে মেয়েদের পিকেটিং-এ নেতৃত্বও দেন বাসন্তী দেবী। এ সময়ে কলকাতায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতা-কর্মীরা কারারুদ্ধ হতে থাকে। নারীরা পুরুষের স্থান পূরণে এগিয়ে আসে, ১৯২১ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতার রাস্তায় আইন অমান্য করে খদ্দর বিক্রি করবার সময় বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী ও সুনিতী দেবীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আইন অমান্য আন্দোলনে বাংলায় নারীদের গ্রেফতার হবার ঘটনা এই প্রথম। তাঁদের লালবাজারে নেয়া হলে তাঁরা কোনোরকম মুচলেকা দিতে অস্বীকার করেন এবং জামীনে মুক্ত হতেও অস্বীকৃতি জানান।[১২] জনগণের তীব্র বিক্ষোভে পুলিশ তাদের সেই রাত্রেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গে উর্মিলা দেবী মন্তব্য করেন, "আমাদের মনে হয়েছিল লড়াইয়ের মধ্যে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি ও একে কিছুটা গতি দেওয়া উচিত...। অবশিষ্ট মেয়েদের সামনে আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম, আমাদের গ্রেফতার প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াটিকে জন্ম দেয়।"[১৩] এই বক্তব্য থেকে বলা যায় এই পর্যায়ে এসে নারীর বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের নেপথ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনকে গতিশীল করবার সাথে সাথে নারীদের আন্দোলনে নিয়ে আসা এবং তাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন একটি মুখ্য প্রণোদণা হিসেবে কাজ করেছে। অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার নারীদের এই গ্রেফতার ও কারাবরণের ঘটনা সমগ্র ভারতবাসীর কাছেও একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলার নারীরা অসহযোগ আন্দোলনে তাদের জন্য নির্ধারিত এবং প্রত্যাশিত ভূমিকাকে অতিক্রম করলো এই গ্রেফতার হবার মাধ্যমে এবং পুরুষের বিকল্প বা সহযোগী হিসেবেই কেবল নয় বরং সমান ভূমিকায় নিজেদের নিয়ে আসতে সক্ষম তা প্রমাণিত হয় এবং নেতৃবৃন্দও তা মেনে নিলেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৯২১-এ ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীজী স্বয়ং লিখলেন,

> আমার আশা ছিল যে অন্ততঃপক্ষে প্রথম দিকে মহিলাদের কারাবরণ করার সম্মান থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে।... কিন্তু বাংলা সরকার স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য না করার নিরপেক্ষ উৎসাহে কলকাতার তিনটি মহিলাকে এই সম্মান দিয়েছে। সমস্ত দেশ এই নতুন প্রবর্তনাকে সাদরে গ্রহণ করবে বলে আমি আশা করি। পুরুষের মত ভারতীয় নারীরও স্বরাজ অর্জনে সমান অধিকার আছে। সম্ভবতঃ এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নারী পুরুষকে অনেক পেছনে ফেলে যাবে।...এখন যখন বাংলা সরকার মহিলাদের সংগ্রামের পুরোভাগে টেনে এনেছে আমি আশা করি যে ভারতের সর্বত্র নারীজাতি এই আহ্বানে সাড়া দেবে, আর নিজেদের সংগঠিত করবে। যাই হোক না কেন পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুরুষেরা চলে গেলে মহিলাদের আপন সম্মান রক্ষার জন্য তাদের শূণ্যস্থান গ্রহণ করতেই হতো, কিন্তু এখন পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি থেকে কারাজীবনের কষ্ট ভাগ করে নিতে হবে।...ভারতীয় নারীদের কাছে আমি এই প্রস্তাব করতে চাই যে তারা যেন নীরবে ও কালবিলম্ব না করে এখুনি সংগ্রামের পুরোভাগে আসতে ইচ্ছুক নারীদের নাম সংগ্রহ করেন। আর বাংলার রমণীদের কাছে যেন তারা তাদের আগ্রহের কথা জানান, যাতে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে অন্যত্র তাদের বোনেরা তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্রস্তুত।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাসন্তী দেবীদের গ্রেফতারের ঘটনার তিনদিন পরে ১০ ডিসেম্বর ১৯২১ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেফতার হন। তাঁর অবর্তমানে *বাংলার কথা* পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন বাসন্তী দেবী। স্বামীর অনুপস্থিতিতে ১৯২২-এর এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন বাসন্তী দেবী। এই সম্মেলনে মহিলা শ্রোতাদের উপস্থিতির সংখ্যা অতিক্রম করে পূর্বেকার সমস্ত রেকর্ড। পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে বলা হলো ''এ ঘটনার কারণ কি একজন মহিলার সভাপতিত্ব গ্রহণ না বাঙালী নারীর রাজনৈতিক জাগরণ?''[১৫] আরো দুটো বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করেছিলেন সমকালীন পত্রপত্রিকা –

এক : প্রথমবারের মত কংগ্রেস সম্মেলনে একজন বাঙালি নারীর সভাপতিত্ব।

দুই: পিতৃতান্ত্রিক অবদমনের চিরায়ত সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে আত্মশক্তি অনুধাবনের মনস্তাত্ত্বিক আবেগ।[১৬]

তবে বাসন্তী দেবী এই অধিবেশনে তাঁর বক্তব্যে বাংলার নারীদের জন্য বিশেষ কোন কর্মপন্থা নির্দেশ করেছিলেন কিনা সে বিষয়টি জানা যায় না, বরং তিনি গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব কিছুটা সংশোধন করে কাউন্সিলে প্রবেশকে অসহযোগের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে বলেন

> এই সমস্ত কার্যের সুবিধার জন্য চারিদিকে গ্রাম্য সমিতি স্থাপন করিয়া দেশটাকে ছাইয়া ফেলিতে হইবে। ইউনিয়ন কমিটি, লোক্যাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি এই সকল সমিতির সাহায্যে নিজেদের হাতে আনিতে হইবে এবং সেইগুলির সাহায্যে জাতীয় ভাব প্রচার করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে কাউন্সিল পর্যন্ত দখল করিতে হইবে। কাউন্সিলে আসিয়া অসহযোগ-আন্দোলন পরিচালনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। যতদিন না আমাদের প্রাপ্য অধিকার স্বীকার করা হয়, ততদিন ভালমন্দ সমস্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে বাধা দেওয়াই হয়ত আমাদের কাউন্সিলের কাজ হইবে। ভরসা করি জাতীয় মহাসমিতির আগামী অধিবেশনে এই বিষয় ভাল করিয়া বিবেচিত হইবে।[১৭]

এখানে নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপন্থা দেখা যায় না। তবে সার্বিকভাবে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের এই পর্বে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণ বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করে এবং ইংরেজ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জন্য এই নারী সত্যাগ্রহীদের মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে ওঠে, কেননা বাঙালি নারীর যে ভূমিকা এতকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল এবার তার বিপরীত দেখা গেলো। নারীর চিরপরিচিত রূপে এই পরিবর্তনকে প্রতিহত করবার উপায় হিসেবে প্রশাসন তাদেরকে বারবার তাদের সনাতন ঐতিহ্য অনুসারে বাঙালি নারীর কর্মকাণ্ড কী হওয়া উচিত তা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। ১৯২২-এ কলকাতা পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পি. সেন আশা করছিলেন ''to get them round and to create a feeling that these processions are not proper and should be abandoned altogether.''[১৮] তাঁর এই আশা ব্যর্থ হলে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী-এর মত উদারপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এবং ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন যাতে তাঁরা তাঁদের নারীসমাজকে গৃহে অবস্থান করতে বাধ্য করেন।[১৯] ১৯২২ সনেই কলকাতা পুলিশ কমিশনার এক প্রতিবেদনে লেখেন নারীকর্মীদের উপস্থিতি পুলিশের জন্য শৃংখলাজনিত সমস্যা তৈরি করছে এবং ''Any attempt made by them to assert authority has been

Dhaka University Institutional Repository

questioned." একই সাথে তিনি এই আশংকাও প্রকাশ করেন যে, পুলিশবাহিনী যেকোন সময় তাদের ধৈর্য হারাতে পারে, কারণ তা 'stretched to breaking point.'[২০] এভাবে বাঙলার রাজনীতিতে নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ পিতৃতান্ত্রিক প্রশাসনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে বৃটিশ প্রশাসনের দীর্ঘকালীন যে সংস্কার ছিল ভারতবাসীর ব্যক্তিগত জগতে হস্তক্ষেপ না করার, তা এবার দ্বন্দ্বের সম্মুখিন হয়। এভাবে নারীমুক্তি রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়েও এর মাধ্যমে বাংলার চিরন্তন অন্দরমহলে এক পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগল এবং বাঙালি নারী গৃহের বাইরে জন পরিমণ্ডলে প্রবেশাধিকার অর্জন করতে থাকল। প্রতিদিনকার গৃহকর্ম ও সন্তান লালন-পালনের বাইরে একটি জগৎ বিদ্যমান এবং সেইস্থানে পুরুষের পাশাপাশি নারী হিসেবে অংশগ্রহণ এবং দায়িত্ব পালন করার অধিকার তার আছে এই বোধ বাংলার নারীসমাজের একাশের মনে জাগ্রত হলো। অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী মোহিনী দেবীর বক্তব্যে বাঙালির অন্দরমহলে এই আন্দোলন কীভাবে এবং কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার চিত্র ফুটে ওঠে

> বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছেলে নারায়ণ বিদ্যারত্নের স্ত্রী সুতোকাটা শেখাতেন মেয়েদের। আমার বউ, মেয়ে, নাতনী যায় সুতো কাটতে। বলি – আটটার ভেতর ফিরবি, রাত করবিনে কিছুতেই, হাজার হলেও বয়সী মেয়ে সব। তবু ওরা দেরী করে। সুতো কাটতে কখনো এত দেরী হয়? তাই একদিন চললাম ওদের পিছু পিছু। দেখি ওরা ঘরে ঘরে খদ্দর ফিরি করে বেড়ায়। একদিন আমিও ওদের দলে ভিড়ে পড়লাম। .... কলকাতার সব ঘরে ঘরে আমরা খদ্দর ফিরি করেছি, একটি বাড়ীও বাদ দিইনি। সে কি যুগ তখন, হাজারে হাজারে মেয়ে বউ সব গা-ভর্তি গহনা খুলে দিয়েছে, অজস্র টাকাকড়ি দিয়েছে আমাদের, আমরা আঁচল ভরে এনে পৌঁছে দিয়েছি কংগ্রেস আপিসে। চরকার কথা বিলেতি কাপড় বর্জনের কথা মেয়ে বউদের কেমন করে বলতাম জানো? বলতাম–'তোমরা যেমন রান্না করে স্বামী পুত্তুরকে খাওয়াতে ভালবাস তেমনি নিশ্চয় তোমরা ভালবাসবে স্বামী-পুত্তুরকে নিজে হাতে সুতো কেটে সেই কাপড় পরাতে।'[২১]

এভাবে বাঙালি সাধারণ একজন নারী যে ভাষা বুঝতে সক্ষম সেই ভাষায় তাদের বোঝানো হতো। অনেক সময় নারীরা তাদের নিজেদের মতন করে আয়োজন করেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যার মধ্যেদিয়ে তাঁরা সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন আন্দোলনের সঙ্গে। বরিশাল অঞ্চলের মনোরমা বসু যিনি পরবর্তী জীবনে মাসিমা নামে পরিচিত হয়েছেন এবং বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তিনি ১৯২০-২১ সনে গান্ধীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে প্রথম পর্যায়ে যুক্ত করেছিলেন ভিন্ন উপায়ে। তাঁর স্মৃতিকথায় জানা যায়

> ... আমাদের গ্রামেও মিছিল এল– ''চরকা ধর, খদ্দর পর''– ধ্বনি দিতে দিতে মানুষ এগিয়ে চলল। সময়টা হল ১৯২১-২২ সাল। হঠাৎ মনে হল এতো আমরাও করতে পারি। মেয়েদের নিয়ে সমিতি করে চরকা চালাতে পারি। কিন্তু স্বদেশী করতে মেয়েরা আসবে কি? আচ্ছা, আমরা যদি মেয়েরা মিলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উৎসব করি? এই শুরু হল। পরপর তিনবার এই উৎসব করলাম। এই হলো আমাদের একত্রিত হবার জায়গা। এখানে আমরা আলোচনা করি আমাদের অধিকারের কথা, চরকা চালানোর কথা, আরও কত কিছু। ইতিমধ্যে সাহস করে একটা কাজ করে ফেললাম। আমি জমিদার বাড়ির বউ। কোথাও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যেতে হলে পাল্কীতে করে যেতে হতো। পাল্কীর বেহারা কাঁধে করে নিতে নিতে দর দর করে ঘামতো আর হাঁপাতো। খুব খারাপ লাগতো। একদিন বলে বসলাম,

Dhaka University Institutional Repository

"আমি আর পাল্কীতে চড়বো না, আমার খুব খারাপ লাগে।" আশ্চর্য সহায়তা পেলাম আমার স্বামীর কাছ থেকে। আমার দেখাদেখি গ্রামের অন্য বউরাও পাল্কী চড়া বন্ধ করল।[২২]

ধর্মীয় উৎসবের মধ্যদিয়ে মেয়েদের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করবার প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনেও দেখা যায়। এবারে ব্যতিক্রম হিসেবে মনোরমা বসুর স্মৃতিচারণায় যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই উৎসব মেয়েদের একত্রিত হবার একটি সুযোগ করে দেয়, এখানে তারা চরকা চালানোর কথা আলোচনার পাশাপাশি আলোচনা করেন নিজেদের অধিকারের কথা, যদিও অধিকার শব্দের অর্থ এখানে তিনি সুনির্দিষ্ট করেন নি। তবে তিনি নিজে পাল্কী চড়ে বাইরে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং স্বামীর সম্মতি অর্জন করেছেন এবং অন্য নারীদের অনুপ্রাণীত করেছেন। এই ঘটনার মধ্যদিয়ে অধিকার আদায়ের একটি নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং স্থায়ীভাবে বরিশাল শহরে বসবাস করতে শুরু করেন। কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মুখ্য করে একজন নারীর বাসস্থান পরিবর্তনের এটি প্রথম উদাহরণ। এপর্যায়ে তিনি কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে মহিলা সমিতি গঠন করেন যাদের দায়িত্ব ছিল চাঁদা তোলা, মুষ্টিভিক্ষা, মিছিল করা, ভলান্টিয়ারদের খাওয়ানো।[২৩] এছাড়া তাদের কর্মকাণ্ডের তালিকায় বিলেতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং এবং প্রতি মাসের শুরুতে মদ, গাঁজা, আফিম এর আবগারী অফিসে পিকেটিং এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশ শতকের শুরুতে স্বদেশী আন্দোলনে নারীর জন্য যে কর্মসূচি নির্ধারিত হয়েছিল তা ছিল ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাইরের জগতে নারীর প্রবেশাধিকারে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাতে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটিয়ে। এক দশকের ব্যবধানে বিশ-এর দশকে এসে নারী যুক্ত হলো পিকেটিং-এর মতো কর্মসূচিতে। বিশেষভাবে মাদকতা নিবারণের জন্য মদের দোকানে পিকেটিং-এর ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে গান্ধীজী উৎসাহিত করেন। কারণ হিসেবে দেখা যায়, পরিবারে পুরুষের মাদকাসক্তির ফলে ভূক্তভোগী হয় নারী। প্রথমতঃ পুরুষরা তাদের আয়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করে মাদকের জন্য, যার পরিণামে পরিবারগুলো দারিদ্র্যের শিকার হয়। দ্বিতীয়তঃ নেশাগ্রস্থ পুরুষ পরিবারে নারীর উপর শারীরিক নির্যাতন করে থাকে, অতএব নারী মাদকতার পরোক্ষ শিকার। কাজেই সমাজের নৈতিকতা পুনরুদ্ধারের জন্য নারীকে গান্ধীজী আহ্বান জানালেন মদের দোকানে পিকেটিং করবার জন্য। তিনি আরো যুক্তি দেখান, " বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়ী ও ক্রেতা, পানাসক্ত ও মদের কারবারীদের প্রতি মহিলাদের আবেদন তাদের হৃদয় বিগলিত না করে পারে না। আর যাই হোক না কেন, এই চার শ্রেণির প্রতি হিংসামূলক আচরণ করবে বা করবার ইচ্ছা থাকবে, নারীজাতির সম্বন্ধে এরকম সন্দেহ কোনক্রমেই করা যায় না। এরকম প্রতিরোধহীন ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সরকারও বেশীদিন উপেক্ষা করতে পারে না।"[২৪] এভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে নারী সামাজিক মানোন্নয়নের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় এবং তার চিরাচরিত নির্ধারিত গণ্ডির বাইরে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এইপর্যায়ে বৃটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত সাধারণ গৃহিনী নারীরা কতটা নারীমুক্তি অথবা নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিংবা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এই লক্ষ্য দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল সে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। এ বিষয়ে মোহিনী দেবী বলেন, ''আমরা তো মহিলা আন্দোলনের কথা বলি নি, মেয়েদের কাছে অবশ্য বলেছি কিন্তু সেটা খদ্দরের কথা, আমাদের চরকার কথা।''[২৫] কাজেই বলা যায় মুখ্যত দেশমুক্তির লক্ষেই বাঙালি নারী তাদের প্রথাগত ভূমিকার বাইরে বেরিয়ে আসলো এবং বিশ-এর দশকে অসহযোগ আন্দোলনের নানা ক্ষেত্রে বাঙালি মেয়েদের ভূমিকা কখনো কখনো সনাতন ঐতিহ্যের বিরোধী হলেও নারীমুক্তির আদর্শ ছিল অনুপস্থিত। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও আন্দোলনে নারীদের যুক্ত করেছিলেন আন্দোলনের প্রয়োজনে। নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন তাদের লক্ষ্য ছিল না। এর একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় ১৯২৩-এ[২৬], যখন গান্ধীজী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বরিশাল অধিবেশনে আসেন। এই সম্মেলনে যোগদান করতে এসে গান্ধীজী শুনতে পেলেন যে এই ছোট্ট শহরটিতে প্রায় তিনশত পতিতা নারী বাস করে। তিনি সেইসব নারীদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে সভায় নিয়ে আসেন এবং তাদের বসবার জন্য মঞ্চের কাছাকাছি স্থানে আলাদা ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, ''তোমরা পতিতা নও – নারী, মাতৃজাতি। তোমরা দেশের কাজে আত্মদান কর–আমি তোমাদের জীবিকার দায়িত্ব নেব।''[২৭] মণিকুন্তলা সেন-এর বর্ণনায় জানা যায়

> যখন তিনি ডাক দিলেন, 'তোমরা যারা আসবে–আমার কাছে এস'– তখন সত্যিই তাদের মধ্য থেকে পনের-কুড়ি জনের মতো উঠে এলো। সেদিন থেকে এই মেয়েরা কংগ্রেসকর্মী হয়ে গেলেন।... শহরে তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে অনেক চরকা ও খাদির কুটির শিল্পাশ্রম খুলে গেছে। ঐসব আশ্রমে এরা স্থান পেলেন।... এদের একজনের সঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল। নাম ছিল সরোজিনী। সবাই সরোজদি বলে ডাকত। সরোজদি স্থান পেলেন জগদীশচন্দ্রের আশ্রমে। পূজাঘরের কাজ করার ভার পেলেন। জগদীশচন্দ্র তাকে লেখাপড়া শেখাতেন। সরোজদির হাতের রান্নাও খেতেন। ঐ আশ্রমের অন্যান্য সেবিকা মেয়েদের সঙ্গে সরোজদিও থাকতেন। ঘটনাটি শহরে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল।[২৮]

সমাজের অস্পৃশ্য এবং পতিত এই নারীদের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সংযুক্ত করার মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা পরিবর্তনের এই প্রচেষ্টা বরিশাল অঞ্চল ছাড়া অন্য কোন এলাকায় দেখা যায় না। বরিশাল অঞ্চলে এই কর্মসূচির উল্লেখ মনিকুন্তলা সেন ব্যতীত আভা সিংহ রচিত *বিস্মৃত বীরাঙ্গণা ইন্দুমতি* গ্রন্থেও পাওয়া যায়। বরিশালে বিশ শতকের ত্রিশের দশকের স্বদেশী নেত্রী ইন্দুমতির আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে আভা সিংহ বলেন

> পতিতাদের মধ্যে স্বদেশী প্রচারের একটা কর্মসূচী নিয়েছিল শরৎ ঘোষের দল। নিন্দিত পাড়ায় তারা বেরতেন। স্বাধীনতার কথা, সুন্দর জীবনের কথা বলতেন। তাদের অনলস প্রচারের ফলে পতিতাদের মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এসেছিলেন নতুন করে জীবন গড়ে নিতে। দেহবিক্রির ঘৃণিত পেশা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন পাঁচ-ছয়জন মহিলা।

Dhaka University Institutional Repository

> তারা সুতা কাটা ও তাঁতবোনা ইত্যাদি শিখে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এঁদের স্বাবলম্বনের হাতেখড়ি হল খদ্দর বুনেই। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন সুশীলা। তিনি খদ্দরের বোঝা কাঁধে বাড়ি বাড়ি ফিরি করতেন। সুশীলাদির তেজস্বিনী মূর্তিখানি বড়মনু-ছোটমনুর মনে গভীর ছাপ রেখেছিল।[২৯]

রাজনীতির মাধ্যমে নারীমুক্তির এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা বৃহৎ আন্দোলনে রূপ নেয় নি, কিংবা বলা চলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন নি, এমনকি অসহযোগ আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীনেত্রীবৃন্দও এ বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। Geraldine Forbes, ***Women in Colonial India : Essays on Politics, Medicine, and Historiography*** গ্রন্থে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এভাবে

> Actually, Gandhai had no answer. Unable to present a viable alternative, he reiterated platitudes about the spinning wheel: 'The wheel is a kind of wall for the protection of women. I cannot think of any other thing which may serve as a support for such sisters in India.'But this was no solution for either the women engaged in prostitution or for activists who wanted the freedom to move without opprobrium. .... Gandhi wanted the ``right kind'' of women to lead the movement.As he had said in his earliest speeches, he wanted women from the higher classes to take the *swadeshi* vow because they could be models for other women. And the participation of women from ''respectable families'' was possible only if they could engage in protests without creating scandal.[৩০]

দেখা যাচ্ছে মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলন বাংলার নারীকে গৃহের চারদেয়ালের বাইরে একটি বৃহত্তর পরিসরে পা রাখবার সুযোগ করে দিলেও তখন পর্যন্ত তা ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চিরাচরিত রীতিনীতির গণ্ডিতে আবদ্ধ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আস্থা সুনিশ্চিত রাখবার তাগিতে এপর্যায়েও নারীর জন্য কোন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত যেমন গ্রহণ করা হয় নি, একইসাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাদের দেয়া হয় নি। নারী নেতৃবৃন্দও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিধিনিষেধ এবং পুরুষ নেতৃত্ব মেনে নিয়েই আন্দোলনে যোগ দেয়। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা হিসেবে এতে অভিজাত শ্রেণির নারীদের বা যে পরিবারে অভিভাবক শ্রেণি (বাবা, ভাই, স্বামী, পুত্র প্রমূখ) এই রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন সেই পরিবারের নারীদের মুখ্য ভূমিকাগ্রহণকে চিহ্নিত করা যায়।

(২)

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার এক বছর পর একটি সহিংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন বন্ধ করবার ঘোষণা দিলেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় পুলিশের

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচারে উত্তেজিত জনতা পুলিশ স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এই সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

এই পর্যায়ে পদ্ধতিগত দিক থেকে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। এর পরিবর্তে গান্ধীজী পুনরায় গঠনমূলক কর্মসূচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন-এর সময় থেকেই এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নারী সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৯২০-এর পূর্বে বাংলায় নারীর জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষে প্রতিষ্ঠিত নারী সংগঠনগুলো ছিল সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক চেতনা বহির্ভূত। বিশের দশকে প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত, এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই নারী সংগঠন সমূহের উদ্দেশ্য ছিল নারীদের মধ্যে :

১) রাজনৈতিক জ্ঞান প্রচার

২) চরকার প্রচলন

৩) বাড়ি বাড়ি ঘুরে খদ্দর বিক্রি

এই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত প্রথম সংগঠন ১৯২১ সালে গঠিত *নারী-কর্মমন্দির*, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস- এর বোন উর্মিলা দেবী। নির্ধারিত লক্ষের বাইরে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বহু নেতা এবং পুরুষকর্মী গ্রেফতার হলে নারী কর্মমন্দির বেআইনি ঘোষিত সভা এবং আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।[৩১] অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে গান্ধীজী গঠনমূলক কর্মসূচি দিলে ঢাকার আশালতা সেন ফরিদপুরে খদ্দরের কাজ শিখতে যান এবং ফিরে এসে ঢাকায় নিজ বাড়িতে 'শিল্পাশ্রম' নামে মেয়েদের তাঁত ও চরকার কাজে প্রশিক্ষিত করবার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[৩২] কমলা দাশগুপ্তের বর্ণনা অনুযায়ী, মহিলাদের নিজেদের হাতে তাঁত বোনার কাজ দেখতে পাওয়া তখনকার দিনে দুর্লভ ছিল এবং পাড়ার মহিলাগণ এই খদ্দর বোনার কাজ দেখতে ভিড় করে এসে দাঁড়াতেন।[৩৩] পরবর্তী সময়ে ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং কারাবরণ করা আশালতা সেন বিশের দশকে গান্ধীবাদী দর্শনে দিক্ষিত হন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠণমূলক কর্মসূচির কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, তবে সরাসরি নারীর সার্বিক মানোন্নয়ের জন্য সরাসরি কোন পদক্ষেপ তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে নেন নি। ১৯২২-এ জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান শেষে ফিরে এসে তিনি সুশীলা সেন, গিরিবালা দেবী, সরমা গুপ্তা ও সরযু গুপ্তার সহায়তায় গড়ে তোলেন 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি। এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন

> স্থানীয় মেয়েদের মধ্যে সক্রিয় দেশপ্রেম ও গান্ধীজীর বাণী এবং কর্মপন্থা প্রচার করা। সমিতির সভ্যরা খদ্দরের বস্তা নিয়ে দূর-দূরান্তর যেতেন আর খদ্দর বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর বাণী প্রচার করতেন। সমিতির পক্ষ থেকে প্রত্যেক

Dhaka University Institutional Repository

> বছর আমাদের বাড়ির মাঠে একটা শিল্পমেলার অনুষ্ঠান করা হতো। এই মেলায় একটা 'গান্ধীমণ্ডপ বানানো হতো। সেই মণ্ডপে গৌতম বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত ভারতীয় ধর্ম ও জন-নেতাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে মূর্তি এবং ছবির প্রদর্শনী করা হতো। দর্শকদের বোঝানো হতো বুদ্ধদেব এবং অন্য মহাপুরুষদের শিক্ষার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বাণীর কী সাদৃশ্য রয়েছে।[৩৪]

প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বিশ্লেষণে বলা চলে যে, এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতক আদর্শ প্রচার এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। প্রত্যক্ষভাবে নারীমুক্তির কোন কার্যক্রম এই প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করে নি। তবে যেহেতু মেয়েরা খদ্দরের বস্তা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যেতেন বিক্রির জন্য, এর মাধ্যমে একদিকে যেমন মেয়েরা গৃহের বাইরে যেতেন স্বাধীন ভাবে এবং নারীর নিজের উপর আস্থা অর্জনে এটি একটি কার্যকর পদক্ষেপ, অন্যদিকে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তারা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত হয় যা তাদেরকে স্বাবলম্বী হবার পথ তৈরি করে দেয়। কাজেই রাজনৈতিক উদ্দেশে গঠিত হলেও এ ধরনের নারী সংগঠনগুলো যেমন নারীদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তৈরি করেছে তেমন ভাবেই তাদের মধ্যে নারী হিসেবে আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করবার সচেতনতা তৈরি করেছে। রাজনৈতিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আশালতা সেন ১৯২৫ সালে 'নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের' সভ্য নির্বাচিত হন, ১৯২৭ সালে গড়ে তোলেন 'কল্যাণ কুটির' নামে একটি প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যৎ গান্ধীবাদী আন্দোলনের জন্য মহিলা কর্মী তৈরি করা।[৩৫]

নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে, বিশ শতকের বিশের দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং নারীমুক্তি এই দুই লক্ষের সমন্বয়ে গঠিত প্রথম নারী সংগঠন 'দীপালী সঙ্ঘ'- যার প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ (রায়)। লীলা নাগ(রায়)-এর প্রস্তুতিপর্বটি সম্পন্ন হয় কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী থাকা অবস্থাতে। এসময়ে তিনি তাঁর বাবার কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার ক্ষুদ্রশক্তি যদি একটি লোকেরও উপকার করতে পারতো তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম। সত্যি বলছি–এ আমার বক্তৃতা নয়, এটা আমার প্রাণের কথা, এই আমার ideal.'[৩৬] লীলা রায়ের জীবনীকার দীপংকর মোহান্ত বেথুন কলেজে লীলা নাগের কার্যাবলী প্রসঙ্গে বলেন

> সে সময়ে কলেজে নানারূপ কাজের মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় : ১. কলেজের বিভিন্ন কাজকে গতিশীল করার জন্য বেথুনে 'ছাত্রী ইউনিয়ন' নামক সামাজিকতার তিনি প্রবর্তক। ২. চরমপন্থী নেতা লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে ছাত্রীরা অধ্যক্ষার প্রতিবাদ সত্ত্বেও লীলা নাগের নেতৃত্বে ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। ৩. প্রথা অনুযায়ী কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সভায় বড়োলাট-পত্নী আমন্ত্রিত হয়ে এলে ছাত্রীরা নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানাত। লীলা নাগ অসম্মানজনক এই রেওয়াজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান বয়কটের সিদ্ধান্ত অধ্যক্ষাকে জানিয়ে দেন। বহু বাদানুবাদের পর এ-প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। ৪. ১৯২০ সালে অসহযোগের প্রভাব বেথুন কলেজেও লাগে। গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বানে বেথুনের কিছু ছাত্রী কলেজ ত্যাগের উদ্যোগ নেয়। জুনিয়র ছাত্রীদের

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্তে অধ্যক্ষা প্রতিবাদ করলে তারা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায়। লীলা নাগ ছাত্রীদের তাৎক্ষনিকভাবে নিবৃত্ত করে বুঝিয়ে দেন–'পড়াশুনা বা কলেজ ছেড়ে দিলে-ই স্বাধীনতা আসবে না।[৩৭]

বলা যায়, ভবিষ্যৎ নেত্রী লীলা রায় তৈরি হয়েছিলেন কলেজের এইসব ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায়। এই পর্বে বাঙালি নারীর একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার অধিকার অর্জন করা। এই অর্জনটি সম্ভব হয়েছিল লীলা নাগের একক প্রচেষ্টায়। তাঁর অনঢ়-অবিচল সংকল্পের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নতি স্বীকারে বাধ্য হয় এবং মেয়েরা সহশিক্ষার অধিকার লাভ করে। লীলা নাগ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীত্ব অর্জন করেন তখন বাংলার নারীরা আরেকটি অধিকার আদায়ের লক্ষে আন্দোলন করছে। সেটি ছিল মেয়েদের ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলন। এই আন্দোলনেও লীলা নাগের যোগসূত্র পাওয়া যায়। লীলা নাগের উদ্যোগে এবং ইডেন স্কুলের অধ্যক্ষা স্বর্ণলতা দাসের সভানেত্রীত্বে ঢাকায় মহিলাদের এক সভার আয়োজন করা হয়, পাশাপাশি অন্য একটি সভায় কেন্দ্রীয় পরিষদে মেয়েদের ভোটাধিকার সম্পর্কে বিরূপ আলোচনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লীলা নাগ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৩৮] লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংগঠন 'ঢাকা মহিলা কমিটি'। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গেও বন্যাত্রাণে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিকে সহায়তার লক্ষে তিনি এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ করেন।[৩৯] ১৯২৩ সালে মেয়েদের জন্য গড়ে তোলেন 'দীপালি সঙ্ঘ'। সংগঠনটির উদ্দেশ্য জানবার পূর্বে লীলা নাগের রাজনৈতিক আদর্শটি মনে রাখতে হবে। রাজনৈতিক আদর্শই তাঁর এই সংগঠনটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে লীলা নাগ বিপ্লবী অনিল রায়ের সংস্পর্শে আসেন। অনিল রায় ছিলেন বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘ-এর সদস্য। এই সময়ে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে অহিংস ও সহিংস দুটি ধারাই বর্তমান ছিল, যদিও সহিংস ধারাটি প্রকাশ্য ছিল না। লীলা নাগ রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে সহিংস পথটি বেছে নেন। যদিও ''অন্যান্য গোপন বিপ্লবী দলের মতো 'শ্রীসংঘ'তেও নারী অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে ছিল সবাই। কিন্তু শীর্ষস্থানীয় নেতা অনিল রায়ের মত ছিল, নারীদের পূর্ণ সংযুক্তি না ঘটলে গোটা বিপ্লব কতক পুরুষ দিয়ে সফল করা অসম্ভব।''[৪০] বহু বাকবিতণ্ডার পর লীলা নাগ দলের সদস্য হলেন। একমাত্র শ্রীসংঘ ছাড়া অন্য কোন বিপ্লবী দলে তখন মহিলা সদস্য নেয়া হয় নি।[৪১] এই সদস্যপদ প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী বলেন, ''শ্রী লীলা রায়ের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যাহার ফলে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা আসে।''[৪২] বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত লীলা নাগ যখন নারী সংগঠন গড়ে তোলেন তখন অন্যান্য নারী সংগঠনের চাইতে তা কিছুটা ব্যতিক্রমী হতে বাধ্য। শুধুমাত্র চরকাকাটা,খদ্দর বোনার মধ্যে এবং রাজনৈতিক আদর্শ বিস্তারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দীপালি সঙ্ঘ বাঙালি নারীর জীবনের সামগ্রিক মানোন্নয়ের লক্ষে কাজ করে, যে কারণে দেখা যায় সংঘের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক হলেও মহিলাদের বিকাশশীল জীবনের পক্ষে সহায়ক ও অগ্রযাত্রার কর্মীরূপে গড়ে তুলতে পরিকল্পিত কার্যাবলী নেয়া হয় যা ছিল [৪৩]:

Dhaka University Institutional Repository

১. কুটিরশিল্প শিক্ষা

২. স্বাস্থ্য শিক্ষা

৩. শিশু পালন ও পরিচর্যা

৪. বই/পত্রিকা দলগত পাঠ

৫. বয়স্ক শিক্ষা

৬. শিশু শিক্ষা

৭. আমোদ-প্রমোদ-চিত্তবিনোদন

৮. খেলাধূলা

৯. মহিলা পাঠাগার স্থাপন

১০. ব্যায়াম শিক্ষা

১১. সঙ্গীত শিক্ষা

১২. অভিনয় শিক্ষা

১৩. সমস্যামূলক রাজনৈতিক বিষয়ে ক্লাস

কর্মসূচির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হিসেবে দেখা যায় নারীদের জন্য যে বিনোদন প্রয়োজন এ ভাবনাটিও লীলা নাগ করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে সঙ্গীত, অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নারীর মানসিক বিকাশের জন্য পাঠাগার এবং দলগত বইপাঠের কর্মসূচি রাখা হয়এই সঙ্ঘে, পাশাপাশি নারীকে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত করবার প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। কুটিরশিল্প শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হবার দীক্ষা দিয়েছে দীপালি সঙ্ঘ। এর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে স্বয়ং লীলা রায় বলেন

> জগত জুড়িয়া আজ যে নূতনের বোধন আসিয়াছে নারী জাগরণ তাহার একটি বিশেষ সুর। নারী আজ তাহার হারান স্বরূপটি ফিরিয়া পাইবার জন্য ভাবিবার, মিলিত হইবার ও কার্য্য করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। অচলায়তনের পাষাণ কারা ভেদ করিয়া মুক্তির আলোক শত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বাঙ্গালার নারীকেও আজ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বপ্রাণের এই মুক্তির আহ্বানকে সার্থক করিয়া তুলিতে বঙ্গনারীও উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। অজ্ঞানতার পাষাণভার হইতে মাতৃহৃদয়কে মুক্ত করিতে শতবর্ষের জড়তা ঝারিয়া বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে নিজের স্থান করিয়া লইতে, রূদ্ধ কারার নিরানন্দতা ছাড়িয়া মুক্তির আশ্বাস পাইতে নারী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। নারী-প্রাণের জাগরণের এই ইচ্ছাকে সফল করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ''দীপালি'' সংগঠিত হইয়াছে। ঢাকায় ইহাই একমাত্র মহিলা সমিতি।
>
> উদ্দেশ্য ঃ– জ্ঞান, কর্ম্ম ও আনন্দহীন নারী সমাজকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সজীব, সতেজ ও আনন্দময় জীবন গঠন করিতে সহায়তা করাই দীপালির উদ্দেশ্য। দুই বৎসর পূর্বে ১২জন বন্ধু মিলিত হইয়া এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রতর সূচনা করা হইয়াছিল। সহানুভূতি দাবীর স্পর্ধা বা সাহায্য ভিক্ষার সাহস এই দুইয়েরই তখন অভাব ছিল। আশা-নিরাশার এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দীপালি দুই বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার সভ্যা সংখ্যা একশতের

Dhaka University Institutional Repository

> উর্দ্ধে। এই সফলতায় গর্ব্বিত হইবার কিছু নাই– আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ঢাকার সর্ব্বসাধারণ মহিলাদের মধ্যে ক্রমশই অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া দীপালি তাহার অস্তিত্বেও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিয়াছে।[৪৪]

বক্তব্যে স্পটত প্রতিয়মান যে 'নূতন বোধন' অর্থে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন বুঝিয়েছেন, এবং একই সঙ্গে নারী জাগরণ যে এই আন্দোলনের একটি অংশ সেটি তিনি উপলব্ধি করেছেন। নারী সংগঠনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং নারীমুক্তির সমন্বয় সাধনের এই ভাবনাটি প্রথম সামনে নিয়ে আসলেন লীলা নাগ। কংগ্রেসভিত্তিক অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের নেতাদের কর্মসূচিতে এই ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। লীলা নাগের নারী বিষয়ক চিন্তাধারার পরিচয় তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দীপালি সঙ্ঘের একটি প্রধান কর্মসূচি ছিল ঢাকায় নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের লক্ষে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠাসমূহের মধ্যে 'নারীশিক্ষা মন্দির' টি অধিক পরিচিত। লীলা নাগ এই 'নারীশিক্ষা মন্দির' প্রসঙ্গে বলেন

> . . . অধিকাংশের এই মত যে – যে শিক্ষা বালিকাগণকে ভবিষ্যতে আদর্শ মাতারূপে গড়িয়া তুলিবে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু এরূপ উক্তির কোনো যুক্তি বা মূল্য নাই। যদি মানুষের অন্তরস্থিত সকল শক্তির বিকাশ দ্বারা তাহাকে পূর্ণ মনুষ্যত্বেও অধিকারী করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে বিশেষ করিয়া মেয়েকে মাতা, কন্যা, জায়া বা ভগিনীর কর্তব্য ভিন্নভাবে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন থাকে না। কী নারী কী পুরুষ – মনুষ্যত্ব যাহার মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে– সে সকল অবস্থায় জীবনের সকল স্তরেই গৌরবের সহিত বিরাজ করিবে।. . . শিক্ষার মধ্য হইতে যদি জাতীয়তাবাদকে বাদ দিতে হয়, যদি দেশের সকল আশা-আকাঙ্খাকে বিযুক্ত করিয়া শিক্ষাদান কার্য সমাধা করিতে হয় তবে যাহারা শিক্ষালাভ করিবে তাহারা আর যাহাই হউক– দেশের পুত্রকন্যারূপে জাতির আশা-আকাঙ্খাকে মূর্ত করিবে কী করিয়া? 'নারীশিক্ষা মন্দির' এ অভাব দূর করিতে সচেতন থাকিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে শিক্ষা মন্দিরে একটি Students Union বা ছাত্রী সঙ্ঘ আছে। ইহার উদ্দেশ্য ছাত্রীদিগকে সকল চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করাইয়া ভবিষ্যৎ কর্মীরূপে গড়িয়া তোলা।[৪৫]

লীলা নাগ নারীকে তার শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মানুষে পরিণত করবার ব্রত নিয়েছিলেন। একই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায় ১৯২৬-এ ঢাকা যুব সম্মেলনে। নারীর জন্য সমানাধিকার প্রশ্ন উত্থাপন করে লীলা নাগ এই সম্মেলনে বলেন

> আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও স্যোশিওলজিও প্রমাণ করেছে যে মস্তিস্কের (Intellect) ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীতে পার্থক্য নেই; অনুভূতির (Emotion) ক্ষেত্রে যদিও পার্থক্য কিছুটা রয়েছে তার জন্য তাদের কর্মক্ষেত্রের একটি কৃত্রিম ভাগাভাগির কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং দুজনের মানসিক গঠনে যে সাদৃশ্য রয়েছে তারই জন্য তাদের কর্মক্ষেত্র একই প্রকার হওয়া প্রয়োজন–আত্মবিকাশের দিক দিয়ে পুরুষের পক্ষে যা প্রয়োজন নারীর পক্ষেও অন্যরূপ নয়।...সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর পটভূমির উপরই গৃহের অবস্থান, কাজেই গৃহকে নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপযুক্ত করে গঠন করবার জন্যও সমাজ ও রাষ্ট্রে তার প্রভাবের প্রয়োজন রয়েছে। অতএব গৃহের মধ্যেই কর্মকে

Dhaka University Institutional Repository

> সীমাবদ্ধ রাখা নারীর পক্ষে এবং কাজে কাজেই জাতির পক্ষেও কল্যাণের নয়। যেহেতু নারী ও পুরুষের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বিকাশের উপরই জাতির মঙ্গল নির্ভর করছে।[৪৬]

শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র দুই ক্ষেত্রেই লীলা নাগ তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদ প্রকাশ করেছেন নারীর জন্য সমান অবস্থান দাবির মধ্যদিয়ে। এই পর্যায়ে নারীর জন্য সমান অধিকারের বলিষ্ঠ দাবি লীলা নাগ প্রথম ব্যক্ত করেন। লীলা নাগ-এর কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২৬-এ ঢাকা শহরে ঐতিহাসিক রবীন্দ্র-সংবর্ধনায় এসে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের প্রাঙ্গণে এক বিশাল মহিলা সমাবেশ দেখে কবি মন্তব্য করেন যে তিনি এশিয়ায় এতো বড় মহিলাসমাবেশ আর কখনও দেখেন নাই। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন

> কালে কালে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কর্মক্ষেত্র নব নব পরিণতি সাধন করতেই হয়। তখন পুরাতন অভ্যাসের জায়গায় নতুন উৎসাহের দরকার হয়। নতুন যুগের আহ্বান উপস্থিত হলে তবু যারা অপরিচিতের পথের দুর্গমতা এড়িয়ে পুরাতন কালের কোটরে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চায়, মৃত্যুর চেয়েও তাদের বড় শাস্তি তাদের শাস্তি জীবন মৃত্যু।...স্বভাবতই মেয়েদের উপর ছিল আতিথ্যের ভার। পূজার ফুলের সাজি সেদিন তারাই সাজিয়েছেন, গৃহকে তারা সুন্দর করেছলে, পূর্ণ করেছিল। কিন্তু সে সুরক্ষিত সীমার মধ্যে এটি সম্ভব হয়েছিল, সেই সীমা আজ ভেঙ্গে গেছে। আজ যুগসঙ্কটের দিকে ঘরের চেয়ে বাইরের দিকের ডাক বড় হয়ে উঠেছে। সে ডাকে সাড়া দিতে না পারলেই অসম্মান, আজ আমাদের আশ্রয় একান্তভাবে গৃহের মধ্যে আর নয়...।[৪৭]

বিশ শতকের প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের আন্দোলন সফল করবার লক্ষে বাংলার নারীদের সুরক্ষিত সীমার মধ্যে রেখে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছিলেন। বিপরীতে এক দশকের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে সেই সীমা ভেঙ্গে গেছে এবং নারীদের জন্য বাইরের ডাকে সাড়া দেওয়াটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলব্ধি সম্ভব হয় তখন, যখন নারী তার নিজ কার্যাবলীর মধ্যদিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করে তার অবস্থানটি সুনির্দিষ্ট করতে পারে। রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠা একটি বৃহৎ অর্জন বলে পরিগণিত হবার দাবি রাখে, যার ধারাবাহিকতায় সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়।

(৩)

বাঙালি নারীর রাজনৈতিকায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোটাধিকার অর্জনকে সামগ্রিকভাবে বাঙালি নারীসমাজের জন্য বৃহৎ অর্জন বলে গণ্য করা হয়। তবে ভোটাধিকার আদায়ের সংগ্রামে যে সকল নারীনেত্রী সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তাঁদের সংগঠন 'বঙ্গীয় নারীসমাজ'-যার মাধ্যমে তাঁরা এই আন্দোলনটি গড়ে তোলেন তার প্রকৃতি বিশ্লেষণে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই আন্দোলনটি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সীমিত প্রয়োজনের তাগিদে ছিল, বৃহত্তর নারীসমাজের স্বার্থ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। এক্ষেত্রে নারী গবেষক ভারতী রায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে

Dhaka University Institutional Repository

> ভোটাধিকার দাবী, অভিজাত শ্রেণীর মহিলাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা-কাঠামোয় স্থানলাভের অতিরিক্ত কিছু ছিল না এবং এভাবেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেই গোষ্ঠীর একাধিপত্যকে শক্তিমান করে তোলা যেত। বীনা মজুমদারের স্বীকৃতি অনুযায়ী, এ দাবীর স্বপক্ষে তারাই মুখর হয়েছিল যাদের কাছে সেই সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোটি 'নারীদের নারী হিসেবে অংশগ্রহণে' বিরত রেখেছে। সেই সময়কালের নিয়ন্ত্রক শ্রেণী থেকেই তারা আগত যে শ্রেণী তাদের অপকৃষ্ট বিশেষণে ভূষিত করেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বকরণ থেকে বঞ্চিত রেখেছে।[৪৮]

বৃহত্তর নারীসমাজের স্বার্থ সম্পৃক্ত না থাকলেও ভোটাধিকারের দাবির মধ্যদিয়ে বাঙালি নারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ রাখে। ১৯২১ সালের ১৩ আগস্ট কলকাতার কলেজ স্কয়ারে স্টুডেন্ট হলে এক সভায় কামিনী রায়, মৃণালিনী সেন ও কুমুদিনী মিত্র-এর নেতৃত্বে 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' নামে সংগঠনটির সৃষ্টি হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভোটাধিকার আদায়।[৪৯] এই সংগঠনটির নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে যে যুক্তি দেখানো হয় তা ছিল এই যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিশু কল্যাণের মতো বিষয়গুলোতে শিক্ষিত মেয়েদের মতামত জানাবার ও আইনি সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করবার অধিকার থাকা প্রয়োজন।[৫০] ব্রাহ্ম নেতা আনন্দমোহন বসুর পুত্র সুধাংশুমোহন বসু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মেয়েদের ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলেন যে মেয়েরা রাজনীতিতে যোগ দিলে সমাজ সংস্কারমূলক কাজের অনেক সুবিধা হবে।[৫১] নারীর ভোটাধিকারলাভের পক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হয় তাতে নারীকল্যাণ বা মুক্তির কোন বক্তব্য দেওয়া দেওয়া হয় নি বা নারীর জন্য বৈপ্লবিক কোন ধারণা সেখানে প্রতিফলিত হয় নি, পক্ষান্তরে দেখা যায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারীর ভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়। নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে কুমুদিনি বোস বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন,যা পরবর্তীতে লিফলেট আকারে প্রচার করা হয়। বারবারা সাউথার্ড এই সকল লেখা বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেন

> An Analysis of Mrs. Bose's writings show that she shared the social feminist outlook that was typical of the women's movement in India in this period. She sought to broaden Indian concepts of women's role rather than to mount a direct challenge to tradition. She accepted the traditional concept that the role of women in society differs from that of men, because women are mothers and responsible for the home. But she did not accept the corollary that women were, therefore, less suited to public life.[52]

বিপরীতে দেখা যায়, নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে বাংলার মুসলিম নেতা এ. কে ফজলুল হক যে যুক্তি উপস্থাপন করেন তা অধিক বলিষ্ঠ ও নারীমুক্তির চেতনাযুক্ত। তিনি যুক্তি দেখান

> নারীরা ভোটের অধিকার চায়, কেননা আপনারা যেমন মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য লালায়িত, তেমনি এটা স্রষ্টার ইচ্ছা যে, যাঁদের আমরা শৃংখলে ও দাসত্বে বেঁধে রাখি তাঁরা ঐ শৃংখল থেকে মুক্তি চায়। নারীরা ভোট চায়, কেননা যে স্বাধীনতা আপনাদের কাছে প্রিয়, সেটা তাঁদের কাছেও প্রিয়। নারীরা ভোট চায়, কেননা আপনারা যদি হন ঈশ্বরের

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি এবং কামনা করেন স্বাধীনতা, তেমনি নারীরাও ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তাঁদেরও একই রকম অধিকার রয়েছে স্বাধীনতা ও মুক্তি চাইবার।[৫৩]

এ. কে ফজলুল হক তার বক্তব্যে একদিকে বাঙালি নারীর পরাধীন অবস্থার কথা যেমন মেনে নিয়েছেন একই সঙ্গে তাদের মুক্তির যৌক্তিকতাও তুলে ধরেছেন। তবে এখানে তিনি নারী বলতে বাঙালি নারীসমাজের সমগ্র অংশকে বোঝান নি, বরং ভোটাধিকারের দাবির পক্ষের অভিজাত শ্রেণিকেই বুঝিয়েছেন।

নারীর ভোটাধিকারের দাবি ১৯২১ সনে বঙ্গীয় আইনসভায় প্রথম উপস্থাপন করা হয়। বঙ্গীয় নারীসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ এবং পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করতে থাকে, পাশাপাশি তারা মুক্তচিন্তা ও উদারনৈতিক ভাবধারার পুরুষ বুদ্ধিজীবিদের সমর্থন আদায়েও সচেষ্ট হয়।[৫৪] সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯২১ সনে বঙ্গীয় আইনসভায় নারীর ভোটাধিকারের প্রস্তাবটি নাকচ করে দেওয়া হয়। ৫৬ জন এই দাবির বিপক্ষে অবস্থান নেন এবং ৩৭ জন পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় নারীসমাজ তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং ১৯২৩ সনে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে সীমিত ভোটাধিকার লাভ করেন। অবশেষে ১৯২৫ সনে বঙ্গীয় আইনসভায় নারীর ভোটাধিকার আইন পাশ হয়। ১৯২৬ সালে প্রথম বাঙালি নারীসমাজের একাংশ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এই অধিকার অর্জনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে নারী-গবেষক ভারতী রায় অভিমত পোষণ করেন যে, এই অধিকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রচলিত সার্বজনিক পুরুষ-প্রাধান্যের জগতে তাদের প্রবেশলাভের প্রতীকরূপে পরিগণিত হয়।[৫৫] কাজেই বলা যায় বৃহত্তর নারীসমাজের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে ফলদায়ক না হয়েও ভোটাধিকার অর্জন যেমন বাঙালি নারীর রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতিস্বরূপ তেমনিভাবে নারীমুক্তি আন্দোলন এর মাধ্যমে নূতন মাত্রা অর্জন করে।

(৪)

অসহযোগ আন্দোলন রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যর্থ হয় এবং শাসকশ্রেণির শ্রেণিচরিত্রের পরিবর্তন এই আন্দোলন দ্বারা সম্ভব হয় নি। এই পরিস্থিতিতে ১৯২৭ সালে 'ভারত শাসন আইন' সংস্কার কাজের জন্য স্যার জন সাইমন-এর নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই সাইমন কমিশন পুণরায় বাংলাসহ সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত করে তোলে। এই কমিশনের সকল সদস্য ছিল বৃটিশ, কোন ভারতীয় সদস্য এই কমিশনে স্থান না পাওয়ায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন জাগে এবং ভারতজুড়ে এই কমিশনবিরোধী বিক্ষোভ-হরতাল- প্রতিবাদ সভা শুরু হয়। কলকাতায় যে সভা হয় যোগেশচন্দ্র বাগল-এর সূত্রমতে, ''তাহাতে সহস্রাধিক বঙ্গনারী উপস্থিত থাকিয়া উপস্থিত স্বদেশসেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। কবি মদনমোহন ঘোষের কন্যা এবং শ্রী অরবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী লতিকা ঘোষের চেষ্টা যত্নে এত অধিকসংখ্যক মহিলা এই সভায় সমবেত হইতে পারিয়াছিলেন।''[৫৬] ১৯২৭-এ সুভাষচন্দ্র বসু বার্মার মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্বাস বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র দেশে মুক্তি আনার পক্ষে ছিল, এ কারণে তিনি দেশের যুব শক্তিকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করবার কাজে নিয়োজিত হলেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

অনুপ্রেরণায় লতিকা ঘোষ গঠন করলেন 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ'। এর সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী বসু এবং সহ-সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্রের বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসুর সহধর্মিনী বিভাবতী বসু।[৫৭] মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতে মহিলাকর্মী বা স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিল। লতিকা ঘোষ-এর রাজনীতিতে যোগদানের সঙ্গে যে বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা হচ্ছে বাংলার ছাত্রীসমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ।

সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন শুরু হলে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। সাইমন কমিশন কলকাতায় পৌছালে যে সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেয়া হয় তাতে বেথুন কলেজের ছাত্রীরা ধর্মঘটকে দারুণভাবে সফল করে এবং এই প্রথম গভর্ণমেন্ট কলেজের ছাত্রীরা রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট করে।[৫৮] বীনা দাসের স্মৃতিকথায় জানা যায়

> বন্ধুরা সকলে মিলে বেথুন স্কুল-কলেজে হরতাল করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। সব ক্লাসে গিয়ে মেয়েদের বলছি, বোর্ডে লিখে রেখে আসছি। হরতাল খুব ভালোভাবেই হল, গভর্নমেন্ট স্কুল-কলেজে এ ব্যাপার এই প্রথম। ডে-স্কলার ছাত্রীদের প্রিন্সিপাল কিছু বললেন না, কিন্তু বের্ডিঙের মেয়েদের বললেন, ''অ্যাপোলজি চাইতে হবে, না হলে বোর্ডিঙ ছেড়ে চলে যাও।. . . আমাদের খবর পাঠাল। কলেজ বন্ধ হয়ে রইল। কী করা যায় ভেবে পাই না, সারাক্ষণ পরামর্শ আর গবেষণা চলছে।. . . শেষ অবধি অবশ্যি কলেজ ছাড়তে হল না। প্রিন্সিপালকেই হার স্বীকার করতে হল। মেয়েরা কেউ ক্ষমা চাইল না, কলেজও উঠল না। কিন্তু প্রিন্সিপাল নিজ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন।[৫৯]

বাঙালি ছাত্রীসমাজের কাছে বৃটিশ প্রশাসনের পরাজয়ের এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্রীসমাজের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে এবং নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকার ইঙ্গিত এই ঘটনার মধ্যে নিহিত। এই প্রেক্ষাপটে ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র বোস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শাখা হিসেবে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠিত হয়, বিভিন্ন কলেজের ২০০ ছাত্রী সেখানে যোগ দেয়।[৬০] এই বাহিনী প্রধান হন লতিকা ঘোষ। তাঁর পদের নাম দেওয়া হয় কর্ণেল।[৬১] বীনা দাস ছিলেন এই বাহিনীর সদস্য। তাঁর স্মৃতিচারণায় জানা যায়

> ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস। আমরা সবাই দলে দলে স্বেচ্ছাসেবিকা দলে নাম লেখালাম। সুভাষবাবু আমাদের জি. ও. সি; লতিকা দি মেয়েদের বিভাগের ভার নিলেন। আমার দিদিদের দলের মেয়েরা নানারকম অফিসার হলেন। ভোরবেলা বাস এসে আমাদের নিয়ে যেত। বাড়ি ফিরতাম কোনদিন রাত বারোটা, কোনদিন একটা। আমাদের ট্রেনিং বেশির ভাগ ছেলেরাই দিতেন।. . . ১৯২৮ সালের সেই দলকে শৃংখলায়, গাম্ভীর্যে, উৎসাহে আর কেউ যেন অতিক্রম করতে পারল না।. . . প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের চোখে মুখে কী অদ্ভুত দীপ্তি আর দৃঢ়তা। আসল যুদ্ধও লোকে এত নিষ্ঠার সঙ্গে করে কিনা সন্দেহ।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

যোগেশচন্দ্র বাগলের বর্ণনা অনুসারে এই বাহিনী হাওড়া থেকে পার্ক সার্কাসে কংগ্রেস-মণ্ডপ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবিকারা সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরুর শোভাযাত্রার সঙ্গে ধৈর্য ও শৃংখলার সঙ্গে অনুগমন করেন, অধিবেশনে তাঁরা বিশেষ করে মহিলা প্রতিনিধি ও দর্শকদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন।[৬৩] পাশাপাশি এই অধিবেশনে প্রথমবারের মত মহিলাদের দ্বারা প্রস্তুত এবং মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত খাবার বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়, এখান থেকে যে অর্থ আয় হয় তা কংগ্রেস ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হয়।[৬৪] এপর্যায়ে ছাত্রীরা রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হবার পাশাপাশি তাদের নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে ভারতী রায় বলেন

> তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে ১৯২০-র দশকে ছাত্রীদের দ্বারা নিজস্ব সংগঠন গড়তে শুরু করা। পূর্ববঙ্গে ছাত্রী আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত ধাপ নিলেন ঢাকার দিপালী সংঘ। এই সংঘের ছাত্রী শাখাটি তৎপরতার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে মন দিলেন এবং ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসন সহ মেয়েদের নানান সামাজিক অধিকার নিয়ে বিতর্ক সভা ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করলেন। এরই পাশাপাশি চলল মেয়েদের ছোরা ও লাঠিখেলা শেখানো ও অন্যান্য আত্মরক্ষা ব্যবস্থাতে পটু করা।[৬৫]

১৯২৮ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে ছাত্রী সংগঠন 'ছাত্রীসংঘ' এর সভানেত্রী ছিলেন সুরমা মিত্র, সম্পাদিকা কল্যাণি দাস। সদস্য হিসেবে ছিলেন বীনা দাস ও কমলা দাসগুপ্ত। এই সংঘ ছাত্রীদের সাঁতার কাটতে শেখাতো, লাঠি চালানো সহ আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতো। পাশাপাশি ছাত্রীদের বিপ্লবী ভাবধারায়ও উদ্বুদ্ধ করত। এদের শিক্ষক ছিলেন বিপ্লবী নেতা দীনেশ মজুমদার।[৬৬]

কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবিকা দলের কার্যক্রম এবং ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে লাঠিখেলা শেখানোর মত কার্যক্রম থেকে বলা যায় যে, এ সময়ে সমাজে নারীর প্রতি প্রচলিত ধারণায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসতে শুরু করে যা পরবর্তী দশকের সক্রিয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ভিন্নতর মাত্রা যোগ করে। বাঙালি মেয়েদের প্রতি প্রচলিত ধারণায় পরিবর্তন প্রসঙ্গে ভারতী রায় বলেন

> এক মর্মস্পর্শী রচনায় উর্মিলা দেবী বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে মোটা খদ্দরের শাড়ি পরে বাঙালি মেয়েরা স্বদেশী প্রচারে বের হতেন এবং কিভাবে রেল স্টেশনের কুলিমজুরেরা তাদের প্রতিটি প্রয়োজনে দেখাশুনো করত। একবার ট্রেনযাত্রী এক ভদ্রলোক মন্তব্য করেন ঃ "সন্দেহ নেই যে দেশ জেগে উঠেছে। অবিবাহিত বাঙালি মেয়েরা, বাড়ীর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে, পুরানো সংস্কার ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে–তা দেখে সবাই উৎসাহবোধ করতেন।" ক্রমেই বেশী বেশী সংখ্যায় ছাত্রীরা বেরিয়ে পথসভা করতে শুরু করলো, একা একা ট্রামে বাসে ট্রেনে চলাফেরা করতে থাকল, দলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করল, প্রচার করল, ধর্মঘট সংগঠিত করল। এইভাবে মেয়েরা ভাঙ্গলেন নারীসুলভ প্রচলিত জীবনযাত্রার রীতিনীতিগুলো।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই বলা যায় বিশ দশকের শেষ পর্যায়ে এসে রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও এর মধ্যদিয়েই বাঙালি মেয়েরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থানটি চিহ্নিত করতে না পারলেও তাতে কিছুটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

(৫)

বিশ শতকে একদিকে গান্ধীজীর ডাকে যেমন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তেমনি মুসলমান সমাজে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলন। খেলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতে মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশবিরোধী চেতনা বিস্তারলাভ করে। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশকে সম্পৃক্ত করতে পারে নি। খেলাফত আন্দোলন শুরু হলে হিন্দু ও মুসলমানদের বৃটিশবিরোধী চেতাকে সম্মিলিত রূপ দিতে সচেষ্ট হন গান্ধীজী। তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন

> I discover the weapon of non-cooperation in the form we know while thinking about the khilafat. I feel very much about this issue because I am a staunch Hindu. If I wish to see my religion protected against seven crores of Muslims, I must be ready even to die for the protection of their religion.[৬৮]

একই সঙ্গে গান্ধীজী মুসলিম মহিলাদের এই আন্দোলনে যুক্ত করার জন্য পাবনা জেলায় অনুষ্ঠিত এক সভায় বৃটিশ শাসনকে শয়তানের শাসনের সঙ্গে তুলনা করে ইসলামকে শয়তানের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য মুসলিম মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানান।[৬৯] কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি ১৯২১ সালে একটি মহিলা শাখা গঠন করে। এই শাখাটি বৃটিশ-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে খিলাফত-এর পক্ষে সভা আয়োজন করে। খিলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা শওকত আলী ও মওলানা মোহাম্মদ আলী ভাতৃদ্বয়ের মা বি আম্মা এই সময় ভারতীয় মুসলিম নারীদের নেতৃত্ব দেন।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলার মুসলিম নারীদের ভূমিকা দেখা যায় কিছুটা সীমিত আকারে। মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন পর্যায়ে রাজনৈতিক কার্যবলীতে ছিলেন অনুপস্থিত, তিনি সে সময়টিতে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তখন পর্যন্ত শিক্ষার আলো বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিম নারীর সার্বিক অবস্থানের মানোন্নয়নকে প্রধান দায়িত্ব হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বিশ-এর দশকে দেখা যায় একদিকে তাঁর লেখনীতে যেমন নারীমুক্তির সাথে স্বদেশ মুক্তির ভাবনা উঠে এসেছে, অপরদিকে নারীর ভোটাধিকারের দাবীতে যে আন্দোলন হয় তাতেও তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছেন। তবে মুসলিম নারীর রাজনৈতিকায়নে এপর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত নারী সংগঠন 'আঞ্জুমানে-খাওয়াতিনে-ইসলাম'। বেগম রোকেয়া ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম মুসলিম মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থা 'আঞ্জুমানে-খাওয়াতিনে-ইসলাম' (কলকাতা মোহামেডান লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন), যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে *দি মুসলমান* পত্রিকায় বলা হয়

> Its objects are to promote unity, social intercourse and friendly feeling among Mohammedan ladies resident in Calcutta, by providing them with a common meeting ground, to better the condition of Moslem women in general by eradicating pernicious social customs and by diffusing proper and useful knowledge, and to establish and conduct an industrial school for poor and needy Mohamedan women with a view to qualify them to earn their own livehood.[৭০]

উদ্দেশ্য থেকে বলা যায় বেগম রোকেয়া এই পর্যায়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলিম নারীর উন্নয়ন সাধনের জন্য তাদের নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন, পাশাপাশি তিনি শুধু শিক্ষা নয় একই সাথে নারীর স্বাবলম্বী হবার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, বিশেষ করে অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে দরিদ্র মুসলিম নারীর কল্যাণসাধন তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। মুসলিম নারীদের স্বাবলম্বী হবার ভাবনা প্রথম তিনি সামনে নিয়ে আসলেন। এই লক্ষ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বস্তিসমূহে কেন্দ্র স্থাপন করে মেয়েদের সেলাই, শিশুপালন, স্বাস্থ্যবিধি, ধর্মীয় শিক্ষাপ্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।[৭১] ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যোগদান করতে বি আম্মা এবং এ্যানি বেসান্ত কলকাতায় আসেন। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করা হয়, এই বাহিনীতে বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে-খাওয়াতিনে-ইসলাম' সংগঠনের সদস্যরা যোগ দিয়েছিল, বেগম রোকেয়া এ্যানি বেসান্তের ভাষণ বাংলায় অনুবাদ করেন।[৭২] এই সংগঠনটির সাংগঠনিক দক্ষতা প্রসঙ্গে জানা যায় *'দি মুসলমান'*পত্রিকায় ৩১ জানুয়ারি ছাঁপা হওয়া একটি বিজ্ঞাপণের মধ্যদিয়ে। এটি ছিল ১৯১৯ সালের ১০,১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় যে নিখিল ভারত মুসলিম নারী সম্মেলন আহুত হয়, তার প্রস্তুতি কমিটির সাধারণ সম্পাদক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপণ। সূত্র অনুসারে সম্মেলনের দপ্তর ছিল রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় তথা তার বাসভবন ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোড। বিজ্ঞাপণটিতে উল্লেখিত হয় যে, মফঃস্বল থেকে আগত মহিলাদের জন্য সেখানেই বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, পাশাপাশি এও বলা হয় যে, ২৪ ঘন্টা আগে আগমণ সম্পর্কে অবহিত করলে রেল স্টেশনে প্রতিনিধিদের সম্ভাষণ জানাবার ব্যবস্থা করা হবে। রোকেয়ার নেতৃত্বে একটি দক্ষ নারী সংগঠন যে গড়ে উঠছিল প্রস্তুতির বিবরণ থেকে তা বোঝা যায় বলে লেখক-প্রাবন্ধিক মফিদুল হক মন্তব্য করেছেন।[৭৩]

শেষ পর্যন্ত সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় নি, পরিবর্তে ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আঞ্জুমানে-খাওয়াতিনে-ইসলাম-এর এক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রায় ছয়শত মহিলা উপস্থিত ছিল।[৭৪] গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন এবং মুসলিম সমাজে খিলাফত আন্দোলন শুরু হলে আঞ্জুমানে-খাওয়াতিনে-ইসলাম-এর সদস্যরা

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশী চেতনা প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। সমিতির মহিলারা চরকা কাটা, সূতা তৈরি করা, খদ্দর বানানো সহ বয়কট আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের কাজও সমিতি করত। প্রদর্শনীতে ছাত্রীদের হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শিত এবং বিক্রি হত। বিক্রয়লব্ধ অর্থ অসহায় কুমারী ও বিধবা মহিলাদের কল্যাণে ব্যয় করা হত।[৭৫] তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিতেও নিয়মিত শিক্ষার পাশাপাশি যেমন চরকা কাটা, সূতা কাটা শেখানো হত, তেমনি সপ্তাহে দু'দিন লেডিজ পার্কে লাঠি খেলা শেখার ক্লাসটিও ছিল বাধ্যতামূলক।[৭৬]

১৯২১ সনে সিলেটে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, বেগম মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর উপস্থিতিতে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় চিকের আড়ালে বসে অংশ নিয়েছিলেন জোবায়দা খাতুনসহ অনেক মহিলা।[৭৭] পরবর্তীকালে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে জোবায়দা খাতুন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। গবেষক আনোয়ার হোসেন উল্লেখ করেছেন, ''বেগম মোহাম্মদ আলির সাথে উর্দুতে কথাবার্তা চালানোর জন্য জোবেদা খাতুনের মা দো-ভাষীর দায়িত্ব পালন করেন।''[৭৮] যদিও অন্য কোন সূত্রে এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায় না, তবে জোবায়দা খাতুনের পারিবারিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিষয়টি মেনে নেওয়া যায়। গবেষক আনোয়ার হোসেন এই পর্যায়ে আরো একজন স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম নারীর উল্লেখ করেছেন। তিনি মিসেস এম রহমান। তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে

> গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের অপর সমর্থক ছিলেন তেজস্বিনী এম রহমান। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এই মহীয়সী নারীর চিন্তাভাবনা ও কর্মের প্রতি এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি তাঁর ''বিষের বাঁশী'' কাব্যগ্রন্থটি এম রহমানের নামে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গপত্রের সূচনায় কবি এম রহমানকে ''বাংলার অগ্নিনাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলা–কুলগৌরব আমার জগজ্জননী স্বরূপা মা'' আখ্যা দেন। মিসেস এম রহমানের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ব্রিটিশ-বিরোধী হওয়ার কারণে তিনি খদ্দরের কাপড় পরতেন। এমনকি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাফনও খদ্দরের কাপড়েই তৈরি হয়েছিল। তাঁর ''বাড়বানল'', ''শক্তি ও শান্তি'', ''আমাদের স্বরূপ'' প্রভৃতি প্রবন্ধে নারীবাদের প্রকাশ ঘটার সাথে স্বরাজ ও স্বদেশমুক্তির চিন্তারও প্রকাশ ঘটেছে।[৭৯]

যদিও রক্ষণশীল মানসিকতা এ পর্যায়েও বাঙালি মুসলিম সমাজে এবং বাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দের মাঝে প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল, তা স্বত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ পর্যায়ে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ না নিয়েও মুসলিম মেয়েদের একাংশের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্তারলাভ করছিল, যা বাঙালি নারীর রাজনৈতিকায়নের প্রথম পর্বে ছিল অনুপস্থিত। এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম নারীর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান এবং কারাবরণের প্রেক্ষাপট এই পর্যায়ে সূচিত হয়।

ভোটাধিকার দাবিতে নারীদের আন্দোলন বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দাবির ফলে মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ তাদের ধর্মীয় জীবনকে কতটা প্রভাবিত করবে তা নিয়ে মুসলিম আইনপ্রণেতাদের মধ্যে বির্তক সৃষ্টি হয়। একাংশ অভিমত পোষণ করে যে, ইসলাম অন্য যে কোন ধর্মের চাইতে নারীর সমঅধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এই অভিমত পোষণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন যে, ভোটের অধিকার মুসলিম নারীদের জন্য যে পর্দার বিধান রয়েছে তাতে বিঘ্ন ঘটাবে।[৮০] সৈয়দ নাসির আলী এই দাবির বিরোধিতা করে বলেন যে

> I ask each and every Muhammadan member of this Council to place his hand upon his breast, and tell the member of this Council whether he wants that his zenana should be drgged out of the purdah, and that is purdah system should be abolished gradually. That is the whole question, each Muhammadan should have to decide for himself.[৮১]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও নারীর ভোটাধিকারের দাবির বিরোধীতা করে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন

> What have the women done to show that they can help us? The women of England before they obtained the vote have long been engaged in helping their folk in their politicalcampaigns, had long shown their interest in participating in the problems of the country, have long worked to uplift and help the poor and suffering, have long stopped to hear the burden of their unfortunate sisters. What have women in Bengle done which can give them the right to come forward and claim participation in the reconstruction of their country. . .?[৮২]

এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বেগম সুলতানা মোয়াজ্জেদা দৈনিক ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখেন

> The women of this province, especially those belonging to the Mahomedan community, have been mercilessly decried in the council and have been constantly accused of having performed no social service which would qualify them for the vote. But who is to answer for their backward condition? Mr. Suhrawardy inquires ``who is it that wishes to keep them uneducated?'' It would not be unfair to remark that it is the men, especially men of the type of our worthy opponent, who are in reality opposed to the amelioration of the condition of the womankind of this province.[৮৩]

মুসলিম নেতৃবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরোধিতা স্বত্ত্বে ও ১৯২৩-এ নারীর ভোটাধিকারের দাবি নিয়ে বঙ্গীয় নারীসমাজের যে প্রতিনিধিদল লর্ড লিটনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান তাতে দু'জন মুসলিম নারীর নাম পাওয়া যায়। একজন মিসেস মাজাহারউদ্দিন, অপরজন মিসেস লতিফ।[৮৪] তবে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৯২৫ এ বঙ্গীয় আইনসভায় নারীর ভোটাধিকারের দাবি পেশ হবার আগে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন এর পক্ষে প্রচারণাতে অংশ নেন এবং বঙ্গীয় নারীসমাজের বিভিন্ন সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৮৫] বাঙালি মুসলিম নারীর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন পরিস্থিতিতেও বেগম রোকেয়া তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা মুসলিম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাখেন। এর ফলাফল হিসেবে দেখা যায় ১৯২৫-এ বঙ্গীয় আইন পরিষদে নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নে ৩৩ জন মুসলিম সদস্যের মধ্যে ১৩ জন এর

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে ভোট দেন। ১৯২১ সনে ৩৫ জন মুসলিম সদস্যের ৮ জন নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়াসহ গুটিকয়েক মুসলিম মহিলার প্রচেষ্টা মুসলিম নেতৃবৃন্দের রক্ষণশীল মানসিকতায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তা বলা যায়।

সার্বিকভাবে দেখা যায় সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ অবস্থা ও শিক্ষার অভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালি মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ সীমিত আকারে হলেও তাদের কল্যাণসাধনে এই পর্যায়ে বেশকয়েকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনসমূহের মধ্যে ১৯২২-এ ডঃ লুৎফর রহমান গঠন করেন 'নারীতীর্থ' নামে একটি সংগঠন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল ''যেসব বালিকা ও নির্বোধ যুবতীকে নিষ্ঠুর পুরুষেরা ভালোবাসার প্রলোভন দেখিয়ে ঘরের বাইরে অনৈতিক জীবনে টেনে নিয়ে আসে সেই সমস্ত মেয়েদের আশ্রয় দিয়ে বিবিধ শিল্প কার্যাদি শিক্ষা দিয়ে পবিত্র জীবনযাপন করার সুযোগ দেওয়া।''[৮৬] সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা লুৎফর রহমান স্বয়ং এই সমাজে পতিত নারীদের স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসার জন্য গণিকালয়ে যেতেন এবং তাঁর একক প্রচেষ্টায় এই গণিকাদের জন্য মুক্তি সেনাদল গঠন করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই 'নারীতীর্থ' আশ্রমের কার্যনির্বাহী সভার সভানেত্রী ছিলেন বেগম রোকেয়া এবং ''পতিতা, লাঞ্ছিতা নারীদের বিবিধ শিল্পকার্যাদি শিক্ষা দিয়ে তাদের পবিত্র ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য রোকেয়া এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী চেষ্টা চালান।'' প্রতিষ্ঠানটি কতটা সফলতা অর্জন করেছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও, যে সময়টিতে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে সেসময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উদ্দেশ্যকে মুখ্য করে কোন সংগঠন গড়ে ওঠার কথা জানা যায় না। লীলা নাগ 'দীপালি সংঘ' প্রতিষ্ঠার একবছর পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। একজন বাঙালি মুসলিম পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে বলা যায় যে, বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের যে মুষ্টিমেয় অংশ উদারনৈতিক চেতনা ধারণ করছিল, তাঁরা নারীর সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিম সমাজ রক্ষণশীল চিন্তাধারার ধারক ও বাহক ছিলেন। ১৯২৫-এ মুসলিম মেয়েদের সার্বিক কল্যাণ সাধণের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান মহিলা সমিতি। ১৯২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের ছাত্ররা প্রতিষ্ঠা করে 'পর্দাবিরোধী সংঘ'। এই সংঘ পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ফজিলাতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলে 'আল-মামুন ক্লাব'-এর পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। গবেষক আনোয়ার হোসেন অভিমত পোষণ করেণ যে, '' এইসব সংগঠন প্রতিষ্ঠার ফলে মেয়েদের মধ্যে পর্দার বেড়াজাল ছিন্ন করার প্রয়াস দেখা যায়।''[৮৭] মুসলিক নারীর রাজনৈতিকায়ন এবং সার্বিক মুক্তি এই দু'টির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল পর্দা। এই পর্যায়ে এই উপলব্ধি মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে জাগ্রত হয় এবং তাঁরা সচেষ্ট হয় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে। যার ফলাফল হিসেবে দেখা যায় ১৯২৮ সালে (মতান্তরে ১৯২৭) বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিতিতে সিলেটে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের যে সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় সেখানে প্রথম প্রকাশ্যে পর্দাপ্রথার অবসান ঘটান জোবায়দা খাতুন চৌধুরী।[৮৮] অনুষ্ঠানে নারীদের উপস্থিতি ঘটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। তাঁদের জন্য রীতি অনুসারে বসবার আলাদা স্থান নির্ধারণ করে আমন্ত্রণ জানানো হয় বিশিষ্ট নারীদের।[৮৯] এদের মধ্যে জোবায়দা খাতুন চৌধুরীও ছিলেন। গবেষক তাজুল মোহাম্মদ ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন

> . . . সাদরে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন জোবায়দা খাতুন চৌধুরী। নির্দিষ্ট দিনে হাজির হলেন বরাবরের মতো বোরখা পরে। আসনও গ্রহণ করেন মহিলাদের নির্ধারিত স্থানে, পর্দার ভেতরে।. . . অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন। মাইক্রোফোনের সামনে দন্ডায়মান ঘোষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো অনুষ্ঠান শুরুর ঘোষণা। এরপর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দরাজ কণ্ঠে পরিবেশিত হয় উদ্বোধনী সঙ্গীত। ঠিক তখনই ঘটে এক অভাবিত ঘটনা। মুহূর্তে হলভর্তি লোকজনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো নারী- পুরুষ আসনের মধ্যবর্তী স্থানে। চিকের বেড়া আর নেই সেখানে। উদ্বোধনী সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গেই এক টানে জোবায়দা খাতুন চৌধুরী খুলে দিয়েছেন নারী আর পুরুষের মধ্যকার পর্দা। তখনকার বাস্তবতায় এটি কোনো সামান্য ঘটনা নয়। মুসলিম সমাজের কাছে তা ছিল অকল্পনীয়। বিস্ময়ের ঘোরমুক্ত হওয়ার আগেই ঘটে আরো ঘটে আরো আশ্চর্যজনক ঘটনা। জোবায়দা খাতুন চৌধুরী ততক্ষণে খুলে ফেলেছেন তাঁর বোরখা। পুরোপুরি পর্দামুক্ত মহিলা হিসেবে নির্বিকার বসে আছেন তিনি।[৯০]

সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জোবায়দা খাতুন চৌধুরীর পিতা এবং স্বামী। সময়কালের বিচারে এবং কলকাতা কিংবা ঢাকা নয় বরং সিলেটের মতো তৎকালীন মফঃস্বল অঞ্চলে ঘটনাটি অনেকটা বিদ্রোহ ঘটানোর মতো ঘটনা। তবে এর প্রভাব গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে পড়ে নি। তাঁরা একে নেতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেন। জোবায়দা খাতুন ১৯২৮ সালেই যোগ দেন কংগ্রেসে। তাজুল ইসলাম উল্লেখ করেন, '' জোবায়দা খাতুন চৌধুরীই বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে চলে আসেন।''[৯১] গবেষক আনোয়ার হোসেনও একই অভিমত পোষণ করেন।[৯২] তথ্যটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। প্রথম মুসলিম মহিলা হিসেবে খায়রুন্নেসা কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন উনিশ দশকের শেষ দশকে এবং মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং একমাত্র বাঙালি মুসলিম নারী হিসেবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পক্ষে বলিষ্ঠ লেখনী ধরেন।[৯৩] তবে খায়রুন্নেসা ১৯১০-এ অকালমৃত্যুবরণ করেণ এবং তিনি মুসলিম নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারেন নি, সেই প্রেক্ষাপট তখনও তৈরি হয় নি। পক্ষান্তরে জোবায়দা খাতুন চৌধুরীর কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ এবং সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের পটভূমিতে। তিনি কংগ্রেসে যোগদানের দু'বছর পর সিলেটে গঠিত হয় কংগ্রেসের মহিলা শাখা, যার মধ্যদিয়ে তিনি চলে আসেন নেতৃত্ব পর্যায়ে, যা পরবর্তী দশকে মুসলিম নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। এ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। জোবায়দা খাতুন চৌধুরীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে মুসলিম নারীর রাজনৈতিকায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সার্বিকভাবে বলা চলে এপর্যায়ে বাঙালি মুসলিম নারীরা প্রধানত বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যদিয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য সমাজে একটি অবস্থান তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। তবে তাদের মধ্যে একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী চেতনার সূত্রপাত ঘটে, তেমনি নিজেদের অবস্থান সম্পর্কেও সচেতন তাঁরা হয়ে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে জোবায়দা খাতুন চৌধুরী তার অপ্রকাশিত ডায়েরিতে লেখেন

> . . . পরাধীন দেশের মানুষের উপর সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ষ্টীম রোলার চালানোর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট দেখে মরিয়া হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলাম এর অবসান ঘটাতে- দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকারীর হাত থেকে। তবে এর সাথে জড়িত ছিল নারীমুক্তির আকাঙ্খা। আমাদের মুস্লিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের স্বীয় অজ্ঞাতেই কারারুদ্ধ জীবন, যন্ত্রের ন্যায় সন্তান ধারন পালন, সংসার চক্রের বাধ্যবাধকতার কঠিন নিগড়ে আষ্টে পৃষ্টে বন্ধন ও মৃত্যুবরণ। এই সুন্দর ভুবনের কোন সাদ ও দৃশ্য তাদের অনুভূত হলো না। তাদেরও করণীয় কত কিছু ছিল এই মানবজীবনে তাও উপলব্ধি করতে পারেনি। শুধু রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা ছাড়া– এ সবেও মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত।[৯৪]

কাজেই ১৯২০-৩০ সময়কালটিতে বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিকায়ন- এর ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি যেমন সাধিত হয় একই সাথে রাজনৈতিকায়নেরও সূত্রপাত হয়।

(৬)

বিশ শতকের বিশের দশকে বাঙালি নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ভারতী রায় প্রশ্ন করেছেন, ''দেশের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক কাঠামোতে মেয়েদের প্রতি যে অবিচার করা হয়, তার সম্বন্ধে এ'রা কতটা সজাগ ছিলেন? এই কাঠামো ভাঙ্গবার লক্ষ্য কি নিয়ে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছিলেন? তাঁদের রাজনৈতিক অবদান কি তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিল?''[৯৫]

প্রশ্নসমূহ বিবেচনার সময় এ প্রসঙ্গে যে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে তা হলো, ১৯২০-২৯ এই সময়কালে বাঙালি নারীর রাজনৈতিকায়নের দ্বিতীয় পর্যায়টির সূত্রপাত ঘটে পুরুষদের উৎসাহ এবং সহযোগিতায়; এই পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিকায়নের প্রক্রিয়াটি সবচাইতে বেশী প্রভাবিত হয় মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত কর্মসূচির মাধ্যমে, যেহেতু গান্ধীজী নারীর ভূমিকার সমাজ নির্ধারিত গণ্ডিতে বিশ্বাসী ছিলেন কাজেই তাঁর প্রবর্তিত কর্মসূচিতে নারীর সার্বিক মুক্তির জন্য কোন বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। যে নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন, তারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন করেন নি্য। এপর্যায়ে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক চেতনা প্রসার-নারীমুক্তি নয়,ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা যায় দীপালি সংঘ-এর নাম। এই সীমাবদ্ধতাসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনায় রেখে বলা যায় যে, নারীমুক্তি নারীর রাজনৈতিকায়নের উদ্দেশ্য না হলেও এই সময়কালে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবার ফলে নারীর জীবনযাত্রায় এক ধরনের পরিবর্তন আসে। সুরক্ষিত গৃহকোণ থেকে বাইরে বের হয়ে আসার ফলে মেয়েরা বৃহত্তর জগতের মুখোমুখি হয়, যা এতদিন পুরষের একক অধিকারে ছিল। রাজনীতি প্রথম বাঙালি নারীকে পুরুষ অধিকৃত জগতে সমঅধিকার না দিলেও প্রবেশাধিার দেয় এই পর্বে। ফলে ধীরে ধীরে নারী সম্পর্কিত প্রচলিত ধ্যানধারণায় যেমন কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসতে শুরু করে, নারীরাও নিজের আত্মশক্তি উপলব্ধি করতে শুরু করে এবং তাদের ভেতর কিছুটা হলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীর প্রতি যে বৈষম্য তার প্রতি সচেতনতা তৈরি হয়। পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে নারীরা তাদের সমাজনির্ধারিত ঐতিহ্যিক যে ভূমিকা তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। এ পর্বে একদিকে যেমন লীলা নাগ, লতিকা ঘোষ-এর মত শিক্ষিত নারীনেতৃত্ব তৈরি হয়, অপরদিকে আশালতা সেন, মনোরমা বসু মাসিমার মতো সাধারণ গৃহবধূরাও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্বে চলে আসেন এবং তাদের মাধ্যমে যে নারীকর্মী বাহিনী তৈরি হয় তারাও সাধারণ বাঙালি গৃহবধূ বা মেয়ের দল। এই দশকের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় বাঙালি ছাত্রীসমাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে ব্যাপক হারে, এই শিক্ষিত ছাত্রীসমাজ ভবিষ্যতে নারী আন্দোলনের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে। ভারতী রায় উল্লেখ করেন, "একথা বলা যায় যে রাজনৈতিকভাবে সচেতন মেয়েরা বুঝেছিলেন যে, এই পুরুষপ্রধান সমাজে এক ধরনের অন্যায় ও অবিচার, সর্বক্ষেত্রেই প্রসারিত হতে পারে।"[৯৬] তবে এটি চেতনার পর্যায়ে ছিল, তখনও পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা সরব প্রতিবাদ নারীর কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হবার ফলে বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালি নারীর রাজনৈতিকায়নের পটভূমি সৃষ্টি হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় এই শতকের বিশের দশকে বাঙালি নারী সক্রিয় রাজনীতিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে তোলে। এই পর্যায়ে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন বাঙালি নারীরা। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী দশকে একদিকে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদিয়ে বাঙালি নারীর কারাবরণের ঘটনা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। একই সাথে বামপন্থী আন্দোলনে বাঙালি নারী সম্পৃক্ত হয়ে প্রান্তিক নারীর কাছে মুক্তির বার্তা বহন করে নিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৯
২. রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলায় নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)', পৃ. ৪৭-৪৮
৩. Taneja, ***Gandhi, Women, and the National Movement***, p. 51
৪. রেবা রায় (অনুদিত), *গান্ধিজীর 'টু দি উইমেন'*, (কলকাতা: এ, মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯৯১), পৃ. ৩৩
৫. ঐ, পৃ. ৩৪
৬. Taneja, ***Gandhi, Women, and the National Movement***, p. 51
৭. উদ্ধৃত, ঐ
৮. Visram, ***Women in India and Pakistan***, p. 23
৯. ঐ
10. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ৫
১১. Taneja, ***Gandhi, Women, and the National Movement***, p. 97
১২. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ৫৬
১৩. রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলায় নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)', পৃ. ৫১
১৪. রায় (অনুদিত), *গান্ধিজীর 'টু দি উইমেন'*, পৃ. ১৯৮-১৯৯
১৫. রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলায় নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)', পৃ. ৫২
১৬. আনোয়ারা আলম, *ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের নারী*, (চট্টগ্রাম: শৈলী প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ২৮
১৭. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ২২
১৮. Engels, ***Beyond Purdah? Women in Bengal 1890-1939***, p. 32
১৯. Ibid
২০. Ibid
২১. ছবি বসু, *বাঙলার নারী-আন্দোলন*, পৃ. ৩২৩
২২. বসু, *আত্মস্মৃতিকথা*, পৃ. ১০৭
২৩. ঐ
২৪. রায় (অনুদিত), *গান্ধিজীর 'টু দি উইমেন'*, পৃ. ৪৫
২৫. বসু, *বাঙলার নারী-আন্দোলন*, পৃ. ৩২৩
২৬. মনিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা*, (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩), পৃ: ২৬। সনটি প্রসঙ্গে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে, মনোরমা বসু মাসিমা ১৯২৪ বলে উল্লেখ করেছেন।
২৭. ঐ, পৃ. ২৭
২৮. ঐ, পৃ. ২৭
২৯. আভা সিংহ, *বিস্মৃত বীরাঙ্গনা ইন্দুমতি*, (কলকাতা: শ্রী সুনীল সিংহ বুক ক্লাব, ১৯৯৫), পৃ. ৬
৩০. Geraldine Forbes, ***Women in Colonial India : Essays on Politics, Medicine, and Historiography***, (New Delhi: Chronicle Books, 2005), p. 42
৩১. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ৫১
৩২. সেন, *সেকালের কথা*, পৃ. ১৮
৩৩. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ১০১
৩৪. সেন, *সেকালের কথা*, পৃ. ১৮-১৯
৩৫. ঐ
৩৬. আগমনী লাহিড়ী, বিজয়কুমার নাগ, *শিখাময়ী লীলা রায়*, (কলকাতা: জয়শ্রী প্রকাশন,১৯৯৯), পৃ. ১১
৩৭. দীপংকর মোহান্ত, *লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ২০-২১
৩৮. লাহিড়ী-নাগ, *শিখাময়ী লীলা রায়*, পৃ. ১২
৩৯. ঐ
৪০. মোহান্ত, *লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ*, পৃ. ২৭
৪১. ঐ
৪২. ঐ
৪৩. ঐ, পৃ. ৩১
৪৪. লীলা নাগ, *ঢাকা দিপালী সঙ্ঘ*, **বঙ্গলক্ষ্মী**, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ
৪৫. লাহিড়ী-নাগ, *শিখাময়ী লীলা রায়*, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. মোহান্ত, ***লীলা রায়,*** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৩৫
৪৭. ঐ, পৃ. ৩৪
৪৮. রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলায় নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)', পৃ. ৪৯
৪৯. Barbara Southard, ***The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal: The quest for political rights, Education and social reform legislation***, (Dhaka, UPL, 1996), p. 73
৫০. শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত, 'বাঙালি মেয়ের রাজনীতি ভাবনা', পুলকচন্দ (সম্পাদিত), ***নারীবিশ্ব***, (কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৮), পৃ. ২৩২
৫১. ঐ
৫২. Southard, ***The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal***, p. 79
৫৩. মফিদুল হক, 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন ও তার ভূমিকা', মফিদুল হক, ***নারীমুক্তির পথিকৃৎ***, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড), পৃ. ২৫
৫৪. রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলায় নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)', পৃ. ৫০
৫৫. ঐ, পৃ. ৫১
৫৬. বাগল, ***জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী***, পৃ. ২৭
৫৭. ঐ
৫৮. বীনা দাস, ***শৃঙ্খল ঝঙ্কার***, (কলকাতা: জয়শ্রী প্রকাশন, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৯
৫৯. প্রাগুক্ত
৬০. বাগল, ***জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী***, পৃ. ২৯
৬১. ঐ
৬২. দাস, ***শৃঙ্খল ঝঙ্কার***, পৃ. ১০-১১
৬৩. বাগল, ***জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী***, পৃ. ২৯
৬৪. ঐ
৬৫. রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলায় নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)', পৃ. ৫৬
৬৬. কমলা দাশগুপ্ত, ***রক্তের অক্ষরে***,(কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫), পৃ. ৭
৬৭. রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলায় নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)', পৃ. ৫৬
৬৮. Taneja, ***Gandhi, Women, and the National Movement***, p. 82
৬৯. হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭)***, পৃ. ১৯২
৭০. ঐ, পৃ. ১৫৬
৭১. ঐ, পৃ. ১৫৭
৭২. মালেকা বেগম, 'রোকেয়ার স্বদেশী আন্দোলন', মালেকা বেগম (সম্পাদিত), ***অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী মৃত্যুঞ্জয়ী রোকেয়া ও প্রীতিলতা***, (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৮) পৃ. ৩৪
৭৩. হক, 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন ও তার ভূমিকা', পৃ. ২০
৭৪. পঐ, পৃ. ২১
৭৫. হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী***, পৃ. ১৫৭
৭৬. বেগম, 'রোকেয়ার স্বদেশী আন্দোলন', পৃ. ৩৪
৭৭. হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী***, পৃ. ১৯৯
৭৮. ঐ
৭৯. ঐ, পৃ. ১৯৮
৮০. Southard, ***The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal***, p. 103
৮১. ঐ
৮২. ঐ, পৃ. ১০২
৮৩. ঐ, পৃ. ১০২
৮৪. ঐ, পৃ. ৮৭
৮৫. ঐ, পৃ. ৮৯
৮৬. আনোয়ার হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী***, পৃ. ১৫৮
৮৭. ঐ, পৃ. ১৫৮-১৫৯
৮৮. তাজুল মোহাম্মদ, ***জোবায়দা খাতুন চৌধুরী: সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য***, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১৮
৮৯. ঐ, পৃ. ১৯
৯০. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৯১. ঐ, পৃ. ২৩
৯২. হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী***, পৃ. ১৯৯
৯৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য সৈয়দ আবুল মকসুদ, ***পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন***, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২)
৯৪. জোবায়দা খাতুন চৌধুরীর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী মূলক ডায়েরি
৯৫. রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলায় নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)', পৃ. ৫৭
৯৬. ঐ, ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
সনাতন ভূমিকার বাইরে নারী : ১৯৩০-৩৯

> শুধু শহর এবং শিক্ষিত মেয়েতেই নিবদ্ধ নয়; তিরিশের আন্দোলনের প্রসারতা আরো দূরবিসারী, আরো ব্যাপক তার পরিধি। একুশ সনের আন্দোলনে মেয়েরা যেভাবে এসেছিলেন তার চেয়ে শতগুণে বেশি মেয়েরা এবারের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাঙলাদেশে জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় বিভিন্ন বয়সী মেয়েরা দলে-দলে পিকেটিং করতে শুরু করেন। ১৪ বছরের বালিকা থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধা, মেয়ে, বউ, ঠাকুমা, দিদিমার দল প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিল করে লাঠি খান, পুলিশের অশেষ নির্যাতন সহ্য করে জেলে যান। গ্রাম থেকে এলেন নিরক্ষরা, অশিক্ষিতা ঘরের বউ-ঝিরা–যাদের নারীত্বের মর্যাদা প্রতিনিয়তই নির্মমভাবে লাঞ্ছিত হতে লাগল।[১]

সমাজনির্ধারিত প্রথাগত ভূমিকা প্রত্যাখ্যান করে তিরিশের দশকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণ এই আন্দোলনে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। Geraldine Forbes এই দশকে বাঙালি নারীর এই ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, 'Women of Bengal came forward this time but their demonstrations were smaller and their activities more radical than those of Bombay women.'[২] কাজেই তিরিশের দশক বাঙালি নারীর নবপরিচয় আবিস্কারের সময় বলা চলে।

১৯২৯-এ জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় ভারতের রাস্ট্রীয় আদর্শ হবে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হবে। এসময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হবে। যে বিষয়টি লক্ষণীয়, পূর্ববর্তী অসহযোগ আন্দোলনের মত এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নারী-পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্টের বাইরে বের হয়ে আসেন নি। গান্ধীজী লবণআইন ভঙ্গ করে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ১২ মার্চ ১৯৩০ সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডির উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাত্রা করেন। পদযাত্রায় তাঁর সঙ্গী হতে ইচ্ছুক নারীদের তিনি নিবৃত্ত করেন এবং যুক্তি দেখান

> আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই অভিযান। পথে পথে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে বিদেশী শাসকের উদ্যত খড়্গ। আমরা আঘাত আমন্ত্রণ করতেই চলেছি। কিন্তু নারীরা যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে প্রতিপক্ষের হাত হয়ত একটু কেঁপে যেতে পারে। তাদের দুর্বলতার সুযোগ আমরা নিতে চাই না। অতএব এই অভিযান থেকে নারীরা দূরে থাকুন। তাঁরা আন্দোলন শুরু করুক অন্যত্র।[৩]

একমাত্র নারী হিসেবে সরোজিনী নাইডু এই পদযাত্রায় তাঁর সঙ্গী হন। এপ্রিল ১৯৩০-এ গান্ধীজী লবণআইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেফতার হন। এসময়ে তিনি সমগ্র ভারতীয় নারীর উদ্দেশ্যে এক বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি বলেন

Dhaka University Institutional Repository

> এই আন্দোলনে লবন-আইন ভঙ্গ করার চেয়েও বৃহত্তর কার্য আছে। আমি সেই কার্য নির্ণয় করিয়াছি। ১৯২১ সালের এক সময় পুরুষগণ কর্তৃক বিদেশী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে ঐ আন্দোলনের মধ্যে হিংসা প্রবেশ করায় উহা ব্যর্থ হয়। যদি বাস্তবিক আন্দোলন প্রকৃত সৃষ্টি করিতে হয়, তবে পিকেটিং আরম্ভ করিতে হইবে। যদি উহা শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকে, তবে জনগণকে দ্রুত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে উহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। হৃদয়ের দ্বারে নারী ভিন্ন আর কে আঘাত দিতে পারে?. . . মদ ও মাদকদ্রব্যে অভ্যস্ত হইলে যে নৈতিক চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বিদেশী বস্ত্র জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দেয় এবং লক্ষ লক্ষ লোককে কর্মহীন করিয়া তোলে। ইহার পরিণাম কি তাহা নারী জানেন। ভারতের নারীগণ এই দুইটি কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া বৈশিষ্ট্য অর্জন করুন, তাহাই স্বাধীনতা স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহাদের দান পুরুষের অপেক্ষা বেশী হইবে।[৪]

গান্ধীজীর দুটি বক্তব্যেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, নেতৃবৃন্দ তিরিশের দশকেও নারীদের বৃটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য পৃথক কাজের গণ্ডিতে বিশ্বাসী ছিলেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন-এর সময় নারীরা এই গণ্ডি মেনে নিয়েছিলেন, তবে এবার নারীরা এই লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। ভারতীয় নারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ Margaret Cousins আন্দোলনে নারী-পুরুষের পৃথক কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির প্রতিবাদ করে বলেন

> This division of sexes in a non-violent campaign seems to us unnatural and against all the awakened consciousness of modern womanhood. In this stirring critical days for India's destiny there should be no watertight compartments of service. Women ask that no conferences, congresses or commissions dealing with the welfare of India should be held without the presence on them of women. Similarly, women must ask that no marches, no imprisonments, no demonstrations organized for the welfare of India should prohibit women from a share in them.[৫]

অবিভক্ত বাংলায় নারীরা কোন প্রতিবাদী বক্তব্য প্রদান না করে লবণআইন ভঙ্গ করার মধ্যদিয়ে কার্যক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক ভূমিকা নির্ধারণের প্রতিবাদ করে এবং এই নির্ধারিত ভূমিকা অস্বীকার করে। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নারীরা আইন ভঙ্গ করে লবণ প্রস্তুতের কাজে নিয়োজিত হন।[৬] আশালতা সেন তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন

> ১৯৩০-এর মার্চ মাসে আমি সরমা এবং সরযূ গুপ্তার সাহায্যে 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল' গঠন করলাম। এপ্রিল মাসে আমরা কয়েকজন আমার জন্মভূমি নোয়াখালির সমুদ্র তটে লবণ আইন অমান্য করার জন্য গেলাম। সেখান থেকে কিছু নোনাজল ঢাকায় নিয়ে এসে সেখানকার বিখ্যাত বিখ্যাত করোনেশন পার্কে সর্বসমক্ষে নুন তৈরি করে সেই আইন আবার অমান্য করলাম। ব্রিটিশ আইনের বিরুদ্ধে এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে দেখলো এবং জয়ধ্বনি দিয়ে অনুমোদন জানালো। . . . মেয়েদের ভেতর প্রথম গ্রেফতার হলেন সরযূ গুপ্তা, কামিনী বসু, প্রতিভা সেন এবং সুনীতি বসু। তাঁরা সবাই রক্ষণশীল পরিবারের মহিলা। প্রথম তিনজন আবার গোঁড়া হিন্দু বিধাবা। হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

বিধবার নিরামিষ খাবার নিজেরা রান্না করে নেয়ার অধিকার যতদিন জেল কর্তৃপক্ষ না দিলেন ততদিন তাঁরা অনশনে রইলেন।[৭]

জাতীয়তাবাদী চেতনায় তিরিশের দশকে বাঙালি নারী এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরাও সর্বসমক্ষে বের হয়ে এসে লবণআইন ভঙ্গ করলেন এবং কারাবরণ করলেন। মেদিনীপুর, তমলুক অঞ্চলে নিতান্ত কৃষক, তাঁতী পরিবারের অশিক্ষিত মেয়ে-বউরা লবণআইন ভঙ্গ করে দলে দলে কারাবর করেন, এদের মধ্যে মেদিনীপুরের অশিক্ষিতা বিধবা মেয়ে সত্যবালা দেবী পুলিশের হাতে চরম অমর্যাদা সহ্য করে জেলে আসেন।[৮] এর মধ্যদিয়ে একদিকে বাঙালি নারী কর্মক্ষেত্রের মতো নারী-পুরুষের বিভাজনের রেখাটি রাজনীতির ক্ষেত্রেও তৈরি করা হয়েছিল তা প্রকারান্তরে অস্বীকার করলো, অপরদিকে শুধু শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা ধনী পরিবারের নয়, প্রান্তিক নারীসমাজও নিজেদের চিরায়ত ভূমিকার বাইরে বের হয়ে আসলো।

গান্ধীজী তার আন্দোলনে পুরুষের সহযোগী হিসেবে নারীর যে ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলেন, অবিভক্ত বাংলার নেতা সুভাষ চন্দ্র বোস তা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি আন্দোলনে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৯] সুভাষ বোস ১৯২৮-এ লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে বাঙালি নারীদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ' নামে মহিলাদের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি আইন অমান্য আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর প্রতিষ্ঠাতা লতিকা ঘোষ স্কুল-কলেজে ছাত্রীদের পিকেটিং-এর বিষয়টি তত্ত্বাবধান করতেন।[১০] এর সদস্য অরুবালা সেনগুপ্ত-এর নেতৃত্বে এই সংঘের কর্মীবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেন। দলটি কলকাতার শ্যামবাজার, বৌবাজার বড়বাজার অঞ্চলে বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং করতেন।[১১]

১৯৩০ সালের মার্চে কংগ্রেসকর্মী ও নেত্রীরা কলকাতায় গঠন করেন 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'। এর নেতৃত্বে ছিলেন উর্মিলা দেবী, মোহনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, নিস্তারিণী দেবী, অশোকলতা দাস, হেমপ্রভা দাসগুপ্ত, শান্তি দাস (কবীর), বিমল প্রভা দেবী, ইন্দুমতি গোয়েঙ্কা, সরলাবলা সরকার প্রমুখ। এই সমিতির কর্মধারাও ছিল 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ'-এর অনুরূপ বিদেশী বস্ত্রের দোকান এবং মদের দোকানে পিকেটিং করা সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করা। এই সমিতিও বড়বাজারের সদাসুখ কাটরা, মনোহরদাস কাটরা, পচাগলি, সূতাপট্টি, গ্রান্ট স্ট্রীট, চাঁদনী চক, ক্রস স্ট্রীট, বৌবাজার, নিউমার্কেট প্রভৃতি স্থানে পিকেটিং করত। ১৯৩০ এর মে মাসে অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সমিতির পিকেটিং প্রসঙ্গে বলা হয়, "For the first time in the annals of Calcutta the game of football had to be abandoned on Saturday owing to lady picketers making their appearance at club tents."[১২] কাজেই নারী সত্যাগ্রহীরা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায়। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

পিকেটিং-এর ফলে সাময়িকভাবে বিদেশী পণ্যের বিপনন বন্ধ হয়ে যায়, বিদেশী পণ্যব্যবসায়ীদের মালামাল গুদাম, কুঠী ও গদীতেই বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে।[১৩] এমনকি এসময়ে বড়বাজারের বিলেতী দ্রব্যের বাজার পুলিশ ও মিলিটারির ছাউনিতে পরিণত হয়, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নারী সত্যাগ্রহীরা পুলিশের নজরদারীতে পিকেটিং করত এবং পুলিশ তাদের দলে দলে গ্রেফতার করত।[১৪] ১৯৩০ এর জুলাইতে বড়বাজারে পুলিশ পিকেটিংরত নারীদের গ্রেফতার করলে সহিংসতা সৃষ্টির ভয়ে সেখানকার সকল দোকান বন্ধ করে দেয়া হয়।[১৫] আইন অমান্য আন্দোলনে বাঙালি নারীর এই প্রথাবিরুদ্ধ আচরণ একদিকে বাঙালি সমাজে নারীকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে এবং বৃটিশ প্রশাসন ও পুলিশবাহিনীর জন্য নতুন সমস্যা তৈরি করে। বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালি নারীদের সম্পৃক্তি বৃটিশ প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করেছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে বৃটিশ প্রশাসন-এর জন্য এই নারীসমাজ বৃহৎ সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। নারী তাঁর ভূমিকাকে যত প্রতিবাদী করে তোলে বৃটিশ পুলিশও তত কঠোর হতে থাকে।

১৯৩০-এর ২২ জুন কলকাতা শহরে ১৪৪ ধারা জারী ছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র সদস্যরা শোভাযাত্রা বের করেন। কমলা দাশগুপ্তের বর্ণনায়

> শোভাযাত্রা চলেছিল কলেজ স্ট্রীট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত। অসংখ্য পুলিশ, সার্জেন্ট ও ঘোড়সাওয়ার বেষ্টিত বিরাট শোভাযাত্রা সেদিন রণাঙ্গনের সৃষ্টি করেছিল। কলিকাতা শহরের বুকের উপর নারী তখন রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে সত্যাগ্রহীদের পদদলিত করতে উদ্যত ঘোড়াকে রুখেছেন তার লাগাম ধরে ঝুলে প'ড়ে; . . . পুলিশের নির্মম অত্যাচার থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে সবিক্রমে আটকাচ্ছেন তাঁরা পুলিশের লাঠিকে, ঘোড়াকে ও বেটনকে।. . . ক্রমে শোভাযাত্রা এসে পৌঁছল দেশবন্ধু পার্কে। সেখানেও পার্ক ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিটিশ শক্তি। জীবন তুচ্ছ ক'রে অগণিত নরনারী ১৪৪ ধারা ভেঙে পার্কেও ভিতর প্রবেশ করলেন জলস্রোতের মত। সার্জেন্ট, ঘোড়সাওয়ার ও পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের উপর। নারী সেদিন অকুতোভয়ে কখনো ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হচ্ছেন, কখনো শুয়ে পরে ঘোড়ার অগ্রগতি ব্যর্থ করছেন, কখনো পুলিশের বেটনে আহত হচ্ছেন।[১৬]

১৯৩১-এর ২৬ জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা দিবসে কলকাতার সমস্ত বড় বড় পার্ক এবং মনুমেন্ট বৃটিশ পুলিশ ঘিরে রাখে যাতে করে কেউ সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে না পারে। কিন্তু পুলিশ ও ঘোড়সাওয়ার বাহিনীর বেষ্টনী অগ্রাহ্য করে অসংখ্য নারী মনুমেন্টের কাছে পৌঁছবার জন্য অগ্রসর হন। পুলিশের লাঠিচার্জ ও ঘোড়ার পদাঘাতে অনেকে আহত হন। এরমধ্যে মেয়েদের কয়েকজন মনুমেন্টের নীচে পৌছে যান এবং পতাকা উত্তোলন করেন।[১৭] আবার ছাত্রীদের এক শোভাযাত্রার উপর ঘোড়সাওয়ার পুলিশ সার্জেন্ট ঘোড়া চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করতে চাইলে ইলা সেন (তখন ছাত্রী) ছুটে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন।[১৮]

বাঙালি নারীর এই অপরিচিত রূপ কেবল কলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৩০-এর ২৪ মে পূর্ববঙ্গের মফস্বল শহর পটুয়াখালীতে হরতাল ডাকা হয়। ঐ দিন ভোরে সেখানকার মহিলারা রাস্তায় নেমে পড়েন যাতে সরকারী কর্মচারীরা কার্যালয়ে যেতে না পাড়েন। শহরের মুন্সেফ যখন কোর্টে যাচ্ছিলেন তখন মহিলারা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। একজন জমিদার তাঁকে উদ্ধার করতে এলে মহিলারা তার পা ধরে আটকে রাখেন।[১৯] এর দু সপ্তাহ পরে ৪ জুন ১৯৩০-এ নোয়াখালীর মহিলারা দলবদ্ধভাবে বের হয়ে কোর্টে যাবার সব রাস্তা আটকে রাখেন। এখানে মহিলারা সামনের সারিতে দাঁড়ান এবং পুরুষ সত্যাগ্রহীরা তাঁদের পেছনে জড়ো হন। উপনিবেশিক কর্মকর্তারা কোর্টে যাবার পথ খুঁজে পান যেখানে শুধু পুরুষ সত্যাগ্রহীরা অবরোধ করেছিল সেখান থেকে পুলিশ তাদের হঠিয়ে দিলে।[২০] এই ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন ছিল না। অবিভক্ত বাংলার প্রত্যেক অঞ্চলে নারীকে এই ভূমিকায় দেখা যায়। বরিশালের বানরিপাড়া এলাকায় নারীবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ইন্দুমতি। মেয়েরা পিকেটিং-এ নামলে প্রথম প্রথম রক্ষণশীল সমাজের আপত্তি ওঠে। ইন্দুমতি তাদের সকল আপত্তি ইপেক্ষা করে পিকেটিং-এ নেতৃত্ব দেন এবং নেতৃস্থানীয় পুরষকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদল কারারুদ্ধ থাকা অবস্থাতে তাঁর একক নেতৃত্বে এই অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলন সফল করেন।[২১] এ সময়ে তাঁকে কয়েক মাসের জন্য স্বগৃহে অন্তরীন করে রাখা হয়।[২২] পরবর্তী সময়ে বানরীপড়া বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে ইন্দুমতি ও সরযুবালা সেন আমরণ অনশন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাদের অনশনের সপ্তম দিন দোকানীরা সমস্ত বিদেশী কাপড় বের করে দিলে তাতে আগুন লাগানো হয়।[২৩] পূর্ণাঙ্গ দলিল পত্রের অভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে যে বিপুলসংখ্যক বাঙালি নারী সক্রিয়ভাবে অংশনেন তার সঠিক পরিসংখ্যান বা তালিকা যেমন পাওয়া যায় না তেমন তাদের বহুমাত্রিক ভূমিকার সামগ্রিক মূল্যায়নও সম্ভব হয় না। তবে বৃটিশ পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বক্তব্যে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে, আন্দোলনে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং অধিক সক্রিয় ভূমিকা উপনিবেশিক প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করে তুলছিল। পুলিশ প্রশাসনের এক বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়

> Organized attempts, seldom successful were made to hoist the Congress Flag on Government buildings in the mofussil. An increasing share of the work was taken up by women, both because it was becoming more difficult to find male recruits and because the presence of women folk was calculated to prove an embarrassment to the police.[২৪]

বক্তব্যটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। নারী সত্যাগ্রহীরা পুলিশ প্রশাসনকে অসম্মান করতে বা তাদের কর্তব্যে বাধাদানের উদ্দেশে আন্দোলনে যুক্ত হয় নি। পুলিশ প্রশাসনও লিঙ্গবৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হয় নি বা নারীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করে নি। যদিও পুলিশ প্রশাসনকে প্রথম পর্যায়ে নির্দেশ দেয়া হয়,"all officers dealing with lady satyagrahis . . . to be very polite in their manners and to use the minimum of force if possible.[২৫] এই নির্দেশ পুলিশ প্রশাসন পালন করতে সমর্থ হয় নি। প্রাথমিকভাবে পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসকরা সচেষ্ট ছিলেন নারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন না করতে। এর পরিবর্তে তাঁরা বাঙালি নারীদের মানসিক ভাবে হেয় করার মাধ্যমে তাঁদের নিবৃত করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত নারীদের স্বাধীন কোন মতাদর্শ নেই।[২৬] তারা হয় পুরুষদের হীন চক্রান্তের শিকার অথবা পুরুষরা তাদের অধীনতা এবং পর্দাপ্রথা থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পাওয়ামাত্র সেটাকে লুফে নিয়েছে।[২৭] দুটি ক্ষেত্রেই পুরুষকে প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত করে বলা হয়, ". . . they have literally thrown their wives and daughters into the streets with the cowardly satisfaction that they can thus cause annoyance and save their own skin."[২৮] চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনারও একই অভিমত পোষণ করে বলেন, "If they do not consider this a most unchivalrous act, I do not see how they can have any reason to resent any action taken against their women."[২৯] চলমান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীরা প্রমাণ করলেন যে, তাঁদের রাজনৈতিকায়ন সম্পূর্ণ তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছায় হয়েছে এবং প্রশাসনের পক্ষে আর পুরুষকে নারীর রাজপথে আন্দোলনের জন্য দায়ী করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ পর্যায়ে প্রশাসন নারীদের আত্মসম্মান এবং নারীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বাকেরগঞ্জের জেলাপ্রশাসক নারী সত্যাগ্রহীদের প্রসঙ্গে বলেন, "They are not ashamed to prostitute themselves in this way to draw a crowd.[৩০] তিনি আরো বলেন যেসব নারীদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তারা সম্মান পাবার যোগ্য নয় এবং যারা জনসমক্ষে এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে গৃহে তাদের ভূমিকা আরো ভয়াবহ হবে।[৩১] তিনি তার বাহিনীকে এবং নিজেকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, তারা এই মহিলাদের স্বামী নন।[৩২] বাঙালি নারীদের প্রসঙ্গে উপনিবেশিক প্রশাসনের বক্তব্য থেকে বলা যায় যে নারীরা তাঁদের প্রথাসিদ্ধ ভূমিকার বাইরে বের হয়ে জনপরিমণ্ডলে তাঁদের উপস্থিতি জোড়ালোভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, যা প্রশাসনকে পর্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই নতুন নারীকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সেটি পুলিশের জন্য একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। প্রথম পর্যায়ে পুলিশ নারীদের গ্রেফতার না করে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। প্রচণ্ড গরমে তাদের পানির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হতো, তাদের অবরুদ্ধ করে রাখা হতো, কখনো কখনো তাদের ধরে নিয়ে যানবাহন পাওয়া যায় না এমন স্থানে ছেড়ে দিয়ে আসত, এমনকি একবার কলকাতায় সত্যাগ্রহী ছাত্রীদের সারাদিন আটকে রেখে রাত্রি বারোটা নাগাদ নির্জন ধাপার মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসে।[৩৩] এ পদ্ধতি নারীদের আন্দোলনে যোগদানে বিরত রাখতে পারে নি। পুলিশকে এ পর্যায়ে আরো কার্যকর পদ্ধতি বেছে নিতে হয় এবং সেপ্টেম্বর ১৯৩০ এ বৃটিশ ভারতের সবকটি প্রদেশের মধ্যে বাংলায় সর্বাধিকসংখ্যক নারী করাবন্দী হন।[৩৪] কারাজীবন বাঙালি নারীর জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে।

অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানের মহিলাগণ ১৯৩০ সালের লবণআইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন, তাঁদের নামের তালিকা কমলা দাশগুপ্ত দিয়েছেন (দ্রষ্ট্রব্য পরিশিষ্ট-২)। তবে এটি কেবল আইন অমান্য আন্দোলনে বন্দীদের তালিকা এবং তালিকাটি সম্পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

কিনা তা কমলাদাশগুপ্ত উল্লেখ করেন নি। এর বাইরে ছিলেন বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত মেয়েরা এবং রাজবন্দী নারী। দু'বছরে এই বিপুলসংখ্যক নারীর কারাবরণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশেষ মাত্রা যোগ করার পাশাপাশি বাঙালি নারীর জন্য একটি নতুন জগৎ তৈরি করে। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদিয়ে নারী যেমন জনপরিমণ্ডলে প্রবেশের অধিকার অর্জন করে, তেমনি কারাগার নারীর জন্য একটি পৃথক ক্ষেত্র তৈরি করে যেখানে নারী নিজেকে পুরুষের সমান্তরালে নিয়ে আসার সুযোগ লাভ করে। কমলা দাশগুপ্ত প্রদত্ত তালিকা অনুসারে মেয়েদের নাম ও পদবী থেকে বলা যায় এদের অধিকাংশ ছিলেন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের। এদের অনেকেই প্রথম প্রকাশ্যে বের হয়ে এসেছিলেন আন্দোলন করতে। কমলা মুখোপাধ্যায় তাঁর কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ''বিশেষকরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েদের জেলে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। কারণ জেলে শুধু চোর ডাকাত খুনীরাই যায়, মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণির মেয়েরা গেলে তাদের ভবিষ্যৎ ঠিক থাকবে কিনা এই নিয়ে নানান ধরনের ভাবনাচিন্তা ছিল।''[৩৫] সব ধরনের ভাবনাচিন্তার অবসান ঘটিয়ে ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলন ও বিপ্লবী নারীদের একটি বড় অংশ জেলে যান। আবার এসময়েই লীলা নাগ, কমলা দাশগুপ্ত সহ অনেক নেত্রীস্থানীয় নারী হন রাজবন্দী। আইন অমান্য আন্দোলনে বন্দী নারীদের কারাবাস দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু বিপ্লব কাজে সম্পৃক্ত মেয়েদের এবং রাজবন্দীদের দীর্ঘসময়ের জন্য কারাগারে বন্দীজীবন কাটাতে হয়, যার মেয়াদ ছয় থেকে সাত বছর পর্যন্ত ছিল কারো কারো জন্য। কারাগার তাদের জন্য সাময়িক আবাসস্থলে পরিণত হয়ে গৃহপরিমণ্ডল ও জনপরিমণ্ডলকে এক করে তোলে। বীনা দাস জেল জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন, ''প্রথম কয়েক মাস জেলটা ঠিক জেল বলে বুঝতে পারি নি। সঙ্গিনীদের কাউকে ডাকি দিদি, বৌদি; কেউ মাসিমা, কেউ ঠাকুমা। স্নেহে যত্নে আমাদের তিনজনকে সবাই ঢেকে রেখে দিতেন। সবচেয়ে ভাল খাওয়াটা আমাদের জন্য, ঘরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জায়গাটা আমাদের শোবার জন্য এক গেলাস জলও ঢেলে নিতে দিতেন না আমাদের।''[৩৬] এভাবে এই কারাবন্দী নারীরা নিজেদের জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে। Suruchi Thapar-BjÖrkert এ প্রসঙ্গে অভিমত পোষণ করেন যে

> one of the reasons why it was easier for these *purdah*-clad women to cope with prison life was because imprisoned women often came from large joint family households and carried over domestic functions such as giving moral support to other women, participating in discussion and disseminating information and sharing a communal space.[৩৭]

কারাগারে একই সঙ্গে বিভিন্ন বয়স, শ্রেণি, গোষ্ঠী, দলের নারীরা একসঙ্গে থাকতেন। এদের মধ্যে যেমন ছিলেন শিক্ষিত মহিলারা আবার ছিলেন নিতান্ত গ্রাম্য অশিক্ষিত নারী। কারাগারে একসঙ্গে থাকবার ফলে দুই ভিন্নপ্রান্তের নারীদের মধ্যে পরস্পরকে জানবার সুযোগ হয়। শহরের একজন শিক্ষিত নারী গ্রামের একজন

Dhaka University Institutional Repository

অশিক্ষিত নারীর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন, তাদের সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করেন। কংগ্রেসের আওতায় নির্ধারিত গণ্ডিতে আবদ্ধ রাজনীতি শহুরে নারীকে এভাবে প্রান্তিক নারীর কাছে নিয়ে যেতে পারে নি। নারী হিসেবে অন্য নারীর প্রতি সহমর্মিতাবোধের সৃষ্টি হয় এই কারাজীবনে। বীনা দাস তাঁর উপলব্ধি থেকে বলেন

> সুদূর পল্লী থেকে ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চা বুকে নিয়ে কত যে মেয়ে চলে এসেছে–স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে। কতজনের কপালে পিঠে লাঠির দাগ, আরো অন্য ধরনের অত্যাচারের চিহ্নও রয়েছে শরীরে, দেশের জন্য সমস্ত লাঞ্ছনাই একান্ত সহজভাবেই গ্রহণ করে নিয়েছে এরা।. . . তবু ভারী শ্রদ্ধা করতাম ওদের– মনে হত ওদের জেলে আসা আমার চেয়ে কত শক্ত, কত দুঃখের।[৩৮]

একই বক্তব্য পাওয়া যায় শান্তিসুধা ঘোষের বক্তব্যেও। তিনি কারাগারে সাধারণ কয়েদিদের দেখে উপলব্ধি করেছেন

> এত বছর আমি অথবা আমার মতো আরো কয়েকজন মেয়ে যারা দেশের কাজ করছি বলে আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত, তারা সমাজের কোথায় বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি? সমাজ থেকে দূরে, শুভ্র গজদন্তমিনারে? যাদের আজ হঠাৎ একসঙ্গে দেখছি তাদের তো চিনি না! এরাও যে অনেকেই কারার বাইরে বহির্জগতে মাতা কন্যা বা বধূ রূপে সংসার রচনা করে সুখে দুঃখে ও হাসি কান্নায় জীবন কাটিয়েছে, সে কথা তো মনে পড়ল না! এরাও যে আমাদেরই মতো মানুষ, সে আত্মীয়তা অনুভব করবার বদলে যেন শঙ্কিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছি একটা দুস্তর ব্যবধান বোধে। কী আশ্চর্য! হয়তো এদর সান্নিধ্যে এসে, একই আলো বাতাসে, একই নির্মম পরিবেশে, একই অবাঞ্ছিত রূঢ় আচরণের তলায় নিষ্পেষিত হতে হতে ধীরে ধীরে এ ব্যবধান ঘুচবে। দেশের বৃহত্তর সমাজকে বাস্তবরূপে চিনব–যে সমাজেরই আমিও একটি অংশ।[৩৯]

কাজেই কারাগার শুধু নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান্তরালেই নিয়ে আসে নি, নারী হিসেবে আরেক নারীর কাছাকাছি নিয়ে এসে নারীদের মধ্যকার ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পারিবারিক অবস্থার পার্থক্য ঘুঁচিয়ে দিয়ে একাত্মতাবোধের সৃষ্টি করে। পাশাপাশি পারিবারিক জীবনের বাইরে এই জীবনযাত্রায় নারী খুঁজে নেয় এক নতুন মাত্রা। দীর্ঘ কারাজীবনে মহিলা কারাবন্দীদের আত্মমগ্ন হবার প্রধান অবলম্বন ছিল বই এবং সৃজনশীল জ্ঞানের চর্চা। কমলা মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন

> বীনাদি ও কল্যাণীদির বাড়ি থেকে বেশ বইপত্র, রবীন্দ্র, নজরুল, কনকদাস প্রভৃতির গানের অনেক রেকর্ড যা তখন পর্যন্ত বার হয়েছিল, তা সবই এসে যাওয়ায় গান শোনা ও শেখার খুব সুবিধা হয়েছিল। খবরের কাগজ তো ছিন্নভিন্ন অবস্থায় আসত . . . তবে বহু ভালো ইংরেজি বই পরতে পেরেছিলাম। জা ক্রিস্তফ তো সকলেই পরেছিলাম, কিন্তু কয়েকজনের বাড়ি থেকে রোমা রোল্যার *Soul Enchanted* ৬ খণ্ডই, এক একটা করে ভেতরে এসে গিয়েছিল –তাতে ইউরোপের ফ্যাসিজমের খবরাখবর কিছু পেতাম। কীভাবে যেন *And Quiet Flows the Dawn* ও *Virgin Soil Upturned* বইগুলি, Upton Sinclair-এর Jungle ও *Oil* পড়ে রাশিয়ার খবর কিছুটা

Dhaka University Institutional Repository

> জেনেছিলাম। কারো কারো কাছে বুখারিন ও হেগেলের বই ছিল। . . . সঙ্গীতচর্চা, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা খুব বেশিই হতো। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের ইন্দুদি ছিলেন বলে ঐ বিষয়ে আরও একটু সুবিধা হয়েছিল।[৪০]

কারাজীবন নারীকে আলোকিত হতে সহায়তা করেছিল। প্রত্যেক নারীবন্দির স্মৃতিকথায় এ প্রসঙ্গটি উঠে আসে। কমলা দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন

> ১) বীনা ও শান্তির কাছ থেকে আসে নতুন হাওয়া। তাছাড়া বীনা ছিল কবি এবং সাহিত্যিক। যখন মনটা ভারী হয়ে আসে, ওর কাছে গেলে কত রকমের আলোচনা করে। মনটা যেন নতুন ছোঁওয়া পায়। ভারী মনটা কথায় কথায় কখন ক্ষয়ে হালকা হয়ে যায়। জেলখানাটা ছিল মরুভূমি, তার মধ্যে বীনা আর শান্তি ছিল ওয়েসিস্। ওইখানে যেন একটা ইন্‌টেলেকচুয়াল হাওয়া বইত, তার ছিল চুম্বকের মত আকর্ষণ।[৪১]
>
> ২) জেলখানাটা এমন জায়গা যে, মানুষ সেখানে গিয়ে নিজের মনকে নিয়ে কেবলই হয়রান হয়। অফুরন্ত সময় সেখানে। চিন্তায় ডুবে যাওয়ার, সমস্ত জীবনকে তলিয়ে ভাববার, অনাদি অনন্ত বিশ্বকে কল্পনায় খুঁজে ফিরবার, জগতের আদিঅন্তকে জানতে চাইবার, সত্যকে আবিস্কার করবার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে অহরহ টানতে। চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। চিন্তা যে কত নির্মম কত নিষ্ঠুর শিকারি হতে পারে সেকথা জেনেছি জেলখানায়।[৪২]

একই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় বীনা দাসের বক্তব্যেও

> বন্দীজীবনের নিজস্ব ক্ষতিপূরণও অনেক কিছু আছে বৈকি! মানুষকে অন্তর্মুখী করে তোলবার এমন উপযুক্ত স্থান বুঝি আর নেই। চিন্তা আর কল্পনা, স্মৃতি আর স্বপ্ন, সমালোচনা আর আত্মবিশ্লেষণ– এ সবের অবকাশ বাইরে থেকে মানুষ কতটুকুই বা পায়? অথচ এদের দিয়েই বন্দীজীবন বিধৃত হয়ে থাকে। কাজেই বন্দীর মন অনেকখানি গভীরতা লাভ করে–জীবনটা নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেকখানি রসঘন হয়ে উঠতে চায়। বাইরের জগতের কার্পণ্য যত বেড়ে চলে, নিজের দাবী-দাওয়া সব-কিছু নিজের কাছেই করতে হয়, আর তা মেটাতে নিজের মন সবসময়ে নিরাশও করে না।[৪৩]

কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থাতে চট্টগ্রামের বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বড়বোন ইন্দুমতি সিংহ লীলা রায়ের তত্ত্বাবধানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন, যার ফলে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে বীমা কোম্পানিতে চাকুরী নেন। কল্যাণী দাস, রেনু সেন জেলে বসে এম এ পরীক্ষা দেন। কমলা মুখোপাধ্যায়, সুশীলা দাশগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত পাশ করেন বি.এ.। যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেকের জন্য তার ছোটদের পড়াশুনায় সাহায্য করা বাধ্যতামূলক ছিল।[৪৪] কারাবন্দী জীবন একদিকে নারীকে আত্মপোলব্ধির সুযোগ তৈরি করে দেয়, পাশাপাশি কারাজীবনে নারী জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে তাদের বিভিন্ন দাবি ও প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নেয়। এর জন্য তারা অনশন পর্যন্ত করে। কেবল নিজেদের অধিকার নয়, জেলে সাধারণ বন্দি নারীদের সঙ্গে যে অনিয়ম হতো তার বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার হয়। বীনা দাসের ভাষ্যে জানা যায়

> জেলের ফিমেল ইয়ার্ডে ঢুকে জেলার নানারকম অনাচার আরম্ভ করল। ওর স্পর্ধা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সুপারিনটেন্ডেন্টকে জানালাম। উত্তর না দিয়ে চলে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট একদিন জেল দেখতে এল, তাকে বললাম, "চোখের সামনে এ-সব আমরা সহ্য করতে পারছি না।" ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলায় হাত নেড়ে ম্যাজিস্ট্রেট বলে গেল, "না

Dhaka University Institutional Repository

> দেখতে পার চোখ বন্ধ করে থাকবে।" বুঝলাম এরা গোলমাল না করিয়ে ছাড়বে না। শান্তি ততদিনে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে, তিনজনে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলাম, অনশন আরম্ভ করতে হবে। সাধারণ কয়েদিরা শুনে বলল, ঠিকই তো, এসব তো থামানোই উচিত।[৪৫]

রাজনৈতিক নারী বন্দীদের অনশনের ফলে জেলারকে ওই জেল থেকে সড়ানো হয় এবং অনশনকারীরা অনশন ভঙ্গ করেন। কমলা মুখোপাধ্যায়-এর বর্ণনায় জানা যায়, ''জমাদারনীরা যারা আমাদের একটু ঘনিষ্ঠ ছিল, তাদের কাছে জেনেছি যে 'স্বদেশীওয়ালী'রা আসার পর জেল কর্তৃপক্ষ জেলের নিয়মকানুন একটু মেনে চলতেন। আগে নাকি দেখতে ভালো–অল্পবয়সী মেয়েরা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের আবাসে প্রেরিত হতো–'স্বদেশী'রা যাবার পর তা বন্ধ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সব জিনিষেরই একটা ভাল দিকও আছে বোধহয়।"[৪৬] নারী হিসেবে নারীর প্রতি অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাঙালি নারীর জন্য একটি নূতন অভিজ্ঞতা। প্রতিবাদী বাঙালি নারী উপলব্ধি করলো যে নারীর অধিকার ও সম্মান আদায়ের জন্য নারীকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ফলস্বরূপ দেখা যায় পরবর্তী সময়ে এই নারীরা অধিকাংশই (কমলা দাশগুপ্ত, কল্পনা দত্ত, বীনা দাস প্রমুখ) তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। আবার এই অধিকসংখ্যক নারীর কারাবরণ সমাজকে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে এবং নারী ভাবনায় পরিবর্তন আনতে সহায়তাও করে। ১৯৩০-এর নভেম্বরে হিন্দি ম্যাগাজিন *Chand* মতামত প্রকাশ করে

> Our readers would be surprised to know that the number of women who have gone to jail for taking part in the freedom movement is maximum in Bengal. … Now all those people who opposed education for women and who spoke against their liberation can gain some lessons from this heavenly sight.[৪৭]

সার্বিক বিচারে বলা যায় কারাজীবন ছিল নারীর জন্য বৃটিশ প্রশাসন তথা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং বাঙালি নারী কেবল এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নি, নারীশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজচিন্তনে পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়, একই সঙ্গে নারীর আত্মবিকাশেও কারাজীবন সহায়তা করে।

আইন অমান্য আন্দোলনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ সংখ্যাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। যদিও এই সংখ্যা অপর সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় বলা চলে ছিল নগণ্য, তথাপি সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিশের দশকে বাঙালি মুসলিম নারীরা রক্ষণশীল মুসলিমসমাজের ধর্মীয় গোড়ামি আর কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছিলেন। শুধু মুসলিমসমাজের রক্ষণশীলতা নয়, বাঙালি মুসলিমদের জন্য দ্বিতীয় সমস্যা ছিল প্রতিবেশী ধর্ম হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকেদের মুসলমানদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও উপেক্ষার মনোভাব, যা ছিল অনেকটাই অজ্ঞতাবশত এবং যার কারণে গোঁড়া হিন্দুসমাজ মুসলমানদের হীন চোখে দেখতো। মূলত উপনিবেশিক ভারতে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিমদের পশ্চাদপদতা এবং বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সীমিত আকারে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণের এটি একটি কারণ ছিল। জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, যিনি পথিকৃৎ মুসলিম নারী রাজনৈতিক, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন

> এখনকার বাংলাদেশী কোন মুসলমান একথা চিন্তাও করতে পারবেন না যে, প্রতিবেশীর ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রতিবেশী অমুসলমান খোঁজই রাখত না যে মুসলমানরা কি। ওরা শুধু গরুই খায় আর গুন্ডামি করে। নীচু জাতের ওরা। সিলেট মহিলা সংঘের সভায় একদিন বলেই ফেললেন একজন মহিলা যাঁর কাছে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তার পাড়ার মেয়েদেরকে সঙ্ঘের মেম্বার করার ও অন্যান্য বিষয়ের। তিনি কিছুই করেননি। কৈফিয়ৎ দিলেন যে ''আমাদের পাড়ায় তো ভদ্রলোক নেই! সবাই মুচলমান।'' অথচ ওই পাড়ায় শিক্ষিত মুসলমান আর হিন্দুও আছেন অনেক। আর বস্তিও আছে মুসলমানদের। তখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম ঐ সভায়ই উক্ত ভদ্রমহিলাকে, তাহলে আমিওতো মুসলমান অভদ্রলোক, উচিত হয় নি আপনাদের, আমাকে প্রেসিডেন্টের পদে নির্ব্বাচিত করার। সভাস্থলে সকলের মুখে চুনকালি পড়ল, সকলেই এই উক্তির জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অবমাননা করার অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার জন্য অনুতাপ করা হলো।[৪৮]

বাঙালি মুসলিমসমাজ তাদের মেয়েদের পর্দাপ্রথা অমান্য করে প্রকাশ্য রাজপথে বা সভাসমিতিতে দেখতে নারাজ ছিল। ''সাম্প্রদায়িক গোঁড়া কাঠমোল্লাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য ২/১ খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের দৌলতে।''[৪৯] জোবায়দা খাতুন চৌধুরী রাজনীতিতে যোগ দিলে সেইসব পত্রিকা তিনি ইসলামি শরিয়তবিরোধী কাজ করছেন বলে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাত, এমনকি তার পিতা খান বাহাদুর শরাফত আলী চৌধুরীকেও সমাজের কটুক্তি শুনতে হয়। জোবায়দা খাতুনের স্মৃতিতে জানা যায় তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত মওলানা হোসেন আহমদ মদনী প্রতি রমজান মাসে সিলেট অবস্থান করতেন এবং 'খতমে তারাবী'র নামাজ জামাতে পড়াতেন।[৫০] তাঁর পিতা সেই নামাজে শরীক হতেন। নামাজে ক্ষণিক বিরতির সুযোগ নিয়ে ধর্মান্ধ লোকেরা মওলানা সাহেবকে বোঝাতেন, ''ডিপুটি সাহেব, উনার মেয়েরা পর্দ্দা মানে না, বোর্খা পড়ে না, সভায় যায়, মিছিলে যায়, বক্তৃতা দেয়, ইসলামি শরিয়তবিরোধী কাজ করে।''[৫১] তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রথম কারাবরণকারী মুসলিম নারী হোসনে আরা মোদাব্বের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গ্রামে গেলে তাঁকে গ্রহণ করতে তাঁর আত্মীয়-স্বজন অসম্মতি জানায়, তার স্বামী মোহাম্মদ মোদাব্বের এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এভাবে

> কলকাতায় মাসখানেক রেখে হোসনে আরাকে গ্রামের বাড়ীতে রেখে এলাম। গ্রামে আমাদের উপর শুরু হল কুসংস্কারে অন্ধ লোকদের অত্যাচার। পড়শীরা সকলেই প্রায় আমাদের বয়কট করে বসলো। আমার এক দূর সম্পর্কের বড় ভাই, প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগলো যে, এই বউকে বাড়ীতে থাকতে দেব না। মুসলমানের মেয়ে বেপর্দা হয়ে মিটিং করবে, জেল খাটবে, এ অনাচার আমরা সইব না। মা ত মাথায় করাঘাত করে চীৎকার করে কাঁদেন, ছেলেকে ঘরমুখো করবো বলে বিয়ে দেওয়ালাম আর সেই বউ ছেলেকে ঘর থেকে টেনে বের করলো। আরো কত রকম অত্যাচার যে আমাদের উপর দিয়ে চলল, তা বর্ণনা করলে আর একখানা বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতার বিপরীত চিত্রও ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা যায়। মওলানা হোসেন আহমদ মদনীর নিকট যখন জোবায়দা খাতুনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল,তখন এর সমাধান হিসেবে সিলেট মহিলা সংঘের সেক্রেটারি সরলাবালা দেব এবং জোবায়দা খাতুন চৌধুরী পরামর্শ করে কার্যনির্বাহী পরিষদের এক সভা আহ্বান করে।[৫৩] সভায় বক্তব্য প্রদানের জন্য মওলানা হোসেন আহমদ মদনীকে আমন্ত্রণ জানানো হলে, তিনি সম্মত হন।[৫৪] যদিও সভায় জোবায়দা খাতুন ব্যতীত অন্যকোন মুসলিম মহিলা উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি মওলানা হোসেন আহমদ মদনীর বক্তব্যটি মুসলিম নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের পক্ষে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। তিনি বক্তব্যে বলেন

> আমার সম্মানিতা মা বোনেরা। আমি সিলেটে এসে দেখলাম, স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনারা নারী হয়েও ইংরেজ সরকারের ভয়ভীতি প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যে ভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন উপেক্ষা করে জেল খেটেছেন, লাঠির গুতা খেয়েছেন কামান বন্দুকে ভীত না হয়ে জাতীয় পতাকা উন্নত রেখেছেন, দেখে আমি গর্ব্ব অনুভব করছি। ভারতের সর্ব্বত্র অমুসলমান মহিলারা শোভাযাত্রা, পিকেটিং করছেন। বড় আফসোস কোন মুস্লিম মহিলা এসবে নেই..। সিলেটের পাক জালালাবাদে মুসলিম মহিলারা মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ায় শরিয়তের কোন বরখেলাপ তো হবেইনা, শরিয়তের নির্দেশানুযায়ী কার্যই হবে। প্রাণ যাবে, বিসর্জন দেবেন জীবন, শাহাদত বরণ করবেন তথাপি পতাকার সম্মান রক্ষা করবেন। আমি আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করছি তিনি যেন আপনাদেরকে আরো শক্তি দেন।[৫৫]

মওলানা হোসেন আহমদ মদনী ছিলেন স্বনামখ্যাত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি। এমন একজন ধর্মপরায়ণ মওলানা যখন মুসলিম নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন, তখন সাধারণ মানুষ বিরোধিতা করতে পারে না। আবার হোসনে আরা মোদাব্বের যেমন নিজ গ্রামে লাঞ্ছিত হয়েছেন, আবার তাকে কেউ কেউ সাদরে বরণ করে নেয়ার চিত্রও পাওয়া যায়

> জেলখানা থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনে এলাম। ট্রেনের মধ্যে অনেক যাত্রী গায়ে-পড়ে আলাপ করতে এল। হোস্নে আরাকে দেখিয়ে বললো ইনি কি স্বদেশী করেন? ইনি কি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। যখন জানলো যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরছেন, তখন হিন্দু যাত্রীদের অনেকে এসে দুইহাত জোড় করে নমস্কার করলো। কেউ কেউ লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করতে লাগলো। শিয়ালদহ স্টেশনে হৈ হৈ ব্যাপার। হোসনে আরাকে নেয়ার জন্য কয়েক শতলোকের সমাবেশ হয়েছে, সবাই হিন্দু এবং কংগ্রেস নেতা ও কর্মী।[৫৬]

তবে এঘটনাগুলো ছিল ব্যতিক্রম। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিমসমাজ নারীপ্রসঙ্গে রক্ষণশীল মনোভাবই পোষণ করত। মুসলিম মহিলাদের বৃটিশবিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে কয়েকজন মুসলিম নারী রাজনীতিতে যোগ দেন তারা প্রত্যেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আনোয়ার হোসেন উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৩০-৩২ সালে কলকাতায় ১৭৬ জন মহিলা সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয়, এদের মধ্যে অন্তত্পক্ষে ৬ জন মহিলা ছিলেন মুসলিম।[৫৭] তবে তাদের নাম বা পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। কমলা দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন ঢাকার চারজন মহিলার নাম, যারা আইন অমান্য আন্দোলনে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। এরা হলেন, সামছুন্নেছা বেগম (ঢাকার গোলাম জিলানীর মা); রওশন আরা বেগম (ঢাকার গোলাম জিলানীর স্ত্রী); রাইসা বানু বেগম (ঢাকার আসফ আলি বেগের স্ত্রী) এবং বদরুন্নেছা বেগম (ঢাকার আকতারউদ্দীন হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী)।[৫৮] গোলাম জিলানী ছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। আইন অমান্য আন্দোলন করার অপরাধে তিনি কারাবরণ করেন এবং জেলে থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কাজেই তার মা, স্ত্রী এবং অপর দুই মুসলিম নারী পারিবারিক প্রেক্ষাপটে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। সহায়ক ভূমিকায় নয়, বরং প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশনিয়ে নেতৃত্বের আসনে যিনি চলে আসেন তিনি জোবায়দা খাতুন চৌধুরী। হেনা দাসকে উদ্ধৃত করে জোবায়দা খাতুন চৌধুরীর জীবনীকার তাজুল মোহাম্মদ বলেন

> জোবায়দা খাতুন চৌধুরী হলেন সেকালে প্রথম ও একমাত্র মুসলিম মহিলা, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে কঠোর অবরোধ প্রথার শৃঙ্খল ছিঁড়ে প্রকাশ্যে রাজপথের শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মহিলা সংঘের সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করার মতো যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সারা বাংলায় কংগ্রেসী মহিলা নেতৃত্বের প্রথম সারিতে জোবায়দা খাতুনের অবস্থান ছিল একটি বিস্ময়কর ও অসাধারণ ঘটনা।[৫৯]

মুসলিম নারী হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে প্রথম দেখা যায় জোবায়দা খাতুন চৌধুরীকে। জোবায়দা খাতুন চৌধুরী কংগ্রেসে যোগদান করেন ১৯২৮-এ, ১৯৩০-এ সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেসপন্থী নারীদের একটি সংগঠন। অনেকে অভিমত পোষণ করেন যে এটি মহিলা কংগ্রেসের প্রথম জেলা কমিটি, তবে এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।[৬০] আবার কমিটির নাম নিয়েও রয়েছে মতভেদ। কেউ কেউ উল্লেখ করা হয়েছে মহিলা সংঘ, অনেকে বলেছেন কংগ্রেসের মহিলা শাখা। গবেষক তাজুল ইসলাম দুটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠার সাল কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে নামের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও সংগঠন ছিল একটিই।[৬১] জোবায়দা খাতুন চৌধুরী তাঁর অপ্রকাশিত আত্মকথায় 'সিলেট মহিলা সংঘ' বলে সংগঠনটির নাম উল্লেখ করেছেন।[৬২] তাঁর স্মৃতিকথায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে তিনি এই সংগঠনটির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং সেক্রেটারি ছিলেন সরলাবালা দেব।[৬৩] একজন রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের নারী কংগ্রেসের মহিলা সদস্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে জোবায়দা খাতুন নিজ আত্মশক্তির পরিচয়ই শধু দেন নি, তিনি বাংলার পশ্চাদপদ গোঁড়া মুসলিম নারীসমাজের জন্য উদাহরণ তৈরি করলেন। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সিলেটের অন্যান্য মুসলিম মহিলারা এগিয়ে আসার মতো সাহসিকতা দেখালেন না। ব্যতিক্রম হিসেবে একজনের নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন সিলেট বারের আইনজীবি সিরাজউদ্দিন চৌধুরীর স্ত্রী মুহিবুন্নেসা চৌধুরী। মুহিবুন্নেসা চৌধুরী স্বামীর উৎসাহে রাজনীতিতে আসেন। জোবায়দা খাতুন চৌধুরী মুহিবুন্নেসা চৌধুরীর রাজনীতিতে যোগদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন

> ঘোর রক্ষণশীল অভিজাত জমিদার পরিবারের কন্যা বিয়ে হয়ে আসলেন যার ঘরে, তিনি মুসলমান সমাজে অত্যাধুনিক রবীন্দ্রভক্ত, সাহিত্যানুরাগী, মজলিশি, তার্কিক, অপ্রিয় সত্যবাদী, যুবসমিতির সভাপতি ইত্যাদি। তিনি মেয়েদের পর্দা

Dhaka University Institutional Repository

> বা অবরোধের বিরোধী আশ্চর্য্য ঘটনা, অথচ বিয়ে করলেন গোড়া সংস্কারবাদী পরিবারের মেয়ে। কিন্তু হলে কি হবে? প্রথম থেকেই সহধর্ম্মিনীকে এমন দীক্ষা দিলেন, জোবেদা খাতুন চৌধুরীর পাশে আর একজন সঙ্গিনী মুহিবুন্নেসা চৌধুরী। আর কি উৎসাহ উদ্দীপনায় তিনি সাথী বান্ধবী হয়েছেন জোবেদা খাতুনের। অথচ আমাদের দু'বান্ধবীর ঘর বলতে উল্টো পরস্পর বিপরীত। যেমন আমার স্বামী রক্ষণশীল হলেও আমি অধিকার আদায় করেছি প্রথমে ঘরে সংগ্রাম করে। আর মুহিবুন্নেসা চৌধুরী মুক্তি পেয়ে গেছেন স্বামীর আধুনিক মতবাদ আর উদারতায়।[৬৪]

বাঙালি মুসলিম সমাজের অল্পসংখ্যক নারী পরিবার এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ত্রিশের দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হলেও তাদের অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। জোবেদা খাতুন সিলেটে মহিলা সংঘের নেতৃত্বে এসে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৩১-এর ২৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে উৎসব এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় মহিলাদের সংগঠিত করেন জোবায়দা খাতুন। মিছিলটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গোবিন্দ পার্কের সামনে আসলে বাধা দেয় পুলিশ। জোবায়দা খাতুন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলেন যেখানে পুলিশ বাধা দিয়েছে সেই স্থানে অবস্থান করেই তাঁরা স্বাধীনতার শপথ নেবেন। এরপর পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে প্রকাশ্য রাজপথে শপথবাক্য পাঠ করান জোবায়দা খাতুন চৌধুরী। পরবর্তী বছরেও তাঁর উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। তাঁর সভাপতিত্বকালে সিলেট মহিলা সংঘের উদ্যোগে সুরমা উপত্যাকায় একটি রাষ্ট্রীয় সম্মেলন করে, যে সম্মেলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, উর্মিলা দেবীসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।[৬৫] তাঁর নেতৃত্বে মহিলা সংঘ সিলেটের মনিপুরী কৃষকদের জমিদারদের নির্যাতনের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা ভানুবিল আন্দোলনে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে।[৭০] সত্যেন সেন জোবায়দা খাতুনের মূল্যায়নে বলেন

> তাঁকে দেখা যেত মিছিলের পুরোভাগে, সভামঞ্চে – সামাজিক কোনো বাধাই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তখনকার দিনের সিলেটের মুসলিম সমাজের কোন শরিফ পরিবারের মহিলার পক্ষে এভাবে সাধারণ নরনারীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকাশ্য রাজপথে বেরিয়ে আসা-এ যে কতো বড় সাহসের পরিচায়ক, সে কথা আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের বলে বোঝানো যাবে না। সে সময়কার রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে ওদের মতো গুটিকয়েক মহিলা সেদিন ন্যায়ের জন্য আদর্শের জন্য, মুক্তির জন্য প্রথম পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন।[৬৬]

জোবায়দা খাতুন চৌধুরী পিকেটিং-এর কাজেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তবে তাঁকে অন্যান্যদের মতো গ্রেফতার বা কারাবরণ করতে হয় নি। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার পিতা এবং পাবলিক প্রসিকিউটর স্বামীর কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিত না, পরিবর্তে তাকে তাঁর পিতার জিম্মায় ছেড়ে দিত।[৬৭]

মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাবরণের সম্মান প্রথম অর্জন করেন হোসনে আরা মোদাব্বের। তিনি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাতুষ্পুত্রী এবং রাজনীতিবীদ ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের স্ত্রী। মোহাম্মদ মোদাব্বের বিপ্লবপন্থী হলেও স্ত্রী হোসনে আরা কংগ্রেসের আদর্শে বিশাবাসী ছিলেন। ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে সাধারণ গৃহিনী মেয়েরা যাতে আত্মনির্ভরশীল হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে সেজন্য কুটিরশিল্পের বিকাশে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে চরকায় সূতা কাটা, সেলাই-এর কাজ এবং মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য প্রচারণা চালাতেন। তিনি অল্পবয়স্ক মুসলিম মেয়েদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং হিন্দু মেয়েদের সাথে প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দিতেন। ১৯৩২-এর ২৬ জানুয়ারি কলকাতার ময়দানে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী গ্রেফতার হলে হোসনে আরাকে সেই জনসভায় সভাপতিত্ব করার ও পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন এবং গ্রেফতার হন। গবেষক আনোয়ার হোসেন উল্লেখ করেছেন হোসনে আরা ছিলেন কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা।[৬৮] মোহাম্মদ মোদাব্বের উল্লেখ করেছেন, ''১৯৩০ সালের ২৫শে মে বিয়ে করে ফেললাম। বাচ্চা গৃহিনী ঘরে এলো।''[৬৯] ১৯৩২-এ হোসনে আরা ছিলেন নিতান্ত অল্পবয়স্ক একজন নবীন গৃহবধূ। কাজেই তিনি যে কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা ছিলেন তা যথার্থ হওয়া সম্ভব। মুসলিম রাজনৈতিক নারীদের স্মৃতিকথা পাওয়া যায় না। যদিও হোসনে আরা সাহিত্য রচনা করতেন, দৌলতননেছা খাতুনও ছিলেন সাহিত্যিক, তথাপি নিজেদের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁরা লিখে রেখে যান নি। মুসলিম রাজনৈতিক নারীদের সকলের নামও প্রামাণ্য দলিলে অনুপস্থিত। কারাজীবন মুসলিম পর্দানশীন নারীর জীবনে কী ধরনের তাৎপর্য বহন করে এনেছিল তা আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। হোসনে আরার স্বামী মোহাম্মদ মোদাব্বের তাঁকে দেখতে যেতেন প্রেসিডেন্সি জেলে। তিনি বর্ণনা করেছেন

> কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে প্রায় সত্তরজন রাজবন্দিনীকে এক বিরাট ওয়ার্ডে রাখা হয়। . . . প্রতি পনের দিন অন্তর আমি জেলে দেখা করতে যাই। প্রতিবারই কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি হোসনে আরার মধ্যে। জেল জীবনের দুঃখ-বেদনার ছাপ তার চোখেমুখে নেই, তার জায়গায় দেখতাম একটা শান্ত সমাহিত ও আনন্দোজ্জ্বল চেহারা। পরে জেনেছিলাম যে, রাজবন্দিনীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা মেয়ে বলে সে আর সব মেয়ের আদরের পাত্রী হয়ে পড়েছে। তার কল্যাণী দিদি তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমায় আর লেখাপড়া শেখায়। শান্তি ও সুনীতি তাকে হাতে করে ভাত খাওয়ায়। যেন ও সবার আদরের দুলালী। কোনদিন জেলে দেখা করতে গিয়ে দেখি ফুলের মালা পরে, হাতে ফুলের কাঁকন, মাথায় ফুলের টোপর পরে সে আমার সামনে হাজির। . . . জেল অফিসে বোসে আলাপের মধ্যে হোস্নে আরা বলল ঃ জানো, আমার দিদিরা আমাকে এত হাসি-খুশির মধ্যে রাখে যে, আমি বাড়ির কথা ভাববারও সময় পাইনে। তাছাড়া পড়াশুনার মধ্যে আমি কিছু কবিতা লিখেছি। দিদিরা বলেছে ভাল হচ্ছে। তুমি একটা ফাউন্টেন পেন, খাতা ও রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কিছু বই আমাকে দিয়ে যেয়ো।[৭০]

বর্ণনা অনুসারে যে বিষয়টি বলা যায়, কারাজীবন নারীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য মিটিয়ে তাদের মধ্যে নারী হিসেবে সহমর্মিতাবোধকে জাগ্রত করেছিল। হোসনে আরা যে তাঁর মেধা-মননের চর্চার মাধ্যমে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলছিল কারাজীবনে বর্ণনাটিতে তাও ব্যক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মতো মুসলিম নারীও অনেকক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনীতি যুক্ত হয়েছেন। গাইবান্ধার দৌলতননেছা খাতুন যেভাবে রাজনীতিতে যোগদেন তার বর্ণনা গোলাম কিবরিয়া পিনু দিয়েছেন এভাবে

> এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যদিয়ে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। সেদিন বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ জনতা জনতা মিছিল করছে–মিছিলটি তাঁর বাসভবনের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ করে বেরিয়ে এসে সোজাসুজি মিছিলটায় যোগ দিলেন এবং মিছিল শেষে এক জনসভায়ও বক্তৃতা দিলেন। তখনকার সামাজিক অবস্থানে একজন মহিলা হিসেবে এই ভূমিকা ছিল এক বিদ্রোহীর ভূমিকা। এরপর ক্রমাগত গভীরভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।[৭১]

তবে তিনি স্কুলের ছাত্রী থাকাকালেই বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং গাইবান্ধার নেত্রী মহামায়া ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসেন। এর ফলেই তিনি মিছিল মিটিং-এ যোগদানের ও বক্তৃতা প্রদানের সাহস অর্জন করেন।[৭২] ১৯৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'গাইবান্ধা মহিলা সমিতি'। এই সমিতির তিনি ছিলেন সম্পাদিকা, সভানেত্রী ছিলেন মহামায়া ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী দক্ষবালা দাস।[৭৩] আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এই সমিতি সভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং সহ আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনা করত। পার্শ্ববর্তী গ্রাম বামুনডাঙ্গা, সুরতখালি, নলডাঙ্গা, বিজয়ডাঙ্গা, ফুলছড়ি, কূপতলা, তুলসীঘাট প্রভৃতি গ্রামে দৌলতননেছা বক্তৃতা দিতেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতো।[৭৪] গোলাম কিবরিয়া পিনু উল্লেখ করেছেন, তিনি লবণআইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেফতার হন এবং তাঁর বাড়ি ক্রোক করে তাঁর স্বামীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়।[৭৫] আনোয়ার হোসেন উল্লেখ করেছেন, তাঁর পরিবার ইংরেজবিদ্বেষী হওয়ায় তাঁর স্বামীকে গাইবান্ধা থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে পুলিশ বাড়ি বাজেয়াপ্ত করতে আসলে তিনি তাঁর দেবরসহ অন্যএক বাড়িতে আশ্রয় নেন। অবশেষে পুলিশ তাঁকে ফুলছড়ি গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে।[৭৬] দু'টি তথ্যেই যে বিষয়টি স্বীকৃত তা হলো দৌলতননেছা খাতুন কেবল গ্রেফতার ও কারাবরণই করেন নি, পারিবারিকভাবেও উপনিবেশিক সরকার কর্তৃক নিগৃহীত হন। এ পর্যায়ে গাইবান্ধায় দৌলতননেছা খাতুনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয় জিয়াউন্নেসা রকিনা খাতুন এবং শামসুন্নাহার রোকেয়া খাতুন আইন অমান্য আন্দোলনে অংশনেন।[৭৭]

ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণকারী আরেক মুসলিম নারীর পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি ফুলবাহার বিবি। তিনিও ১৯৩২-এ গ্রেফতার হন এবং ছয়মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।[৭৮] এছাড়া ময়মনসিংহের রাজিয়া খাতুন এবং হালিমা খাতুনও এসময়ে কারাবরণ করেন।[৭৯]

পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অভাব সত্ত্বেও সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় ত্রিশের দশকে বাঙালি মুসলিম নারীও তাঁর প্রথাসিদ্ধ ভূমিকার বাইরে বের হয়ে আসেন, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল কম। তবে তাদের কর্মকাণ্ড নেতৃত্ব পর্যায় থেকে শুরু করে কারাবরণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রিশের দশকে রাজনীতিতে এই বহুমাত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একদিকে বাঙালি মুসলি নারী প্রমাণ করলেন যে তাঁরা অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের সমকক্ষ হবার

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্যতা রাখেন, অপরপক্ষে মুসলীম নারীদের গ্রেফতার করার মধ্যদিয়ে বৃটিশ প্রশাসনও তাদের কর্মকান্ডের পরোক্ষ স্বীকৃতি প্রদান করলো।

(২)

``Bengali nationalism had always valorized violence and this ethos profoundly influenced the participation of Bengali women in the freedom struggle.''[৮০]

বিপ্লববাদ বলা চলে অবিভক্ত বাংলার উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ শতকের প্রথম থেকে শুরু করে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিপ্লববাদ বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে সবচাইতে বেশি। প্রথম পর্যায়ে বিশ শতকের শুরু থেকে বিশের দশক পর্যন্ত বিপ্লববাদের ধারণা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ এসময়ে তরুণসমাজকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করে। এপর্যায়ে বিপ্লবদলের আদর্শ অনুসারে নারীদের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হতে অনুৎসাহিত করত। এমনকি বিপ্লবীরা মা বোন ও এরকমের নিকটাত্মীয় সম্পর্কের নারী ব্যতীত অন্য নারীদের সংস্পর্শে আসা নিষিদ্ধ মনে করতেন, কারণ তাদের ধারণা ছিল বিপ্লবের পথটি কঠিন এবং নারীদের সংস্পর্শ তরুণদের আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে, যা বিপ্লবপন্থায় কাম্য নয়। কাজেই এপর্যায়ে বাঙালি নারীরা সরাসরি বিপ্লবী দলে যুক্ত হতে পারে নি। বিপ্লবীদের মা, মাসী, বোন প্রভৃতি সম্পর্কের নারীরা তাদের আশ্রয়দান, তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি সহায়ক ভূমিকা পালন করতেন।

বিশ শতকরে বিশের দশকে এসে বাঙালি নারী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংগ্রহণ করার মধ্যদিয়ে জনপরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। এসময়ে দেখা যায় লীলা নাগ 'শ্রীসংঘ' নামের বিপ্লবী দলের সদস্যপদ লাভ করেন এবং 'দীপালি সংঘ' নামে নারীদের সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনটি মেয়েদের ব্যায়ামচর্চা, লাঠি খেলা সহ শরীরচর্চার মধ্যদিয়ে মেয়েদের বিপ্লবকাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এরপর বিশের দশকের শেষ পর্যায়ে কলকাতায় গড়ে ওঠে 'ছাত্রী সংঘ'। এই সংগঠন দুটি তিরিশের দশকে মেয়েদের বিপ্লবী দলে সক্রিয় কর্মীর ভূমিকা পালনের জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করে, বলা চলে এই সংগঠন দু'টি ছিল বাঙালি মেয়েদের বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত করবার সৃজনক্ষেত্র । ১৯৩০-এর কিছু আগে থেকেই প্রায় সমস্ত বিপ্লবী দলে মেয়েরা সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু করে।[৮১] যে বিষয়টি লক্ষণীয়, সেটি হচ্ছে এপর্যায়ে যেসকল মেয়েরা বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন ছাত্রী, বিপ্লবীদের পরিবারভুক্ত নিকটাত্মীয় নারীরা নয়। বিশ শতকের শুরু থেকেই বিপ্লবী আদর্শ খুব সাধারণভাবেই তরুণসমাজকে আকৃষ্ট করত। যেহেতু বাঙালি নারীকে ঐতিহ্যিকভাবে নম্র, বিনয়ী হবার শিক্ষা দেওয়া হতো এবং তারা সামাজিকভাবে স্বাধীন ছিলো না, তাই তাদের জন্য বিপ্লবী দলে যোগ দেয়া সহজ ছিল না, প্রথম পর্যায়ে তারা ছিলেন বিপ্লবীদের পরিবারভুক্ত সদস্য হিসেবে সহায়ক ভূমিকায়। বিশ শতকের বিশের দশকের শেষ পর্বে এসে এই চিত্রে কিছু পরিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

আসে। দিপালী সংঘ এবং ছাত্রী সংঘের মাধ্যমে ছাত্রীরা বিপ্লবীভাবাদর্শে দীক্ষিত হতে থাকেন এবং এই সংস্থা দু'টির সদস্যরাই ত্রিশের দশকে বিভিন্ন বিপ্লবী দলে যোগদেন। এক্ষেত্রে নারীশিক্ষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ছবি বসুর মতে বিপ্লববাদ মূলতই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সৃষ্টি।[৮২] এই সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের জন্য লেখাপড়া শেখাটা খুবই সাধারণ হয়ে উঠল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা ক্রমশ রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন । এদের একাংশ যোগদেন বিপ্লবী দলগুলিতে। Geraldine Forbebes এপসঙ্গে বলেন

> At the same time as these women were picketing and joining processions, other women were recruited by revolutionary organizations. In some cases women, initially attracted to Gandhi, joined the revolutionaries because they craved action or were appalled by police violence. Kamala Das Gupta (b. 1907) wanted to join Gandhi's ashram in 1929 but he told her she must first obtain her parents' permission. Her parents would not allow her to go. By her account she became depressed, . . . Kamala spoke to her *lathi*-fighting instructor, Dinesh Majumdar, who was a member of the revolutionary group Jugantor. She met his senior colleague and was given books to read. At last Kamala found what she had been yearning for, a way to sacrifice herself for India. She joined Jugantor.[৮৩]

কেবল কমলা দাশগুপ্ত নয় বিপ্লবীদলের সদস্য নারীরা প্রত্যেকে অনুভব করেছেন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য তাঁরা আত্মত্যাগে প্রস্তুত এবং এভাবেই শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মেয়েরা মনের দিক থেকে বিপ্লব আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে । প্রথম পর্যায়ে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি এপর্যায়ে শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* তরুণদের বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা দেয় বিপ্লবীদলগুলিতেও তখন পরিবর্তন দেখা যায়। এসময়ে বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে চলে আসেন নতুন প্রজন্মের তরুণরা। প্রবীণদের প্রভাব দলে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এই নবীণ নেতৃত্ব বাইরের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে নিজেরাই নূতনভাবে সংগঠন সাজাতে থাকে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মত বিপদজনক আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করে, পাশাপাশি তারা নারী সদস্যদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে। নারীদের বিপ্লবী দলে অন্তর্ভুক্ত করবার ব্যাপারে যে বিধিনিষেধ ছিল তা এই নবীন নেতৃত্ব অনেকাংশে অস্বীকার করে। তবে বিপ্লবী দলে অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের জন্য এপর্যায়ে পরিবার অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহ্যগতভাবে পারিবারিক ভূমিকা পালনে অভ্যস্ত বাঙালি মেয়েরা বিপ্লবীদলের সক্রিয় সদস্যপদ গ্রহণ করলে এই পারিবারিক ভূমিকা পালন তাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। এই না পারা তাদের অনেকের মধ্যে মানসিক টানাপোড়েন তৈরি করে। বীনা দাস এবং কমলা

Dhaka University Institutional Repository

দাসগুপ্ত উভয়ে তাঁদের স্মৃতিকথায় এই টানাপোড়েনের উল্লেখ করেছেন। বীনা দাস তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এই বলে

> মনে আর-একটা দুর্বলতা ছিল : আমার মা বাবাকে নিয়ে। কেবলই মনে হচ্ছিল ওঁরা কি ভাববেন, কী করে সহ্য করবেন। গুপ্ত সমিতিতে নাম লেখানোর পর থেকেই আমার ধরন-ধারণে ওঁরা কিছুটা অবাক হয়ে যেতেন। কোথায় যাই, কী করি, কিছুই বলতে চাই না–আগেকার মতো সব-কিছুতে উৎসাহও নেই। গম্ভীর হয়ে থাকি। আমার রকমসকম ওঁদের ভালো লাগত না। একদিন বিকেলে বেরিয়ে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বাড়ি যাব বলে। ফিরেছি অনেক রাতে। এসে দেখি মা মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন, আর বাবা আমাকে খুঁজতে গেছেন সেই বন্ধুর বাড়ি। বাবা এসে বললেন, "ওখানে তো যাওনি? এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে বলো?" বাবার মুখ এমন ভয়ংকর কঠোর হতে আগে কখনও দেখি নি। সে রাতটা কাটল ভীষণ বকুনি খেয়ে, বাড়িশুদ্ধ লোকের সারারাত আর ঘুম হলো না।[৮৪]

কমলা দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন

> ওদিকে আমার বাড়িতে চলছে প্রলয় কাণ্ড। বাবা তাঁর বড় কন্যাকে অনেক আশা নিয়ে, অনেক কষ্টে বড় করে তুলেছেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সে। কিন্তু কেমন যেন বিগড়ে গেছে মেয়ে। বি. এ. পাস করার পর থেকেই সে বদলে যাচ্ছে। আতঙ্কে আশঙ্কায় তিনি আর বাঁচেন না। মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করার আকাঙ্খা যতই বাবা-মা'র মনে জোর পেতে লাগল, মেয়ে ততই বেঁকে বসতে থাকল। অশান্তির আগুন কাকে বলে তার সঙ্গে হতে লাগল পিতা-পুত্রীর নিত্য পরিচয়। সমস্ত সংসারটা ঝল্‌সে যেতে চাইছিল। ইউনিভার্সিটি পড়তে যায় মেয়ে, কিন্তু সেখানে তাকে প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিদিন বিকেলে যায় লেডিস পার্কে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলে বলে কৈফিয়ত দেব না। একদিনও বাধা মানে না। ফেরে সন্ধ্যার পরে যখন খুশি। বিয়ের কথা শুনলে ক্ষেপে আগুন। বাধ্য, শান্ত মেয়েটি কখন এবং কেমন করে যে এমন নির্মম এবং কঠিন হয়ে উঠল, সেকথা বাবা-মা'র কাছে দুর্বোধ্য হয়ে আসে। তবে কি মেয়ে লেখাপড়া শিখে বাইরে প্রেম করে বেড়াচ্ছে? মেয়ে ভাবে, ভালোই হল, তাই ভাবুন, তাহলে বিপ্লবীদলের কথা এঁরা সন্দেহ করতে পারবেন না। সেই পরীক্ষা শুরু হোক।[৮৫]

তবে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে তাঁরা বিপ্লবী দলে যুক্ত হন এবং কাজের প্রয়োজনে বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে বসবাস করতে শুরু করেন। বীনা দাস ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনে বাংলার গভর্ণর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করবার আগে ডায়সেসান কলেজের বের্ডিং-এ চলে আসেন, তার পূর্বে কমলা দাশগুপ্ত পরিবার ছেড়ে মহিলা হোস্টেলে চলে আসেন দলের প্রয়োজনে।[৮৬] কেবল রাজনৈতিক মতাদর্শের স্বার্থে পরিবার থেকে দূরে থাকার এই সমাজরীতিবিরুদ্ধ ভূমিকায় বাঙালি নারী নতুন মাত্রা যোগ করে। ত্রিশের দশকে ছাত্রী সংগঠনের মধ্য থেকে যারা বিপ্লবী দলে যুক্ত হন তাঁদের মধ্যে দীপালি সংঘের প্রমীলা গুপ্ত, সুশীলা দাসগুপ্ত, হেলেনা গুন ও রেনু সেন যোগ দিলেন শ্রীসংঘে। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে যোগ দেবার পূর্বে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার দীপালি সংঘের সদস্য ছিলেন। কলকাতার ছাত্রীসংঘের অনেকে যোগ দিলেন বিভিন্ন দলে। ছাত্রীসংঘের প্রধান কল্যাণী দাস উল্লেখ করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজ-গেটে ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করলেই গেটে নিযুক্ত সার্জেন্টরা তাঁদের বেটন দিয়ে আঘাত করতো এবং ছাত্ররা অজ্ঞান হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেলে তাঁদের লরিতে করে হাসপাতালে নিয়ে যেত। প্রতিদিন পুলিশের এই অত্যাচার চলার ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজে আন্দোলন করবার মতো ছাত্রের সংখ্যা কমে আসলে স্কুলের ছাত্ররা এগিয়ে আসে আন্দোলনে। তাদের উপরও চলে একই ধরনের অত্যাচার। এই অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে ছাত্রীসংঘের সদস্যরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।[৮৭] ছাত্রীসংঘের কমলা দাশগুপ্ত, কল্যাণী দাস, শান্তিসুধা ঘোষ, সুলতা কর ও আভা দে যোগ দেন যুগান্তর দলে, কল্পনা দত্ত সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। কুমিল্লায় ফৈজুন্নেসা গার্লস স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম প্রথম ছাত্রী হিসেবে যুগান্তর দলে যোগদেন। তাঁর উপর দায়িত্ব দেয়া হয় সহপাঠীদের মধ্যে দেশাত্মবোধক পত্রিকা ও নিষিদ্ধ বিপ্লবী পুস্তিকা পড়তে দেবার। পড়া শেষে উৎসাহী ছাত্রীদের তিনি আলাপ করিয়ে দিতেন দলনেতাদের সঙ্গে। তাঁর মাধ্যমে কুমিল্লা যুগান্তর দলে যোগ দেন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। তাঁরা যুগান্তর দলের মহিলা সংগঠনকে প্রসারিত করবার লক্ষে গঠন করেন ত্রিপুরা জেলা ছাত্রীসংঘ। ছাত্রীসংঘ-এর সদস্যরা বিভিন্ন পাড়ায় মেয়েদের ক্লাব গড়ে তুললেন। মেয়েদের এই সংঘ ও ক্লাব বিপ্লবী কাজের জন্য উপযুক্ত মেয়ে বাছাইয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবে কুমিল্লা যুগান্তর দলে যোগদেন নীলিমা নন্দী, উর্মিলা গুহ, বনলতা সরকার, শান্তি সেন, মনোরমা সেন, জাহানারা চৌধুরী।[৮৮] বরিশালে শান্তিসুধা ঘোষ স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'শক্তিবাহিনী'। শান্তিসুধা ঘোষ উল্লেখ করেছেন

> সংগঠনের উদ্দেশ্য প্রথমে স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং পরে বিপ্লবাত্মক কর্মের জন্য প্রস্তুতি। প্রকাশ্যভাবে এর কোনটিই তখন ইস্কুলের মধ্যে করবার উপায় নেই। বিশেষত স্কুলটি সরকারী সাহায্যপুষ্ট এবং বর্তমান প্রধান শিক্ষিকাটি বেশ একটু সাহেব ঘেঁষা। সুতরাং তখনকার দিনে দেশের সর্বত্র ছড়ানো ক্লাব, সমিতি, আখড়া ইত্যাদির মতো এখানেও একটি মেয়েদের পাঠচক্র, আলোচনাসভা, শরীরচর্চা ইত্যাদির আবরণের তলায়ই প্রাথমিক আয়োজন শুরু করলাম।[৮৯]

বিভিন্ন স্থানে এভাবে ক্লাব তৈরি করা হতো মেয়েদের বিপ্লবীদলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে। ক্লাবে বিভিন্ন দেশাত্ববোধক বই, বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা পড়ে মেয়েরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হতো বিপ্লবী কাজে যোগদানের জন্য। পাশাপাশি তাদের শারীরিক শক্তি বিকাশের জন্য শরীরচর্চার ব্যবস্থা করতো ক্লাবগুলি। বিপ্লবী নেতারা এইসব ক্লাবে আসতেন মেয়েদের লাঠিখেলা, ছোড়া-খেলা শেখাতে। এভাবে বিপ্লবী নেতারা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেতেন এবং বিপ্লবী কাজের জন্য যোগ্য মেয়ে নির্বাচনের সুযোগ পেতেন। মহিলা ক্লাবের ইতিবাচক দিক ছিল, ''যেহেতু ওপরের খোলসটা ছিল খুবই নিরাপদ–মেয়েদের শরীরচর্চাকেন্দ্র তাই খুব সহজেই পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে পারতো এই ক্লাবগুলো।''[৯০] এভাবে ক্লাবের ছত্রছায়ায় বরিশালে সরোজ আভা দাসচৌধুরী অনুশীলন দলের মহিলা সংগঠন গড়ে তোলেন, পারুল মুখার্জি রংপুর, ফরিদপুর, দিনাজপুর, পাবনা ও খুলনাতে অনুশীলন দলের মহিলা সংগঠন গড়ে তোলেন, কুমিল্লায় অনুশীলন দলের মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রতিভা ভদ্র।[৯১]

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে বিপ্লবী দলে নারীর অংশগ্রহণ যেমন সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে বৃদ্ধি পায় তেমনি তাদের ভূমিকায় গুণগত পরিবর্তনও দেখা যায়। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে বিপ্লবী দলে মেয়েদের ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত। ত্রিশের দশকে মেয়েদের বিপ্লবী দলেও দেখা গেলো সক্রিয় এবং সাহসী ভূমিকায়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী, পলাতক বিপ্লবী অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তকে চন্দননগরের এক বাড়িতে আশ্রয় দেবার দায়িত্ব দেয়া হয় সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুটু)কে। কমলা দাশগুপ্ত এপ্রসঙ্গে বলেন

> মেয়েরা তো আগেও অনেকেই পলাতকদের আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের পলাতকদের আশ্রয় দেবার জন্য একটা নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পুলিশের অজ্ঞাত কোন দুঃসাহসী মেয়ে-কর্মী যদি কারো স্ত্রী সেজে নিজের গড়া সংসারে তাদের আশ্রয় দেয়, তাহলে ব্যবস্থাটা নিরাপদ হতে পারে। এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করবার জন্য দাদা পুটুকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, সে এই কাজ করতে পারবে কি না। পুটুর ছিল একটা দুঃসাহসী প্রাণ। কর্মী হয়ে 'পারব না' বলা পুটুর কর্ম ছিল না। হাসতে হাসতেই পুটু রাজি হয়ে গেল। দাদা সাজিয়েছিলেন সেটা যেন পুটুর সংসার। সেখানে একটা স্কুলে পুটু চাকরি করত। তার স্বামী সেজে সেখানে ছিলেন শশধর আচার্য। তিনি চাকরি করতেন রেলওয়েতে। দেখতে গোবেচারী ভালোমানুষটি, ঠিক পুটুর উল্টো! পুটুর ছোটভাই সেজে রয়েছে সেখানে হেমন্ত তরফদার। . . . অনেকদিন পর্যন্ত পুলিশ টের পায়নি যে ওই তিনটি বিপ্লবী কর্মীর পাতানো সংসারে বিপ্লবীরা লুকিয়ে থাকতে পারে।[৯২]

ইতোপূর্বে বিপ্লবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মেয়েরাই বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন। এদের মধ্যে ননীবালা দেবী, ক্ষীরোদা সুন্দরী চৌধুরী ছিলেন বিধবা। সামাজিক বাধা তাদের ক্ষেত্রে ছিল অনেক কম। বিপরীতে সুহাসিনী গাঙ্গুলী ছিলেন অবিবাহিত, কলকাতার মুকবধির বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। অবিবাহিত একজন মেয়ের ক্ষেত্রে কারো স্ত্রী সেজে বিপ্লবীদের আশ্রয় প্রদানের ঘটনা প্রথাসিদ্ধ নারী-ভূমিকার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ । পরবর্তী জীবনে একারণে তাঁকে নিগৃহীত হতে হয়েছে। পুলিশ তাঁকে আটক করার পর বিপ্লবীদের সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য আঙ্গুলে সূঁচ ফোটানো থেকে ইলেকট্রিক শক দেয়া পর্যন্ত সবরকমের নির্যাতন তাঁর উপর চালাত, তবে এত অত্যাচারের পরেও তাঁর নিকট থেকে কোন তথ্য পুলিশ বের করতে পারে নি।[৯৩] জেল থেকে মুক্ত হবার পর তিনি ও তাঁর বোনেদের কলকাতায় কেউ বাসা ভাড়া দিতে রাজি হতো না, অবশেষে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বোন পরিচয় দিয়ে তাঁকে আশ্রয় দেন।[৯৪] পরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তার হবার পূর্বপর্যন্ত তিনি এই আশ্রয়েই থাকেন।

এপর্বে বিপ্লবী মেয়েরা যথারীতি অস্ত্র লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করত। এর পাশাপাশি তাঁরা গোপনে বিস্ফোরক সংগ্রহ করা ও নির্দেশমতো যথাস্থানে পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। কল্পনা দত্ত বিপ্লবীদের পাঠানো ফর্মূলা অনুসারে গান- কটন তৈরি করেছেন সবার অলক্ষ্যে নিজ পড়ার ঘরে বসে। তাঁর নিজভাষ্যে জানা যায়

Dhaka University Institutional Repository

> শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয়, এ পরিকল্পনা সফল করার জন্য প্রচুর ল্যান্ড মাইন, ডিনামাইট ইত্যাদির জন্য বারুদ দরকার। আর বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদির জন্য দরকার এক মনের মত নাইট্রিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড। . . . আমাকে সর্ব্বতোভাবে এই পরিকল্পনায় জড়িয়ে নেওয়ার জন্য মাষ্টারদা অনন্তদার কাছে আমার নাম অনুমোদন করে পাঠালেন। . . . স্কুল ও কলেজের কৃতী ছাত্রী হিসাবে সুনাম থাকাতে বাড়ীর লোকেদের ও পুলিশের সন্দেহের অতীত ছিলাম। বিজ্ঞাণের ছাত্রী হিসাবে পড়ার ঘরে বসেই অনন্তদাদের পাঠানো ফর্মূলা নিয়ে গান-কটন তৈরী করেছি যা বোমা ইত্যাদির বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। আমার উপর ভার পরেছিল কলকাতা থেকে সালফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড সংগ্রহ করে আনার–৯০ পাউন্ডের মত। কিভাবে কোথা থেকে জোগার করতে হবে সেও আমাকেই বিচার বুদ্ধি দিয়ে ঠিক করতে হবে–অর্থাৎ দায়িত্বটা সম্পূর্ণ রূপে আমার।[৯৫]

সহযোগীর অবস্থান থেকে ত্রিশের দশকে বিপ্লবী দলে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগ্রহণের অবস্থানে নিয়ে আসেন নিজদের যোগ্যতা প্রমাণের মধ্যদিয়ে। তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্বও তাঁরা পালন করেন। কল্পনা দত্ত প্রয়োজনীয় এসিড নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করেন অন্যান্য জেলার মেয়ে বিপ্লবীদের সাহায্যে।[৯৬] কল্পনা দত্ত এসিড সংগ্রহ করে বোতলগুলো গুছিয়ে দিতেন ট্রাঙ্কে, সেই ট্রাঙ্ক অমিতা সেন ও নলীনি পাল ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে পৌছে দিতেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কাছে।[৯৭]

বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে বাংলার মেয়েরা তাঁদের অলঙ্কার তুলে দিয়েছেন নেতাদের হাতে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই। গান্ধী প্রবর্তীত অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময়েও এ ধারা অব্যাহত থাকে। ত্রিশের দশকে বিপ্লবী দলে অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় দলের প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বহু মেয়ে। কমলা দাশগুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেবার পরে 'দাদা' দের নির্দেশমতো নিজ খরচ চালানোর জন্য দুটো টিউশনি যোগাড় করেন।[৯৮] বীনা দাস দলের জন্য টাকা উপার্জন করার জন্য প্রথমে পত্রিকায় লেখালেখির কাজকে বেছে নেন। তাতে টাকা পাওয়া না গেলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে লটারীর টিকিট বিক্রর কাজ নেন। এতে কিছু কমিশন পান তবে তা ছিল খুবই সামান্য, এরপরও নিজ রোজগারের টাকা দলকে দেবার 'বাতিক' না কমাতে তিনিও টিউশনি গ্রহণ করেন।[৯৯] বীনা দাসের ভাষায়, ''সে সময় অবশ্যি আমার মতো এরকম পাগলামি দলের প্রায় সকলেরই ছিল।''[১০০] চট্টগ্রামের ইন্দুমতি সিংহ ছিলেন বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বড় বোন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর যে সব বিপ্লবীরা বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের মামলার খরচ যোগানোর জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ইন্দুমতি সিংহ। কমলা দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন, ''মহিলা হয়েও এবং ইংরেজি না জানা সত্ত্বেও তিনি যে কর্মদক্ষতা দেখিয়েছিলেন তা বিস্ময়ের সঞ্চার করে। কোথাও হিন্দিতে, কোথাও বাংলায় কথা বলে তিনি অদ্ভুত প্রেরণা এনে ফেলতেন দাতার হৃদয়ে।''[১০১] অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে তিনি বাঙলার বাইরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করেন। তিনি লালবাজারে গিয়ে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে তাদের মধ্যে সহানুভূতি জাগিয়ে তাদের কাছ থেকেও অর্থ সংগ্রহ করেন, আবার এলাহাবাদে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে জওহরলাল নেহেরুর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন।[১০২] চট্টগ্রামের বন্দী বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনার অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতার বিমলপ্রতিভা ব্যানার্জি জালালাবাদ পাহাড়ে নিহত শহীদদের ছবি বিক্রি করতেন এবং এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের হাতে তুলে দেন।[১০৩] বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের মীরা দত্তগুপ্ত কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজের মহিলা বিভাগের উপাধ্যাক্ষের পদ গ্রহণ করেন এবং বিপ্লবীদের প্রয়োজনে মাইনের সম্পূর্ণ টাকাটা দলকে দিয়ে দিতেন।[১০৪] এভাবে বিপ্লবী দল বাঙালি নারীকে অর্থ উপার্জন করা এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল না হবার শিক্ষা দিয়েছে।

তিরিশের দশকে বিপ্লবী নারীর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে সরাসরি বৃটিশ প্রশাসনের উপর আক্রমণ। ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে কুমিল্লায় ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্স নিহত হন দু'জন স্কুল ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর গুলিতে। এর দুইমাস পরে ১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন-এ বাংলার গর্ভনর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন বীনা দাস। গভর্নর নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হন। বৃটিশ প্রশাসনের উপর সবচাইতে বড় আঘাতটি আসে চট্টগ্রামে। অবিভক্ত বাংলায় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সবচাইতে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করেন। মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও চট্টগ্রাম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ, জালালাবাদ সংঘর্ষ ও ধলঘাট সংঘর্ষের পর ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, চট্টগ্রাম পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাবে বিপ্লবীরা সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। ক্লাবটির প্রবেশদ্বারে লেখা ছিলো ***কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ,*** আর এধরনের একটি ক্লাব বৃটিশবিরোধী বিপ্লবীদের লক্ষ্যবস্তু হবে সেটি খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এর পূর্বে দু'বার এই ক্লাবটি আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রথমবার ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল। যেদিন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার বিপ্লবীরা লুঠ করেছিলেন সেদিন তাদের লক্ষ্যবস্তুর তালিকায় ক্লাবটি থাকলেও যখন তারা সেখানে পৌছান তখন সেটি ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় বিপ্লবীরা ফিরে আসেন। দ্বিতীয়বার ১৯৩২-এর ১০ আগস্ট পুনরায় ক্লাবটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এবার যে দলটিকে পাঠান হয় তার নেতা হিসেবে বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এবারও বিপ্লবীরা ব্যর্থ হয় এবং ব্যর্থতার দায় নিয়ে দলনেতা শৈলেশ্বর চক্রবর্তী আত্মহত্যা করেন।[১০৫] তৃতীয়বার অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ আক্রমণটি সফল হয় এবং পুরো দলকে নিরাপদে চলে যাবার সুযোগ করে দিয়ে দলের নেতা নিজে যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন এবং সঙ্গে রাখা পটাশিয়াম সায়ানাইড সেবনে আত্মদান করেন। এবারের এই আক্রমণের সবচেয়ে বড় অসাধারণত্ব ছিল এর নেতৃত্ব। যে দল এই আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের নেতৃত্বে ছিলেন একজন ২১ বছরের তরুণী। লক্ষণীয় যে, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী ব্যর্থতার অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেন আর এবার সফল এক দলনেত্রী জীবন উৎসর্গ করলেন। সময়ের বিচারে ঘটনাটি অবশ্যই বিশেষত্বের দাবিদার। এই তরুণী বিপ্লবী দলনেত্রীর নাম প্রীতিলতা। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে স্বেচ্ছায় প্রথম জীবন উৎসর্গকরা নারী প্রীতিলতা। তিরিশের দশকে বিপ্লবী দলে মেয়েদের বলিষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা সামগ্রিক নারী আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক একথা স্বীকার করে নিয়ে বলতে হয়, প্রীতিলতা তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীর ভূমিকাকে বিশেষ মাত্রা প্রদান করেছেন। প্রীতিলতার লড়াই ছিল দুই ধারায়, প্রথমত বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে, আর দ্বিতীয়ত একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে। একজন দেশপ্রেমী বিপ্লবী হিসেবে স্বভাবতই তাঁর কাছে দেশের মুক্তি ছিল অগ্রগণ্য, আর এর পেছনে কারণ হিসেবে দেখা যাবে তিনি এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে একটি স্বাধীন দেশ ব্যতীত পরাধীন নারীর মুক্তি সম্ভব নয়। নেতৃত্বে থেকে পাহারতলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে সফল আক্রমণ প্রীতির দেশপ্রেমের স্বাক্ষ্য বহন করে, আরেকদিকে আত্মদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি প্রমাণ করেন নারী পুরুষের চাইতে মানসিক দিক থেকে কোন অংশেই দুর্বল নয়, বরং প্রয়োজনে নিজের জীবনদানের মত সিদ্ধান্ত নিতেও সে সক্ষম। তবে প্রীতিলতার নিজের মনেও হয়তোবা সংশয় ছিল নারীকে হেয়জ্ঞান করা পুরুষসমাজ তাঁর এই সিদ্ধান্ত কতটা মেনে নেবে, তাঁর শেষ বিবৃতিতে নিজের এই সংশয় প্রকাশ করতে দেখা যায় তাকে, "আমি মনে করি যে আমি দেশবাসীর নিকট আমার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যবশত এখনও হয়ত আমার প্রিয় দেশবাসীর মধ্যে অনেকে আছেন যাহারা বলিবেন যে ভারতীয় নারীত্বের উর্ধ্বতন আদর্শে লালিত একটি নারী কী করিয়া নরহত্যার মত এই ভীষণ হিংসা কাজে লিপ্ত হইল।"[১০৬] প্রীতিলতার আশংকা খুব একটা ভুল হয় নি। এমনকি বৃটিশ পুলিশেরাও নির্মল সেন, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রীতিলতার সম্পর্ক নিয়ে কটাক্ষ করেছিল, যার উল্লেখ পাওয়া যাবে মানিনী চ্যাটার্জির **'ডু অর ডাই'** গ্রন্থে। বৃটিশ প্রশাসনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে মানিনী চ্যাটার্জি দেখিয়েছেন বৃটিশ প্রশাসন বিপ্লবী নারীদের প্রতি কতটা অসম্মানসূচক মনমানসিকতা পোষণ করত। বৃটিশ প্রশাসনও বাঙালি নারীর এই নারীসুলভ ভূমিকার বাইরে বেরিয়ে আসাটা মেনে নেয় নি। তাই প্রীতিলতা সম্পর্কে তাদের মন্তব্যকে দেখা যায় নিম্নরূপ

> In his report to the army chief on the Pahartali incident, the brigadier commanding the Presidency and Asam district wrote that Priti Waddadar was `said to have been the lover of Nirmal Sen', the only proof of which was her photograph found in Dhalghat after Nirmal Sen was shot dead.
>
> The chief secretary of Bengal went a nauseating step further. In the fortnightly report to London, he wrote that Pritilata `had been closely associated with, if not actually the mistress of, the terrorist Biswas who was hanged for the murder of Inspector Tarini Mukherjee, and some reports indicate that she was the wife of Nirmal Sen who was killed while attempting to evade arrest at Dhalghat, where Captain Cameron fell.[১০৭]

এধরনের উক্তির পাশাপাশি প্রীতিলতা যে বৃটিশ প্রশাসনের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিলেন সেটির প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁকে ধরিয়ে দেবার বিনিময়ে পুরস্কার ঘোষণার মধ্যদিয়ে, একই সঙ্গে প্রীতিলতা প্রসঙ্গে বৃটিশ পুলিশের

Dhaka University Institutional Repository

ভীতির অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সম্পর্কে করা অবমাননাকর উক্তির মধ্যদিয়ে। ১৯৩১-এর জুনে ধলঘাট যুদ্ধের পর পলাতক প্রীতিকে ধরিয়ে দেবার জন্য ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে বৃটিশ পুলিশের বেঙ্গল ক্রিমিনাল ইন্টিলিজেন্স-এর গেজেটে যে লুকআউট ওয়ারেন্ট বের হয়েছিল তাতে প্রীতিলতার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছিল সেটি ছিল : "Description : Miss Priti Waddadar, daughter of Jagabandhu Waddadar (Baidya by caste), of Dhalghat, Patiya and Jamalkhana, Chittagong town : age 20/21 (looks younger than her age); dark; medium build; short ugly in appearance."[১০৮] এই বর্ণনা কেবল উপনিবেশিক মানসিকতার চরম বহিঃপ্রকাশই ঘটায় না বরং চিরন্তন পিতৃতান্ত্রিক মনমানসিকতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তিরিশের দশকে বিপ্লবী মেয়েরা এই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতাকে অস্বীকার করে এগিয়ে আসেন। কল্পনা দত্ত স্বীকার করেন

> সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অনেক ছেলে ফাঁসিতে গেছে, মরেছে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষের কথাও শোনা গেছে অনেক। কিন্তু এই আন্দোলনে মেয়েদের স্থান ছিল না এতদিন, নেতারা তাঁদের বিশ্বাস করতেন না। ১৯৩০ সালের মেয়েরা কিছু কিছু এর ভিতরে এলেও প্রত্যক্ষ কাজে মেয়েরা নেমেছে খুব কমই। প্রীতি ওয়াদ্দাদারের মৃত্যুতে জনসাধারণ দেখল মেয়েরাও এসব কাজে পিছিয়ে থাকে না। আত্মদানে ছেলেদের থেকে তারাও কিছু কম নয়।[১০৯]

ইতিহাসবিদ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রীতিলতার মূল্যায়নে বলেছেন

> যে কর্মে প্রীতিলতার মূল্যায়ন আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তার সূচনা, নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক পরিচালনা তো ছিল পুরুষপ্রধান। এ কর্মে একজন নারীর প্রবেশ ছিল অংশীদারিত্বের সম্প্রসারণ হিসেবে, এবং তা-ও আবার পুরুষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচলিত নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম করে।...প্রীতিলতার কৃতিত্ব যে, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে তিনি দুঃখজনক সংক্ষিপ্ত জীবনে পুরুষ-প্রাধান্যের দেয়াল ভেঙেছিলেন; এবং পুরুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা তাঁর আগ্রহ ও অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে নতি স্বীকার করে তাদের তৈরি করা নিয়ম শিথিল করার অনিবার্যতাকে এড়াতে পারেন নি।[১১০]

মূল্যায়নের সারমর্ম হিসেবে তিনি বলেছেন, প্রীতিলতা তাঁর স্বল্পদৈর্ঘের জীবনেই নারী পুরুষের সমকক্ষতা প্রমাণে সমর্থ হন এবং মুক্ত নারীর কৃতিত্ব অর্জন করেন। তবে কেবল প্রীতিলতাই নন, প্রত্যক্ষ অংশগ্রণের মাধ্যমে এই পর্বে বিপ্লবী দলের সদস্য বাঙালি নারীরা সমাজের সামনে তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয় বা মুক্তনারীর পরিচয় তুলে ধরে, একথাটি সন্দোহীতভাবে বলা চলে। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এবং নারী বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই কারাবন্দী হন। এসময়ে বাংলার বিপ্লবযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। কারাজীবন শেষে বিপ্লবীদের একটি বড় অংশ যোগদেয় বামপন্থী দলে।

(৩)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯১৭-এ রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই দুই ঘটনার প্রভাবে ১৯২৫ এ ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়।[১১১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপায়। যুদ্ধোত্তর শুরু হয় চরম অর্থনৈতিক সংকট। ফলে একদিকে জনগণের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়তে থাকে, অপরপক্ষে শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত শ্রমিকআন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ১৯১৭-এর অক্টোবরে রাশিয়ায় ঘটে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মনি সিংহ অভিমত পোষণ করেন যে, ''এই বিপ্লব যে শুধু রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের মুক্তি আনল তা-ই নয়, এই মহান বিপ্লব দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত বঞ্চিত ও পরাধীন জাতির মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও এই বিপ্লব রেখাপাত করে।''[১১২] ১৯২৫-এ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৪২-এর মার্চ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও ত্রিশের দশক থেকে ভারতব্যাপী গণসংগঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। আইন অমান্য আন্দোলন এবং বিপ্লবপন্থার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিও বাঙালি নারী আকৃষ্ট হতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নারীকে অনুপ্রাণিত করার একটি কারণ ছিল সমাজতন্ত্র যে জণগণের সাম্য ও মুক্তির কথা বলত, তাতে নারীসমাজের মুক্তির কথাও বলা হত। এই মুক্তির লক্ষ বাঙালি নারীসমাজকে আকৃষ্ট করে। ১৯২১-এ লেনিন নারীদের উদ্দেশে একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বলেন, ''পৃথিবীর কোন দেশের কোন পার্টি অথবা কোন বিপ্লব যা সম্ভব করতে সাহস হয় নি সেই কাজটি করেছে সোভিয়েতের বলশেভিক বিপ্লব। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অসাম্যের পুরোপুরি মূলোচ্ছেদ ও নারীসমাজের উপর নিপীড়ণ চিরতরে বন্ধ করেছে এই বিপ্লব।''[১১৩] সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সত্যিকারের নারীমুক্তি সম্ভব হবে এই লক্ষে কমিউনিজমের প্রতি নারীসমাজের আগ্রহ তৈরি হয়। রেনু রায় (চক্রবর্তী) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, '' . . . এসব থেকে আমার ধারণা হোল, যদি নারীসমাজকে সত্যকারের মুক্তির মধ্যে বিকশিত করতে হয়, তবে তাদের সাম্রাজ্যবাদের বন্দীদশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল করতে হবে, এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।''[১১৪] হেনা দাস উল্লেখ করেছেন

> ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সাথে সাথে রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা একটি সুস্পষ্ট মতাদর্শ গ্রহণের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই মতাদর্শ বা মতবাদ হচ্ছে কমিউনিষ্ট মতবাদ অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। মার্কসীয় পাঠচক্রের সাথে সেজ'দা আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করে দিয়েছিল। আমরা নিয়মিত ঐ পাঠচক্রে গিয়ে ক্লাস করতাম। . . . বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে নানা বইপত্রও পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। সোভিয়েত নয়া সমাজব্যাবস্থা বিশেষভাবে সেখানকার নারীসমাজের মুক্তি ও অগ্রগতির কাহিনী আমাদের মুগ্ধ করেছিল।[১১৫]

রাজনীতির মধ্যদিয়ে নারীমুক্তির যে আদর্শটি কংগ্রেস প্রবর্তিত রাজনৈতিক আন্দোলনে অনুপস্থিত ছিল, কমিউনিষ্ট দল বাঙালি নারীর সামনে সেই আদর্শ নিয়ে আসে। মধ্য-ত্রিশ থেকে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যেসব মেয়ে সরাসরি যোগদেয়, তাঁরা অনেকেই জাতীয়তাবাদী পারিবারিক ঐতিহ্যে বড় হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে সক্রিয়ভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। যারা ত্রিশের দশকের শুরুতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন এবং কারাবরণ করেছেন তাঁদের একটি অংশও কারাপরবর্তী জীবনে সাম্যবাদী মতাদর্শ গ্রহণ করেন। প্রথম পর্যায়ে স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে নারীরা কমিউনিজম এ দীক্ষিত হতে থাকেন পরবর্তী সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম নারী সদস্যপদ লাভ করেন লতিকা সেন(১৯৩৬-এ)। এছাড়াও যাঁরা প্রথম পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

(ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে) বামপন্থী দলে যোগদেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমলা চ্যাটার্জি, মনিকুন্তলা সেন, কল্পনা দত্ত (যোশী), ইন্দুসুধা ঘোষ, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী প্রমুখ।[১১৬] বিপ্লববাদ শেষ হবার পর বাংলার তরুণসমাজ সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হয় এবং সমাজতান্ত্রিক দলেও ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। তবে শিক্ষিত নারীরা এবং ছাত্রীরা ব্যতীত সাধারণ নারীদের মধ্য থেকেও কারো কারো মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিস্তার লাভ করে। বরিশালের মনোরমা বসু মাসিমা তাঁর কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান প্রসঙ্গে বলেন

> ১৯৩২/৩৩ সাল। বরিশালের কমিউনিষ্ট কর্মী অমৃত নাগ আমার আত্মীয়। সেই সুবাদে মাঝে মাঝেই আসে আমার বড়িতে। তার সঙ্গে অনেক কথা হয়। রাজনীতি আলোচনাও হয়। . . . আমি জমিদার বাড়ির বউ। কিন্তু জমিদারী চালচলন আমার কোনদিনই পছন্দ হত না। দেখতাম নায়েব গোমস্তরা কৃষকের উপর জোর জুলুম করে, অত্যাচার করে। দেখতাম কৃষকের পরিবারের অসহ্য দুঃখ কষ্ট। সবসময় এটা আমার বড় বেশি করে মনে হত। এতদিনের রাজনৈতিক জীবনে এদের দুঃখের কোন সমাধান পেলাম না। এই সময় মাঝে মাঝেই অমৃত নাগের সঙ্গে এদের দুঃখের কথা আলোচনা হত। সে আমায় বোঝাতো কমিউনিষ্টদের কাজকর্ম, আদর্শের কথা। শুনতে শুনতে মনে হত এই বোধহয় পথ। এক বছর দুবছরে নয়, বই পড়েও নয়, নিজের কর্মীজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে কবে যে কমিউনিষ্ট হয়ে গেলাম। অত গুছিয়ে বলতে পারবো না। পার্টির সব মিটিং'এ যাই। মুকুল সেনকে জিজ্ঞাসা করি 'আচ্ছা আমায় কেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী করে নেও না?' সে বলে কিনা আমি তো আজীবন পার্টির সর্বক্ষণেরই কর্মী।[১১৭]

তবে ছাত্র এবং তরুণসমাজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই পর্যায়ের তরুণদের মধ্যে কংগ্রেসের নরমপন্থী নীতিবিরোধী মনোভাবও প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়। এই নতুন মতাদর্শ নিয়ে ১৯৩৬ সালে তরু সমাজ গড়ে তোলে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন। যাদের নেতৃত্বে ১৯৩৮-এ শুরু হয় রাজবন্দীদের মুক্তি ও আন্দামানের বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার আন্দোলন। এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করার সাথে সাথে ছাত্রীরাও ছাত্রদের ডাকা মিছিল, সভা সমিতিতে যোগ দিতে লাগল। এই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ অনুসারী ছাত্রীরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের সমান সুযোগ-সুবিধা ও মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্র ও ঘরের গণ্ডির বাইরে এসে কাজ করার ক্ষেত্রে গোড়া রক্ষণশীল সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে।[১১৮] ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত মেয়েরা ছাত্রীদের পৃথক একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত হয় গার্লস স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন। কমিউনিষ্ট পার্টির কনক দাশগুপ্ত, শান্তি সরকার, কল্যাণী মুখার্জি, চিনু ঘোষ, প্রীতি লাহিড়ী, লেবার পার্টির উমা ঘোষ, গীতা ব্যানার্জি, কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টির অনিমা ব্যানার্জি, রায়বাদী পার্টির শোভা মজুমদার-কে নিয়ে প্রথম গার্লস স্টুডেন্টস কমিটি গঠিত হয় এবং কনক

Dhaka University Institutional Repository

দাশগুপ্ত তার প্রথম সম্পাদিকা হন।[১১৯] ছাত্র ফেডারেশন ১৯৪০-এ লক্ষ্ণৌতে একটি সর্বভারতীয় ছাত্রী সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরোজিনী নাইডু এবং সভানেত্রী হন রেনু রায় (চক্রবর্তী। এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, এখানে কেবল ছাত্রীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয় নি, সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য, বিয়ে ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সর্বক্ষেত্রে নারীর আইনগত সমান অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয় এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১২০] সরোজীনি নাইডু তাঁর ভাষণে বলেন, ''দেশের ভবিষ্যৎ তোমাদেরই হাতে, যদি তোমরা গৃহাভ্যন্তরের একঘেয়েমি অলসতায় জীবনের অপচয় না করো।''[১২১] কাজেই সাম্যবাদী আদর্শ তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যে গণআন্দোলন শুরু করে তাতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি যেমন ব্যাপক হারে হয়, তেমন এই আন্দোলন দেশমুক্তির পাশাপাশি নারীমুক্তির ধারণাটিও প্রসার ঘটাতে শুরু করে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত নারীরা নারীদের কল্যাণের কথা ভাবতে শুরু করে। এই সময়ে মনোরমা বসু মাসিমা বরিশালে পতিত মেয়েদের জন্য গড়ে তোলেন মাতৃমন্দির, যার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন

> আমার মনে মনে ইচ্ছে মেয়েদের নিয়ে একটা কিছু করি। অনেকের সঙ্গে কথা বলে গরীব মেয়েদের জন্য আমার বাড়ির বারান্দায় বিনা মাইনের স্কুল খুললাম। কেউ কি মেয়ে দিতে চায়? বোঝাই জোর করে। ২৫/৩০ জন নিয়ে স্কুল শুরু করি। স্নেহলতা দাস রাজি হলেন স্কুলের দায়িত্ব নিতে। অনেক লোকের উৎসাহ ও সমর্থন পাচ্ছি। এবার স্কুল বাড়ি করতে হবে। . . . একই সময় গড়ে তুললাম 'মাতৃমন্দির' আসত সব সমাজে পতিত মেয়েরা। বড় কষ্ট হত তাদের জন্য। অনেকের তো কোন দোষই নেই, যাদের দোষ আছে তাদেরও তো বাঁচতে হবে। তাদের তাঁত, সেলাই এইসব কাজ শেখানো হত। কত মেয়ের চোখের জল যে এইভাবে মুছিয়েছি ইয়াত্তা নেই। নিজেকে খুঁজে পেলাম এই কাজের মধ্যে।[১২২]

এভাবে তিরিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক দলে নারীর অন্তর্ভুক্তি নারীর জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে পরবর্তী দশকে প্রান্তিক নারীর কাছে নারীমুক্তির বার্তা বহন করে নিয়ে যায়।

(৪)

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের বৃটিশ প্রশাসনের উপর সরাসরি আক্রমণের দ্বারা ত্রিশের দশক প্রথম থেকেই অবিভক্ত বাংলা রাজনৈতিকক্ষেত্রে অস্থির পরিস্থিতি মোকাবেল করে আসছিল। কংগ্রেস প্রবর্তীত আইন অমান্য আন্দোলন বৃটিশবিরোধী চেতনায় সীমাবদ্ধ ছিল, নারীর অধিকার সম্পর্কিত কোন ভাবনা তাদের ছিল না। বিপ্লবপন্থায় নারী ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে, তবে একদিকে এই পথটি অচিরেই শেষ হয়ে যায়, অপরদিকে বিপ্লবপন্থাটি জনবিচ্ছিন্ন থাকায় এই নারীরা সাধারণ নারীসমাজে তাৎক্ষনিক প্রভাব বিস্তারে সফল হয় নি। বাংলার নারীনেত্রীবৃন্দ নারীবিষয়ে রাজনৈতিক নেতাদের উদাসীনতা লক্ষ্য করে পৃথক মহিলা কংগ্রেস গঠনের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ১৯৩১-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলার সব জেলার কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের কাছে শান্তি দাসের লেখা একটি চিঠি যায় তাদের প্রত্যেক অঞ্চল থেকে

Dhaka University Institutional Repository

দশজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সভায় সমাজসংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশে পাঠানোর জন্য।[১২৩] প্রধানত কংগ্রেসী মহিলাদের নিয়ে গঠিত এক পৃথক সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে এই সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে ১৯৩১ সরলা দেবী চৌধুরানী যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাইলফলক বলা চলে। তিনি বলেন

> . . . this Congress is the expression of the self consciousness of the women in Bengal. . . .. It is the differential treatment meted out to her at different stages of her life that brought this consciousness into being. It was stored up layer after layer in the sub-conscious self of every women and had only to well up into the conscious self some day and bring women together. It was planted as a seeding in her innermost being when as a child she was often deprived by her own mother of many a delicacy reserved for her brothers-members of the superior sex. It germinated in her when as a girl she was denied the opportunities of education and healthy outdoor life granted to her brothers. It grew and grew in her with the growth of her knowledge of social conventions that are antagonistic to her self-evolution, of double standard of morals-one for men and another for women, and of laws of inheritance which leave her economically dependent on men for ever.[১২৪]

তখন দেশ কংগ্রেস আহূত আইন অমান্য আন্দোলনে উত্তাল এবং মেয়েরাও তাতে পিছিয়ে নেই। সরলা দেবী কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বললেন, মেয়েদের জন্য পৃথক কংগ্রেসের প্রয়োজন, কারণ মেয়েদের তো পৃথক ও হীন হিসেবেই দেখা হয়। তিনি অভিযোগ করলেন কংগ্রেস মেয়েদের দিয়ে আইন ভঙ্গ করায়, কিন্তু আইন তৈরির দায়িত্ব তাদের দেয় না। প্রশ্ন তুললেন মদের দোকানের সামনে পিকেটিং হলে বেশ্যালয়ের সামনে হবে না কেন? তাছাড়া দাবি করলেন সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব, পারিশ্রমিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকার এবং সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, যৌন-অপরাধের শাস্তির সুব্যবস্থা ইত্যাদি।[১২৫] এই ভাষণটি এই দশকের সবচাইতে শক্তিশালী নারীবাদী বক্তব্য বলা চলে। তবে দুঃখজনকভাবে সভার অন্যান্য সদস্যরা তাঁর নারীমুক্তির এই চিন্তার সাথে একমত হতে পারে নি। এইসভায় পৃথক মহিলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যেমন গৃহীত হয় নি, তেমন জন্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার সহ নারীর সমঅধিকারের বিষয়সমূহও গৃহীত হয় নি। ১৯৩১-এ সরলা দেবীর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও এই দশকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীনেত্রীবৃন্দের মধ্যে নারীর অধিকার বিষয়ক ভাবনা জাগ্রত হয়। ১৯৩১-এ বোম্বাই শহরে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে একটি সভা ডাকা হয়। বাংলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলা সমিতি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সঙ্গে যোগদান করে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের সাব-কমিটির কাছে স্মারকলিপি পেশ করে, তাতে যেসকল সুপারিশ করা হয় তা হলো

Dhaka University Institutional Repository

(১) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিককে সমান অধিকার ও দায়িত্বভার অর্পণ।

(২) অফিস দফতরে, সাধারণ নিয়োগ ব্যবস্থায়, অধিকারে গৌরবে, জাতি ধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নিয়োগ ব্যবস্থা।

(৩) গণভোট।

(৪) স্ত্রী-পুরুষের সমান দাবির ভিত্তিতে যুক্ত-নির্বাচন।

(৫) মেয়েদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আসন অথবা বিশেষ নমিনেশনের ব্যবস্থা না রাখা।[১২৬]

১৯৩১-৩২-এর নারী-পুরুষের সমঅধিকারের দাবির এই আন্দোলন তাৎক্ষনিকভাবে ব্যর্থ হলেও এই পর্বে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে নারীনেত্রীদের একাংশের মনে নারীর মুক্তি এবং সমঅধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। তাঁদের সমঅধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং ১৯৩৬-এ নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন সমস্ত সভাসমিতিতে জোর প্রচার চালায়–যাতে করে আইনসভায় আনীত সংস্কার বিলগুলি আইনে পরিণত হয়। এই বিলসমূহের মধ্যে ছিল

(১) সম্পত্তিতে হিন্দু মেয়েদের অধিকারের ভিত্তিতে ডাক্তার দেশমুখের হিন্দু আইন সংস্কার বিল।

(২) ডাক্তার বি. দাসের সর্দা আইন সংশোধনী বিল।

(৩) ডাক্তার ভগবান দাসের অসবর্ণ বিবাহ কার্যকরী করার বিল।

(৪) ডঃ হাফিজ আবদাল্লার মুসলিম পার্সোনাল ল' এপ্লিকেশন বিল।[১২৭]

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের আওতায় সমঅধিকার দাবিতে এই আন্দোলন চলমান থাকে, পাশাপাশি মধ্য ত্রিশের দশক থেকে বাংলায় সমাজতান্ত্রিক দলে নারীর অন্তর্ভুক্তির ফলে দেশমুক্তির পাশাপাশি নারীমুক্তির প্রশ্নটি রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত নারীদের সামনে চলে আসে এবং পরবর্তী দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও বাংলায় ১৯৪২-এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আন্দোলন ও নারীমুক্তি আন্দোলন সমান্তরালভাবে প্রভাহিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলন বাঙালি নারীর জন্য বাইরের জগতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণের মধ্যদিয়ে বাঙালি মেয়েরা কেবল জনপরিমণ্ডলে ব্যপকহারে অংশগ্রহণ করলো না, তারা বাঙালি নারীর ঐতিহ্যিক, প্রথাসিদ্ধ ভূমিকাকে অস্বীকার করতে শুরু করে। আর এই অস্বীকার করবার মধ্যদিয়েই তারা সমাজে নারীর নতুন ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করে। একই সাথে বিপ্লবী দলে এবং মধ্য তিরিশের দশক থেকে সমাজতান্ত্রিক দলে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই মেয়েদের ঘরের দেয়ালের অন্তরাল ঘুচিয়ে দেয় এবং ক্রমশ মেয়েদের জন্য বাইরের জগতের পরিচিত নিষেধের ঘেরাটোপগুলিও বিলুপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

হতে থাকে। চল্লিশের দশকে উপনিবেশিক শাসনমুক্ত হবার সময় পর্যন্ত এই নব্যদর্শনে দীক্ষিত নারীই বাঙালি নারীকে মুক্তির পথ দেখায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. বসু, 'বাঙলার নারী-আন্দোলন', পৃ. ৩২৮
২. Forbes, ***Women in Colonial India***, p. 135
৩. ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'গান্ধীজীর আন্দোলনে নারী', মহাশ্বেতা দেবী (সম্পাদিত), *অপরাজেয়া*, (কলকাতা: ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৯৫), পৃ. ৩৬
৪. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ৩১-৩২
৫. Visram, ***Women in India and Pakistan***, p. 27
৬. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ৩৩
৭. সেন, *সেকালের কথা*, পৃ. ২১
৮. বসু, 'বাঙলার নারী-আন্দোলন', পৃ. ৩২৮
৯. Engels, ***Beyond Purdah?***, p. 31
১০. Kaur, ***Women In India's Freedom Struggle***, p. 170
১১. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ৩৩
১২. উদ্ধৃত : Kaur, ***Women In India's Freedom Struggle***, p. 170
১৩. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ৭৯
১৪. ঐ
১৫. Forbes, ***Women in Colonial India***, p. 137
১৬. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ৭৯
১৭. ঐ, পৃ. ৮০
১৮. বসু, 'বাঙলার নারী-আন্দোলন', পৃ. ৩২৭
১৯. Engels, ***Beyond Purdah?***, p. 1
২০. ঐ
২১. সিংহ, *বিস্মৃত বীরাঙ্গনা ইন্দুমতি*, পৃ. ১৩
২২. ঐ
২৩. ঐ, পৃ. ১৪-১৫
২৪. Kaur, ***Women In India's Freedom Struggle***, p. 169
২৫. Engels, ***Beyond Purdah?***, p. 33
২৬. ঐ
২৭. ঐ
২৮. ঐ
২৯. ঐ, পৃ. ৩৪
৩০. ঐ
৩১. ঐ
৩২. ঐ
৩৩. বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, পৃ. ৩৩
৩৪. Engels, ***Beyond Purdah?***, p. 34
৩৫. কমলা মুখোপাধ্যায়, 'জেলে আমার সঙ্গীগণ : ১৯৩১-৩৭', মন্ডল, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গণা* , পৃ. ৩৭
৩৬. দাস, *শৃঙ্খল ঝঙ্কার*, পৃ. ৩০
৩৭. Suruchi Thapar-BjÖrkert, ***Women In the Indian National Movement: Unseen Faces and Unheard Voices (1930-42)***, (New Delhi: SAGE Publications, 2006) p. 142
৩৮. দাস, *শৃঙ্খল ঝঙ্কার*, পৃ. ৩০
৩৯. শান্তিসুধা ঘোষ, *জীবনের রঙ্গমঞ্চে*, (কলকাতা: জয়শ্রী প্রকাশন, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৬০
৪০. মুখোপাধ্যায়, 'জেলে আমার সঙ্গীগণ : ১৯৩১-৩৭', পৃ. ৪৭
৪১. দাশগুপ্ত, *রক্তের অক্ষরে*, পৃ. ৭৫
৪২. ঐ, পৃ. ৮০
৪৩. দাস, *শৃঙ্খল ঝঙ্কার*, পৃ. ৩৮
৪৪. মুখোপাধ্যায়, 'জেলে আমার সঙ্গীগণ : ১৯৩১-৩৭', পৃ. ৪৬
৪৫. দাস, *শৃঙ্খল ঝঙ্কার*, পৃ. ৩৩-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. মুখোপাধ্যায়, 'জেলে আমার সঙ্গীগণ : ১৯৩১-৩৭', পৃ. ৪৫
৪৭. Thapar-Björkert, ***Women In the Indian National Movement***, p. 141
৪৮. জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, অপ্রকাশিত ডায়েরি
৪৯. ঐ
৫০. ঐ
৫১. ঐ
৫২. মোহাম্মদ মোদাব্বের, ***ইতিহাস কথা কয়***, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১), পৃ. ৭৪
৫৩. জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, অপ্রকাশিত ডায়েরি
৫৪. ঐ
৫৫. ঐ
৫৬. মোদাব্বের, ***ইতিহাস কথা কয়***, পৃ. ৭৩
৫৭. হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী***, পৃ. ২০৪
৫৮. দাশগুপ্ত, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী***, পৃ. ২৭১
৫৯. মোহাম্মদ, ***জোবায়দা খাতুন চৌধুরী: সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য***, পৃ. ২৫
৬০. ঐ, পৃ. ২৪
৬১. ঐ
৬২. জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, অপ্রকাশিত ডায়েরি
৬৩. ঐ
৬৪. ঐ
৬৫. মোহাম্মদ, ***জোবায়দা খাতুন চৌধুরী: সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য***, পৃ. ২৭
৬৬. হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী***, পৃ. ২০০
৬৭. মোহাম্মদ, ***জোবায়দা খাতুন চৌধুরী: সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য***, পৃ. ২৮
৬৮. হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী***, পৃ. ২০৩
৬৯. মোদাব্বের, ***ইতিহাস কথা কয়***, পৃ. ৩৭
৭০. ঐ, পৃ. ৪৭
৭১. গোলাম কিবরিয়া পিনু, ***দৌলতননেছা খাতুন***, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১৫
৭২. মফিদুল হক, 'দৌলতননেছা খাতুন: ইতিহাসে উপেক্ষিতা', হক, ***নারীমুক্তির পথিকৃৎ***, পৃ. ১০০
৭৩. হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী***, পৃ. ২০১
৭৪. ঐ
৭৫. পিনু, ***দৌলতননেছা খাতুন***, পৃ. ১৬
৭৬. হোসেন, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী***, পৃ. ২০১
৭৭. ঐ
৭৮. দাশগুপ্ত, ***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী***, পৃ. ২৭১
৭৯. ঐ
৮০. Forbes, ***Women in Colonial India***, p. 135
৮১. ছবি বসু, 'বাঙলার নারী-আন্দোলন', পৃ. ৩২৯
৮২. ঐ, পৃ. ৩৩৪
৮৩. Forbes, ***Women in Colonial India***, p. 137-38
৮৪. দাস, ***শৃঙ্খল ঝঙ্কার***, পৃ. ২৫-২৬
৮৫. দাশগুপ্ত, ***রক্তের অক্ষরে***, পৃ. ১৭
৮৬. ঐ
৮৭. মন্ডল, ***ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গণা***, পৃ. ২৬
৮৮. ঐ, পৃ. ২৮
৮৯. ঘোষ, ***জীবনের রঙ্গমঞ্চে***, পৃ. ৪৪
৯০. মন্ডল, ***ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গণা***, পৃ. ২৮
৯১. ঐ
৯২. দাশগুপ্ত, ***রক্তের অক্ষরে***, পৃ. ২৩
৯৩. মুখোপাধ্যায়, 'জেলে আমার সঙ্গীগণ : ১৯৩১-৩৭', পৃ. ৩৯
৯৪. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. কল্পনা যোশী (দত্ত), *চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান*, (নতুন দিল্লী: প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, ১৯৯০), পৃ. ৫৩-৫৪
৯৬. ঐ, পৃ. ৫৪
৯৭. মন্ডল, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গণা*, পৃ. ২১
৯৮. দাশগুপ্ত,*রক্তের অক্ষরে*, পৃ. ২১
৯৯. দাস, *শৃঙ্খল ঝঙ্কার*, পৃ. ২০
১০০. ঐ
১০১. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ১৫০
১০২. মন্ডল, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গণা*, পৃ. ২৩
১০৩. ঐ
১০৪. ঐ, পৃ. ২৪
১০৫. পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থ হবার পর অভিযানের নেতা শৈলেশ্বর চক্রবর্তী আত্মহত্যার পূর্বে নেতা সূর্য সেনকে যে চিঠি লেখেন তা ছিল, "মাস্টারদা, আপনার অযোগ্য ও অক্ষম শিষ্য জন্মের তরে বিদায় লইতেছে। যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা সমাপন করিতে পারি নাই। ব্যর্থতার গ্লানি ও পরাজয়ের কলঙ্ক মাখানো আপনাকে এই মুখ কি করিয়া দেখাইবো? আপনার কৃতী সহকর্মীদের পাশে এই অকৃতী অক্ষমের অবস্থান মানায় না। তাই আজ জন্মের মতো যাই। ইতি– আপনার অযোগ্য শিষ্য– শৈলেশ্বর।" তথ্যসূত্র: মহম্মদ সেলিম (সম্পাদিত), *মাস্টারদা সূর্য সেন ও বাংলার যুবসমাজ*, (কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০৬), পৃ. ১২৮
১০৬. সেলিম (সম্পাদিত), *মাস্টারদা সূর্য সেন ও বাংলার যুবসমাজ*, পৃ. ১৬১
১০৭. Manini Chatterjee, *Do and Die: The Chittagong Uprising : 1930-34*, (New Delhi: Penguin Books India, 1999), p. 288
১০৮. Bengal Criminal Intelligence Gazette, July 22, 1932, তথ্যসূত্র: কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ম
১০৯. কল্পনা দত্ত (যোশী), প্রীতি ওয়াদ্দাদার, *শহীদ প্রতীলতা ওয়াদ্দেদার স্মারক বক্তৃতামালা-১*, (কলকাতা: মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), পৃ. ৬০
১১০. ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার : অনুভবে ও সমীক্ষণে', উইমেন এ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত, "প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মারক বক্তৃতামালা অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭
১১১. ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে কানপুরে কমিউনিষ্ট ভাবাপন্নদের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনফারেন্স থেকে ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। তথ্যসূত্র: মনি সিংহ, *জীবন-সংগ্রাম*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ: ২৪
১১২. সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, পৃ. ২৩
১১৩. রেনু চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা ১৯৪০-৫০*, (কলকাতা: মনীষা, ১৯৮০), পৃ. ৩
১১৪. ঐ, পৃ. ৭
১১৫. হেনা দাস, *স্মৃতিময় দিনগুলো*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ২৩-২৪
১১৬. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৯৩) পৃ. ২১
১১৭. বসু, *আত্মস্মৃতিকথা*, পৃ. ১০৯
১১৮. মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, পৃ. ২২
১১৯. ঐ, পৃ. ২২
১২০. ঐ, পৃ. ২৪
১২১. চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা ১৯৪০-৫০*, পৃ. ১১
১২২. বসু, *আত্মস্মৃতিকথা*, পৃ. ১০৯
১২৩. Forbes, ***Women in Colonial India***, p. 140
১২৪. Southard, ***The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal***, p. 1
১২৫. Forbes, ***Women in Colonial India***, p. 140
১২৬. বসু, 'বাঙলার নারী-আন্দোলন', পৃ. ৩৩৮
১২৭. ঐ, পৃ. ৩৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায় : প্রান্তিক ও শ্রমজীবি নারী-চেতনার উন্মেষ ১৯৪০-৪৭

১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ভারতীয় রাজনীতির পটপরিবর্তন করে। অবিভক্ত বাংলাতে এসময়ে কংগ্রেসের নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতবিরোধকে কেন্দ্র করে ভাঙন ধরে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪১-এর জুনে হিটলার বাহিনী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে সমাজতান্ত্রিক দল ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে এবং কমিউনিষ্ট পার্টির এই ভূমিকার ফলে ১৯৪২-এ বৃটিশ সরকার কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে কমিউনিষ্ট দল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৪৭-এর আগস্টে উপনিবেশিক শাসনমুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে এই সমাজতান্ত্রিক দল এবং এর মহিলা সদস্যবৃন্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মূলত উপনিবেশিক শাসনমুক্ত হবার এই চূড়ান্ত পর্যায়টি কৃষক-শ্রমিকসহ শ্রমজীবিদের শোষণের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের পর্বও বলা যায়। এই শ্রমজীবি সমাজের অংশ হিসেবে নারীরাও শ্রেণি শোষণ এবং তাদের অধিকারের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশ হিসেবে নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত এ সময়ে হয়।

১৯৩৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। একই দিনে উপনিবেশিক প্রশাসন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা না করেই যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়। মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু এবং কংগ্রেসের সমমনা নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধে যোগদানের বিরোধিতা করেন। সেপ্টেম্বর-১৯৩৯-এ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভায় ঘোষণা করা হলো, ". . . the issue of war and peace for India must be decided by the Indian people."[১] তবে নেতৃবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারত বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করতে প্রস্তুত যদি বৃটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করার প্রতিজ্ঞা করে।[২] বৃটেন সরকার এ প্রস্তাবকে মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় গান্ধীজী 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' আন্দোলন শুরু করেন। অক্টোবর ১৯৪০ থেকে ডিসেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত এক বছরব্যাপী এই আন্দোলন চলার পর গান্ধীজী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ৮ আগস্ট ১৯৪২-এ কংগ্রেস-এর বোম্বে অধিবেশনে বৃটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পাশ হয়। অধিবেশনে গান্ধীজী তাঁর ভাষণ শেষ করেন এই বলে, "The Congress will do or die . . . I shall make every effort to see the Viceroy or address a letter to him and wait for his reply before starting the struggle. It may take a week or a fortnight or three weeks."[৩] অধিবেশনের পরদিন গান্ধীজী গ্রেফতার হলে তাঁর *ডু অর ডাই* বাণীর ভিত্তিতে উপনিবেশবিরোধী *ভারত ছাড়* আন্দোলন বা *আগস্ট বিপ্লব* শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অবিভক্ত বাংলায় ইতোমধ্যে কংগ্রেসে ভাঙন ধরে, যার সূত্রপাত হয় ১৯৩৯-এ। ঐবছর কংগ্রেসের ত্রিপুরা অধিবেশনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন গান্ধীজী প্রস্তাবিত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে। গান্ধীজী এতে অসন্তুষ্ট হলেন, ফলে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন। ১৯৪০-এ এই মতবিরোধ চরমাকার ধারণ করে। নেতাজী বৃটিশ সরকারকে ৬ মাসের সময় নির্দিষ্ট করে দিতে চাইলেন, এই সময়ের মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা না দিলে দেশব্যাপী গণসংগ্রাম আরম্ভ করার পক্ষে তিনি মতপ্রকাশ করেন। বিপরীতে গান্ধীবাদীদের দাবি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রে দেশীয় রাজাদের সঙ্গে একত্রে ফেডারেশন গঠন।[৪] সুভাষচন্দ্র তাঁর মতের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকলে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করা হয়।[৫] সুভাষচন্দ্র যেহেতু ছিলেন বাংলার নেতা, স্বাভাবিকভাবেই বাংলায় কংগ্রেস ভেঙে গেল। কেন্দ্র থেকে এডহক কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হলেও তার পেছনে জনগণের সমর্থন ছিল কম। বাংলায় কংগ্রেসের বিভক্তির ফলে *ভারত ছাড়* আন্দোলনের প্রভাব অন্যান্য প্রদেশের চাইতে ছিল তুলনামূলক কম। মেদেনীপুর ও শান্তিনিকেতনে এর প্রভাব কিছু বেশি দেখা যায়। কলকাতাতে বীনা দাস, কমলা দাসগুপ্ত সহ অনেকে কারাবরণ করলেন, শান্তিনিকেতনে গ্রেফতার হলেন রানী চন্দ, নন্দিতা দেবী। তবে এক্ষেত্রে কংগ্রেস সম্পৃক্ত নারীদের ভূমিকা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত থাকে। মেদেনীপুরের নারীদের একটি বিশেষ ব্যতিক্রমী ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা যায়, ১৯৪৩ সালের ৯ জানুয়ারি মেদেনীপুরের মাণ্ডরিয়া, ডিহিমাণ্ডরিয়া ও চণ্ডীপুর গ্রামে ছয়শত সৈন্য প্রবেশ করে। অন্যন্য নির্যাতনের পাশাপাশি তারা একদিনে ৪৬ জন নারীকে নির্যাতন করে, নারীরা তাদের সম্মান রক্ষার্থে 'ভগিনী সেনা' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে।[৬] এই সংঘের সদস্যাদের অনেকে নিজেদের সম্মান রক্ষা করার জন্য সাথে অস্ত্র রাখত, এদের মধ্যে দু'জনকে ছোরা রাখার অপরাধে অস্ত্র আইনে আটক করা হয়।[৭] এই সংঘের সদস্যা কুমুদিনী ডাকুয়ার স্মৃতিচারণে জানা যায়

> আমাদের শপথ করানো হল। আমাদের উপর যতই অত্যাচার আসুক আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে তার মুকাবিলা করব ও সংগঠনের কোন কিছু প্রকাশ করব না। সেই সঙ্গে আমাদের ছোরা চালানো ও যুযুৎসুর প্যাঁচ শিক্ষা করতে বলা হল। . . . আমাদের দুজনকে নিয়ে শিক্ষা শুরু হল এবং শেখা হলে আমরা অন্যদের শেখাব। বাঁশের বাতার ছোরা দিয়ে শিক্ষা শুরু হল। সেই সঙ্গে সকলকে নিয়ে ক্লাস হতে লাগল কোন সময় ছোরা চালাতে হবে বা যুযুৎসুর প্যাঁচ প্রয়োগ করতে হবে। . . . এরপর আমাদের দুজন করে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হল মেয়েদের উপর অত্যাচার হতে পারে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে সঙ্গে সঙ্গে ছোরা চালানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানাতে। তাতে ছোরার চাহিদা বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত দশহাজার ছোরা বিলি করা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত কলিকাতা থেকে নিয়ে আসা হত পরে দেশীয় কামারদের দিয়ে ছোরা তৈরী হত। ছোরা দিতে না পারায় ফলে মেয়েদের নিজেদের অসহায় মনে হতে লাগল। তখন তাদের শিখিয়ে দেওয়া হল, যদি তারা জানতে পারে যে তাদের গ্রামে পুলিশ আসছে তাহলে শাঁখ বাজিয়ে অথবা ডাকাডাকি করে তারা যাতে একত্রীত হতে পারে তার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে ঝাঁটা, বঁটি, দা যা পাবে নিয়ে আসবে। উভয় শিক্ষা যে কার্যকরী ফল দিয়েছিল তা পরে বলছি।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

আক্রান্ত হয়ে বা আক্রান্ত না হবার উপায় হিসেবে সাধারণ গ্রাম্য নারীদের দ্বারা নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে এধরনের সংগঠন গড়ে তোলা ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং সংগঠনটির কার্যক্রম দেখে বলা যায় যে, বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের পাশাপাশি এই নারীরা পুরুষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের রক্ষা করবার মত মানসিক শক্তিও অর্জন করেছিল।

তবে ইতোমধ্যে বাংলায় দেখা যায় মেয়েরা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, কৃষক শ্রমিক সংগঠনের সদস্যপদ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নেত্রীত্বও অর্জন করে নিয়েছিল। পাশাপাশি বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীরা প্রচারণার কাজে বিভিন্ন অঞ্চলে যাবার ফলে, প্রান্তিক নারীর জীবনচিত্র ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। দেশমুক্তির সাথে সাথে তাঁরা উপলব্ধি করলেন এই নারীদের জন্যও মুক্তি প্রয়োজন। কমলা দাসগুপ্ত ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেসের মহিলাদের সাব কমিটি গঠন করে তাদের সক্রিয় করে তোলা।[৯] এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব। তিনি এই দায়িত্ব পালন করার সাথে সেখানকার নারীদের নিয়েও ভাবতে শিখলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন

> ঘরোয়া বৈঠকে আমি বেশি সুবিধা পেতাম।. . . গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে করতে কত কথাই যে অনুভব করতে হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যের দৈন্য এবং দারিদ্র্য তো সেখানে প্রতিনিয়তই জাগ্রত হয়ে আছে।. . . গ্রামের মেয়েরা একে তো লেখাপড়া জানে না, তাদের মনের স্বাভাবিক গতিকে উর্ধ্বে টেনে তুলবার জন্য নেই শিক্ষা, নেই অনুকূল পরিবেশ, নেই কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা অথচ আছে সংস্কার, আছে সমাজের পীড়নের ভয়। . . . এমনি করে যখনই গ্রামে গ্রামে ঘুরতে গিয়ে নানা সমস্যা জটিল হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, তখনই স্বাধীন ভারতে সেগুলির প্রতিকারের অনিবার্যতা অনুভব করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত তালিকা মনে মনে স্থির হয়ে গেছে।[১০]

কমলা দাশগুপ্তের ভাষ্যে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট, তা হলো, দীর্ঘদিন বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে সম্পৃক্ত এই নারীদের কাছে এই পর্যায়ে এসে স্বাধীনতার অর্থ ছিল উপনিবেশিক শাসকদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা ও স্বাধীন দেশে নারীর জন্য সমঅধিকারের ভিত্তিতে নারীর মুক্তি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী মহিলারাও ইতোমধ্যে সংগঠিত হন বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং নারীমুক্তি বিষয়টি তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। ১৯৪২-এ হিটলার সোভিয়েত আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সমাজতান্ত্রিক দল জার্মান ফ্যাসিবাদী বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে বৃটিশ যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সমর্থন করে, ফলে সমাজতান্ত্রিক দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়। ১৯৪২-এ সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করতে শুরু করলে তাদের কর্মপরিধী বৃদ্ধি পায়। এসময়ে সাম্যবাদী নারীদের কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখা যায় তারা,

প্রথমত: কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শ ও নীতি প্রচার করতেন, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে।

দ্বিতীয়ত: সেই সংকটাপন্ন যুগে নানান সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের মোকাবেলায় নেমেছিলেন তাঁরা, সেও বিশেষত মেয়েদের সংকট মোচনের জন্যই।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ তাঁদের কাজ ছিল মেয়েদের প্রগতিশীল কাজকর্মে আকৃষ্ট করা ও তাদের সংগঠিত করা। উদ্দেশ্যটা তাদের সব কাজের সঙ্গেই ছিল, আবার বিশেষ মনোনিবেশের বিষয়ও ছিল। এজন্য মেয়েদের নিজস্ব সমস্যাগুলি নিয়েও তাঁদের ভাবনা চিন্তা করতে হত। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি গঠনই একটা বড় কাজ ছিল তাদের। সব কাজেই বিশেষ লক্ষ্য ছিল রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের পশ্চাদপদ মেয়েরা ও নিতান্ত গরীব অশিক্ষিত ঘরের মেয়েরা।[১১]

মহিলা নেত্রীদের একটি প্রধান কাজ ছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রচারণা। তাঁরা প্রচার করতেন যে ফ্যাসিদের দ্বারা স্বাধীনতা আসবে না, কেননা ফ্যাসিবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের করালতম রূপ। ফ্যাসিবাদ জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী এবং নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠতার অহম তাদের অস্থিমজ্জায়। তৎকালীন বার্মায় জাপানী আক্রমণের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেয়া হতে লাগল। মহিলা স্বয়ংসেবিকা বাহিনী গড়ে উঠল। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের মহড়াতেও মেয়েরা অংশ নিল। এই সময় মেয়েদের উজ্জীবিত করতে সভায় সভায় শোনানো হত নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত মেয়েদের বীরত্বগাথা। *দেশরক্ষার ডাক* নামে কনক মুখোপাধ্যায়ের রচিত একটি গণসংগীতের সংকলন এসময়ে প্রকাশিত হয়। বিনয় রায় এই গানে সুর দেন। সভায় এই গান গাওয়া হত।[১২] ইতোপূর্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে নারীরা সম্পৃক্ত হয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সাম্যবাদী দলের প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ নেবার ফলে এই পর্যায়ে নারীকেন্দ্রিক বা নারীদের সমস্যা সমাধান রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হয়ে ওঠে।

১৯৪২-এর ১৩ এপ্রিল কলকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টির মহিলা কর্মীদের উদ্যোগে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী হলে মহিলাদের একটি ফ্যাসিবিরোধী সভা ডাকা হয়। এই সভায় সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্যারা ছাড়াও বিভিন্ন দলমত ও নির্দলীয় প্রগতিশীল মহিলারা যোগদান করেন। এই সভা থেকে গঠিত হয় 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন কমিটি'। এর আহ্বায়িকা ছিলেন এলা রীড। কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, সাকিনা বেগম, রেনু চক্রবর্তী, সুধা রায়, মনিকুন্তলা সেন, নাজিমুন্নেসা আহমেদ, বিয়াট্রিস টেরান, অপর্ণা সেন, ফুলরেনু দত্ত (গুহ)।[১৩]

সভায় প্রণতি দে বলেন, চীন ও সোভিয়েত দেশের মেয়েদের মতো ভারতের মেয়েদিগকেও দেশ ও গৃহরক্ষার জন্য পুরুষের পাশে যোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে হইবে।[১৪] সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় তা হলো: ১) দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইতে হইবে, ২) জনরক্ষার জন্য মেয়েদের শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মেয়েদিগকে অফিস, কারখানা, এমনকি রণক্ষেত্রেও পুরুষের স্থান পূরণ করিতে হইবে, ৩) মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে, ৪) জনসাধারণের সহিত ভারতের সৈন্যদের সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইবে।[১৫] প্রস্তাবসমূহের মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে

Dhaka University Institutional Repository

কেবল মেয়েদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন বা তাদের সংগঠিত হবার কথা বলা হয় নি, মেয়েদের জন্য সবধরনের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

এরপর থেকেই জেলায় জেলায় গ্রামে শহরে সবজায়গাতেই সুপরিকল্পিতভাবে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ার কাজ চলতে থাকে। বিভিন্ন জেলার সমিতিগুলোর মধ্যে সংহতি স্থাপন ও তাদের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধনে এরপরে গঠন করা হয় কেন্দ্রীয় সংগঠন *মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি*। এসময়ে মহিলা ফ্রন্টের কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য স্টাডি ক্লাসের আয়োজন করা হয়। পার্টির নেতারা এই ক্লাসগুলি নিতেন। কেন্দ্রীয়ভাবে মহিলা নেত্রীদের জন্য ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় প্রাদেশিক শিক্ষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। পার্টির প্রাদেশিক কমিটি ও প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন এই এই স্কুল পরিচালনা করেন। এই স্কুলে মোট ২৮ জন মহিলা শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, পাবনা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, হুগলী, নদীয়া এই ৯টি জেলা থেকে ১৪ জন এবং প্রাদেশিক কমিটিসহ কলকাতা থেকে ১৪ জন ছিলেন। স্কুলের বিষয়বস্তু ছিল : ১) ক্লাসের উদ্দেশ্য, ২) পার্টি সংগঠন, ৩) যুদ্ধের বিভিন্ন স্তর, ৪) জাতীয় সংকট ও ঐক্যের আন্দোলন। ৫) নারীআন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী, ৬) মহিলা ফ্রন্টের সাথে বিভিন্ন ফ্রন্টের সম্বন্ধ, ৭) ছাত্র ও ছাত্রীআন্দোলন।[১৬]

১৯৪৩-এর ৮ মার্চ যখন কলকাতার ওভারটুন হলে প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন দেখা গেল, সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে শহর নগর থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের প্রায় অর্ধেক শ্রমিক শ্রেণির এবং শহরের দুর্বলতর শ্রেণির; বাকী অর্ধেক মধ্যবিত্ত শ্রেণির। আর জেলা থেকে যারা আসেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এর মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে গেল যে নারীআন্দোলন এই পর্যায়ে আর শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কৃষক-শ্রমিক-বস্তিবাসী মহিলারা তা নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।[১৭]

এই পটভূমিকায় বাঙলায় দেখা দিল মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নারীর জীবনে সর্বোচ্চ বিপর্যয় এবং নিপীড়ণ নিয়ে আসে। দুর্ভিক্ষের সময়ই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সবচাইতে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। একদিকে তারা দুর্ভিক্ষ পিড়ীত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা বা ক্যান্টিন চালু করে তাদের খাবার বিতরণের দায়িত্ব পালন করে, কন্ট্রোলের দোকানে নারীদের লাইন ধরে চাল নিতে সাহায্য করা, অসহায় মেয়েদের জন্য কুটিরশিল্প কেন্দ্র ও শিশুকেন্দ্র পরিচালনা করা, ন্যায্যমূল্যের দাবিতে ভূখা মিছিল পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করে। ১৯৪৩-এর ১৭ মার্চ কলকাতা ও শহরতলীর ৫০০০ মহিলা মিছিল করে বিধানসভা অবরোধ করে, বাধ্য হয়ে তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক লরি বোঝাই চাল এনে তাদের মধ্যে বিতরণ করেন।[১৮] অন্যদিকে, দুর্ভিক্ষের কঠিন আঘাতে যখন অসংখ্য নারী সংসারহারা হয়ে পথে নামতে বাধ্য হয়, তখন তাদের জন্য ছিল আরেক দুঃস্বহ জীবন। জাপানী বোমার আশংকা শুরু হতেই এদেশে

Dhaka University Institutional Repository

নারীত্বের অবমাননা শুরু হয়ে যায়। এরপর জিনিষের দুর্মূল্যতা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় সংসার চালানোই প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। চারিদিকে শুরু হয় মুনাফাখোরদের অবাধ রাজত্ব। দেখা যায় "এবার বিক্রয়ের পালা কেবল জোতজমির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মানুষের গোটা জীবনের ভিত-সুদ্ধ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কত স্বামী তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। পতিতালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কলিকাতায় যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার নিঃস্ব নিরাশ্রয়ের ভীড় হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার যুবতী স্ত্রীলোক কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য গণিকালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন।"[১৯] জেলা থেকে নারী কর্মীরা নারীজীবনের এই চরম বিপর্যয়ের সংবাদ কেন্দ্রে পাঠাতে লাগলেন। মেদিনীপুর জেলা থেকে উষা চক্রবর্তী জানান

> কোন কোন স্থানে দুঃস্থা মায়েরা সন্তান বাঁচানোর জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিতেছে। বি. এন. আর লাইনের স্টেশনে চালান দিবার জন্য যেসব চালের বস্তা গাদা দেয়া আছে সেখান হইতে চাল চুরির জন্য বহু দুঃস্থ মেয়ে একা ট্রেনে ভ্রমণ করিত। চাল চুরি ও ভ্রমণের সুযোগ পাইবার জন্য রেলওয়ে কর্মচারীদের সাথে তাহারা অসঙ্গত ব্যবহারও করিয়াছে। গ্রামের ভিতরে মিলিটারি ক্যাম্প থাকায় অনেক দুঃস্থ মেয়ে সেখানে খাওয়া পরার বদলে ইজ্জৎ দিয়াছে।[২০]

চট্টগ্রাম থেকে কল্পনা দত্ত

> আমিরাবাদে ২০/২১ বৎসরের একটি মেয়ে মাজাদা ইজ্জৎ বাঁচাতে চেয়েছিল। গরীব চাষীর ঘরের বউ সে। স্বামী তার দুর্ভিক্ষের সংসার ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল ফেণীতে। ফিরে যখন এল , তখন বাত ও জ্বরে সে একেবারে পঙ্গু। লঙ্গরখানা, ওয়ার্ক হাউজ উঠে গিয়ে বেঁচে থাকার সমস্ত পথই যখন বন্ধ হল তখন শেষ পর্যন্ত মাজাদা বাধ্য হয়ে রাস্তায় লেবার কোরে কাজ নিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে মাজাদা বুঝল মজুরি নিতে হবে ইজ্জতের বদলে। মাজাদা তো কাজ ছাড়লই, আরো ১০/১৫ জনকে সেই দুষিত আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে আনল। তারা সবাই প্রতিজ্ঞা করল, কেউই আর লেবার কোরে জান থাকতে যাবে না। তিন মাস পরে কয়েকদিন আগে আবার আমিরাবাদে গিয়েছিলাম, মাজাদার সঙ্গে দেখা হল, সে তখন মৃত্যুশয্যায়। ছেলেটা আগেই মরেছে। মাজাদা ম্লান মুখে বলল, প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারে নি। পেটের দায়ে লেবার কোরে না গিয়ে পারে নি।[২১]

ফরিদপুর থেকে উমা ঘোষ লিখেছিলেন

> একটি গ্রামে একটি গৃহস্থ বধূ আজ অর্থ সংকটে নুন চিনি ইত্যাদি সস্তা দামে যোগাড় করিয়া চোরাকারবার করিতেছে। তাহার সম্পর্কে চরিত্রহীনতার কথাও গ্রামের সকলে জানে। বখিয়াতে ১৯টি মেয়ে সমাজ ছাড়িয়া গত সংকটে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, প্রকাশ্য বাজারে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে। এই ১৯টির ভিতর ১ টিকে আমাদের সমিতির চেষ্টায় বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। বালুচরা গ্রামে একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে নাপিতকে বিবাহ করে। সে বলে, সমাজ তাকে খাইতে দিবে না, তাই যে তাহাকে খাইতে দিবে তাহার কাছেই চলিয়া যাইবে।[২২]

এই দুর্দিন আর দুর্যোগে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নারীসমাজের কাছে ঘোষণা করল:

–তোমার আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এক হও।

–ঘরবাড়ি সন্তান-সন্ততি রক্ষার জন্য এক হও।

–দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার জন্য এক হও।

Dhaka University Institutional Repository

–খাদ্য আদায়ের লড়াইয়ে এক হও।

–কুটিরশিল্পের দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে পরিবার, দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার জন্য এক হও।[২৩]

নারীর আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সংগঠিত এবং পরিকল্পিত আন্দোলন বাঙলায় এই প্রথমবার দেখা গেল। অধঃপতিত জীবনের হাত থেকে হাজার হাজার মেয়েকে বাঁচানো মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ালো, ফলে বিভিন্ন স্থানে গড়া হতে লাগল মহিলা সমিতি। যার কাজ ছিল

১. আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জন-সমাজকে সচেতন করা, দ্রব্যমূল্য কমানো ও রেশনিং ব্যবস্থা চালু করবার জন্য সরকারকে চাপ দেবার আন্দোলন, ভুখা মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি

২. মানুষকে মরতে দেখে নির্বিকার চোখে চেয়ে না থেকে, যে করে হোক লঙ্গরখানা নিজেরা খোলা এবং সরকারকে দিয়ে আরো অনেক লঙ্গরখানা খোলান, গোপন মজুদ আর কালোবাজারীকে খুঁজে বের করানো।

৩. নিরাশ্রয় নিরালম্ব, দুর্গত মেয়েগুলোকে আশ্রয় দেওয়া, অবলম্বন দেওয়া অর্থাৎ তাদের পুনর্বাসন। পতিতা-বৃত্তির জন্য দালালদের হাতে পড়া থেকে মেয়েদের রক্ষা করার সংগ্রামও ছিল এই পুনর্বাসন প্রচেষ্টার অংশ।[২৪]

১৯৪৫ সালের ৬ জানুয়ারি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, নারী সেবা সংঘ, ভিজিলেন্স এ্যাসোসিয়েশন এবং আরো দশটি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত একটি সভা হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। সরোজিনী নাইডু তাঁর ভাষণে তরুণদের উদ্দেশে বলেন

> সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাড়ীর মেয়েদের পবিত্রতার প্রতিমা বলে দেখি। কিন্তু অন্য কোন মেয়ের পবিত্রতা যদি ধূলোয় লুটোয় আমাদের কখনও মনে হয় না যে সে মেয়ে এবং আমার বাড়ীর মেয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যতক্ষণ একটি মেয়েরও পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে, যতক্ষণ একটি মেয়েও পুরুষের লালসার কুক্ষিগত হচ্ছে, যতক্ষণ অধিকতর শক্তিমান পুরুষের লালসার পঞ্জর কবলিত হচ্ছে শয়ে শয়ে অসহায় নারী, ততক্ষণ কোন মেয়ের ইজ্জত নিরাপদ নয়।[২৫]

যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত হাজারো গ্রামীণ নারীর জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এভাবে হয়ে উঠেছিল আশ্রয় স্বরূপ। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫ এর ১৮ নভেম্বর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তৃতীয় সম্মেলনে যে প্রস্তাবসমূহ পাশ হয় তার মধ্যে ছিল মেয়েদের প্রত্যক্ষ সমস্যা যেমন, সমাজজীবনে তাদের পুনর্বাসন, খাদ্য বস্ত্র, মধ্যবিত্ত মেয়েদের বেকারী, পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের বিষয়, হিন্দু দেওয়ানী আইন সংশোধন, মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার, বাধ্যতামূলক এক-বিবাহ, গণিকাবৃত্তি নিরোধ। পাশাপাশি আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ছিল রাও বিলকে সমর্থন জানানো। রাও বিল মূলত ১৯৪১ সনের রাও কমিটির রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি হয়। এতে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনীর সুপারিশ করা হয়, পাশাপাশি পুত্র-কন্যার সমানাধিকারের কথা বলা হয় এবং স্ত্রী বা স্বামী জীবিত থাকতে আবার বিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়।[২৬] এসময়ে বাঙলার নারী সংগঠনগুলো একসঙ্গে এই বিলের পক্ষে আন্দোলন শুরু করে। আইনসভার অভ্যন্তরে এই বিলের পক্ষে মত প্রকাশ করেন রেনুকা রায়। আবার রক্ষণশীল সমাজ ছিলেন এই বিলের বিপক্ষে। রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে অনুরূপা দেবী এই বিলের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ তুলে ধরেন। অনুরূপা দেবীর যুক্তি ছিল:

১. ছেলেরাই বংশের বাহক, মেয়েরা অন্য পরিবারে বা অন্য বংশে চলিয়া যায়; কাজেই ছেলেদের হাতে সম্পত্তি থাকিলে বংশের গৌরব ও মর্যাদা সংরক্ষিত হইবে এবং তাহা ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকিবে।

২. সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যেই বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; আবার মেয়েদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িলে খণ্ড খণ্ড হইয়া তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।

৩. সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় মামলা মোকদ্দমার অবধি নাই; ইহার উপর নতুন ব্যবস্থার ফলে ভ্রাতা ভগিনীতে ঈর্ষা দ্বেষ বিসংবাদ শুরু হইবে।

৪. মেয়েরা দান বিক্রয়ের ক্ষমতা পাইলে অথবা সম্পত্তি হাতে পাইলে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এখনও পর্যন্ত তাহাদের আইন-জ্ঞান ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষমতা বিশেষ কিছুই নাই।

৫. মেয়েদের জন্য অভিভাবকদের অনেক খরচ করিতে হয় এবং উপরন্তু বিবাহের সময় টাকাও যৌতুক দিতে হয়। তাহার উপর তাহাদের সম্পত্তির ভাগ দিলে ভাইদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা হইবে।[২৭]

সরলাবালা সরকার ১৯৪৪-এর ২৯ অক্টোবর দৈনিক আনন্দবাজার-এ প্রকাশিত তাঁর লেখায় অনুরূপা দেবীর আপত্তিগুলি খণ্ডন করেন এমনসব যুক্তিতে:

১. ছেলেরা বংশের বাহক হইয়া সম্পত্তি লাভ করিলেই যে বংশের গৌরব বাড়ে বা সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি হয় এমন কিছুই নাই। এপর্যন্ত ছেলেদের হাতে পড়িয়াও বহু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং নানা প্রকারে বংশের সম্মানহানি হইয়াছে

২. সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে বিভক্ত হইলে মেয়েদের মধ্যেও হইতে পারে। পরিবারে ছেলে মেয়ে হিসাব করিয়া আসে না। মেয়ে না হইয়া ছেলে হইলে ভাগ পাইবে। আর মেয়ে হইলেই ভাগ দিলে সম্পত্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, এরূপ যুক্তির সারবত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৩. শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলিয়াছেন যে, সম্পত্তির অংশলাভ আশা থাকিলে ভাই বোনের মধ্যে বাল্যকাল হইতে ঈর্ষার ভাব সঞ্চারিত হইবে। কিন্তু ইহা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। বৈষম্যই ঈর্ষার মূল। সমানাধিকার লাভ করিলে ঈর্ষা কমিয়াই যাইবে। এতদ্ভিন্ন ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষার যেরূপ সম্ভাবনা ভ্রাতাভগিনীর সেরূপ সম্ভাবনা কম।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার নাই বলিয়াই তাহাদের আইন-জ্ঞান ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষমতা নাই। সম্পত্তি হাতে পাইলে তাহাদের জ্ঞান ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইবে। অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বনের ভাব আসিবে। মেয়েদের সম্পত্তি রক্ষার সামর্থ্য নাই একথাও বলা চলে না। আগে দীনমনি চৌধুরী প্রমুখ অনেক মহিলা-জমিদার যেভাবে সম্পত্তি চালাইয়াছেন সেরূপ অনেক পুরুষও পারেন নাই।

৫. কন্যাপণ লইয়া হিন্দুসমাজ বিব্রত। বহু চেষ্টায়ও এই পণপ্রথা যাইতেছে না। মেয়েরা সম্পত্তিতে অধিকারলাভ করিলে টাকা যৌতুকের দাবি-দাওয়া উঠিয়া যাইবে। তা ছাড়া সম্পত্তির ভাগ বোনেরা যে পরিমাণ লইয়া যাইবে, বধূরা আবার সেই পরিমাণ লইয়া আসিবে। সুতরাং কোন পক্ষেই অবিচারের সম্ভাবনা নাই।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারেও অনুরূপা দেবী আপত্তি জানিয়েছেন এই বলে যে, এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে স্বেচ্ছাচার প্রবেশ করবে, দলে দলে লোক বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে থাকবে। কিন্তু এরও কোন বাস্তব কারণ নেই। কারণ এরূপ যদি ঘটেই তবে বুঝতে হবে যে আবহাওয়া আগে থেকেই পঙ্কিল হয়ে উঠেছিল।[২৮]

তবে উল্লেখ্য যে রাও বিলের পক্ষে আন্দোলনে সমর্থন দিলেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ ছিল মূলত গ্রামের শিক্ষাহীন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীদের মধ্যে, নিঃসন্দেহে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাজটি কোনরকমেই সহজ ছিল না। শহুরে শিক্ষিত মেয়েরা তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত এক গণ্ডির মেয়েদের কাছে পৌঁছেছেন, তাদের জীবন সম্পর্কে সচেতন করেছেন তাদের ভাষায়। এপ্রসঙ্গে মনিকুন্তলা সেন তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন

> . . .উনুনে বরিশালের মুসুরি ফুটছিল। বৌ-এরা মুখ চেপে হাসতে লাগল। একটা পিঁড়ি টেনে বসে বললাম, আর আপনারা যদি ঘোমটা না খোলেন তাহলে ডাল-ভাতও খাব না। নিজেই গিয়ে ঘোমটা তুলে দিয়ে বললাম– 'দেখুন তো আমি কি পুরুষ মানুষ?' এবার বাঁধ ভাঙ্গলো। মুখ ফুটল। হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। ওরা বললো, পুরুষ না অইলে কি অইল? আপনে কত বিদ্বান, আপনের লগে আমরা কি কথা কমু? বললাম, 'কেন, ডাইল-ভাতের কথা কইতে তো বিদ্বান হওয়া লাগেনা।. . . সমাজতন্ত্রের কথা নয়, সোভিয়েত মেয়েদের কথা নয়। কলকাতা ও বরিশাল এ দুটো শহরের নামই তাদের বিশ্ব সংসারে জানা। এখানকার গল্পই করলাম। মেয়েরা স্কুলে যায়, পাস করে, ডাক্তার হয়, বড় চাকরী করে–এই সব গল্প। শুনে ওদের চোখগুলো বড় হয়ে গেল। বড় বড় নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমাদের কপালে কি আর ওসব আছে?' হায় আমার দেশ! বরিশাল শহর থেকে এক রাত্রের নৌকার পথ। বর্ধিষ্ণু গ্রাম বানরীপাড়া। স্কুল আছে, ছেলেরা পড়ে। তাইতো আমাদের আসা। আর সেখানেই মেয়েদের এই অবস্থা? যারা এদেরও অনেক তলায়, তারা না জানি আরো কত তলায়।[২৯]

ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে মেয়েদের সভায় নারীনেত্রীদের বক্তৃতার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা, মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, তাছাড়া চলাফেরা ও ঘরে মেয়েদের অসম্মানজনক পর্দাপ্রথা সম্পর্কে বক্তব্য। এভাবে প্রান্তিক নারীর কাছে পৌঁছনো

Dhaka University Institutional Repository

ছিল একধরনের সমস্যা, আবার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের কাছেও সমাজতান্ত্রিক দলের মেয়েরা ছিলেন অনেকটা অনাকাঙ্খিত। তাদের দৃষ্টিতে এই মেয়েরা ছিলেন বহির্মুখি এবং 'অসতী', কাজেই এইসব পরিবারের প্রধান পুরুষরা পছন্দ করতেন না যে তাদের বাড়ির মেয়েদের ওপর সাম্যবাদী নারীরা প্রভাব বিস্তার করুক। মনিকুন্তলা সেন এক বাড়িতে গিয়ে সেই পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে গৃহকর্তা রাগ হয়ে বললেন, 'কোন দরকার নেই, আপনারা যা বলবেন, তা আমার জানা আছে। আমি এম এ পাশ। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। আমার স্ত্রী আপনাদের সামনে বেরোবেন না।'[৩০] তাঁর স্মৃতিকথাতেই জানা যায় গ্রামে মফস্বলে কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বাড়িতে গিয়ে উঠলেও বাড়ির পুরুষেরাই তাদের আপ্যায়ন করতেন। মহিলারা সামনে আসতে সংকোচ বোধ করতেন। রেনু চক্রবর্তী বলেছেন, 'আমরা ঘরে ঘরে যাই সকলের সঙ্গে বিনা সঙ্কোচে কথা বলি দেখে ওরা আমাদের আলাদা একটা জাত ভাবত।'[৩১]

সাম্যবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত মেয়েদের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক বাধা ছিল অপর একটি সমস্যা। সমাজতান্ত্রিক দলের মেয়েদের অনেকেরই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে পরিবার ত্যাগ করতে হয়। রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাদের কঠিন পরীক্ষার মধ্যদিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। তাদের টিউশনী ও ছোটখাট কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতে হয়েছে। পরে তাদের থাকবার জন্য পার্টি কমিউন তৈরি হয়েছে, সেখানেও মেয়েরা আর্থিক অনটনের মধ্য থেকে দলের কাজ করতেন। নিবেদিতা নাগ এদের প্রসঙ্গে বলেছেন

> পঙ্কজ আচার্য এসেছিল রাজশাহী থেকে। রাজশাহীতে আমাদের একজন 'মা' ছিলেন তাঁর নাম চারুবালা ভট্টাচার্য।. . . এই মা সর্বতোভাবে পার্টির ছেলেমেয়েদের আগলে রাখতেন। পঙ্কজ যখন ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তখন বাড়ি থেকে প্রবল বাধা পেতে থাকে। মেয়েটির মধ্যে সম্ভাবনা আছে বুঝে মা তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। হাসিনা খাতুন শুধু রাজনীতি করার অপরাধে বাড়ি ছেড়ে আসে নি। তাঁর মা তাঁকে আমার ঢাকার বাড়িতে পৌছে দিয়ে বলেন–আমি যখন যেখানে থাকি হাসিনাকে যেন সঙ্গে রাখি। হাসিনার ভগ্নিপতি মায়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল হাসিনাকে বিয়ে করে তাঁর সব সম্পত্তি হস্তগত করতে। নিরুপমা (ব্যানার্জী) মামাবাড়ি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। রাজনীতি করার অপরাধে মামাবাড়ি থাকা সম্ভব হলো না। রানী দাসের অনুরূপ একটা সমস্যা ছিল। এই সব 'বাপ তাড়ানো মা খেদানো' পার্টি সভ্যদের নিয়ে আমাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছিল।[৩২]

উষা চক্রবর্তী ছিলেন ফরিদপুরের এক জমিদার পরিবারের মেয়ে। গরীব প্রজাদের উপর ঠাকুমার অন্যায় অত্যাচার ও পরিবারের মধ্যে নিষ্ঠুর শাসনব্যবস্থা সহ্য হয় নি বলে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বাড়ী থেকে পালিয়ে কলকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন।[৩৩] কমিউনিষ্ট পার্টি এই নারীদের শিক্ষার অধিকার, জীবিকার অধিকার , জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়া, নিজের জীবনের সংজ্ঞা নিজেই খুঁজে নেবার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, যেকারণে নিশ্চিন্ত পারিবারিক জীবনের আশ্রয় ত্যাগ করে এই মেয়েরা কমিউনিষ্ট দলের কমিউনে আশ্রয় নেয়। এই মেয়েরা নিজেরাই যে কেবল নিজেদের জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখে তা নয়, বরং দেখা যায় এদের সংস্পর্শে প্রত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীর জীবন পাল্টে যায়। মনিকুন্তলা সেন এদের অনেকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিমলা, মনিকুন্তলা সেন তাঁর প্রসঙ্গে বলেন

> চলে আসবার ২/৩ দিন আগে 'বাতাসী'র মা আমাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে তো মেয়েটা খুব ঘুরছে। আমার বড় ভয়।' – 'কেন?' –'ও যে বিধবা।' শুনলাম অনেক আগেই বিধবা হয়েছে। বয়স তো মাত্র তেরো। এই সেই শিশু-বিধবা–যা দেখিনি আগে। তবু ভাল, কৃষকদের ঘরে তত হিন্দুয়ানী নেই। বিমলাকে তার মা খেতে পরতে কষ্ট দেয় না। মনে মনে ভাবলাম – বিমলা তো কর্মী হবে। এ তো চলতে পারে না। এই সংস্কার ভাঙতেই হবে। ভেঙেছিল, কমিউনিষ্ট পার্টি ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পথ দেখিয়েছিল। কে জানত সেদিনের সেই ছোট ফুরফুরে 'বাতাসী' একদিন কৃষকনেত্রী বিমলা মাজি হবে, আর স্বামী পুত্র সংসার পাবে?[৩৪]

এমনই আরেকজন পাবনার মায়া। ব্রাহ্মন পরিবারের এই মেয়েটি মনিকুন্তলা সেনের সঙ্গে প্রচারকাজে বের হত তার মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। মনিকুন্তলা সেন প্রথমে ভেবেছেন অল্পবয়সী কুমারী মেয়ে, তাই মায়ের আপত্তি। কিন্তু খাবার সময় লক্ষ্য করলেন তার সঙ্গে খেতে বললে খায় না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন মেয়েটি বিধবা। নিজে থেকে বলল, ' আপনি এসেছেন তাই একটু বেরোতে পাই, নয়তো কোথাও যাই না। এই ছাদে পর্যন্ত আমাকে মা আসতে দেয় না। একদিন এমনি সময়ে ছাদে এসে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়েছিলাম, কখন মা উঠে এসেছেন জানতে পারি নি। আমার চুলের মুঠি ধরে এক চড় মারলেন। চুলটা খোলা ছিল তো!'[৩৫] পরবর্তী সময়ে ভট্টাচার্য পরিবারের মেয়ে মায়া মৈত্র পদবী ধারণ করে কপালে সিঁদুরের টিপ পরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৩৬] এভাবে কমিউনিষ্ট আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং তা হয়ে উঠেছে সামাজিক আন্দোলন। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকরা বাঙালি নারীকে বাঁচার অধিকার দিয়েছিল সতীদাহ প্রথা রদ, বিধাব বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ রদ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে, আর বিশ শতকের চল্লিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক দল বাঙালি প্রান্তিক নারীকে শুধু বাঁচা নয়, মানুষ হিসেবে মানুষের মতো বাঁচার শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার কাজটা ছিল ভিন্ন প্রক্রিয়ায়, নেত্রীরা যখন ঘরোয়া সভায় পারিবারিক নির্যাতন বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মারধোরের কথা বলতেন তখন দুটো ভাগ দেখা যেতো। বয়স্করা মারের পক্ষে, অল্পবয়স্করা এর বিপক্ষে। তখন নেত্রীরা বলার সুযোগ পেতেন

> আচ্ছা দেশে যদি একটা আইন হয়, কেউ বউকে মারতে পারবে না তাহলে কেমন হয়? মেয়েরা হাসত। কিন্তু দুটো বিয়েও কেউ করতে পারবে না, এমন আইন হলে? এতে সবাই খুশী। খুব ভাল হবে তাহলে। আর যদি ছেলে-মেয়ে-বউ, বয়স্ক-বয়স্কা সবাইকার জন্য স্কুল হয় লেখাপড়া শেখার জন্য? কথাটা কারো বিশ্বাস হতো না। ফাঁকা কথা মনে হতো। শহরে মেয়েরা কেমন লেখাপড়া শেখে, স্কুলে যায়। মেদিনীপুর শহরে, আরো কত শহরে এসব হচ্ছে। যখন বলতাম, 'আসুন না, এই গাঁয়ে মেয়েদের একটা স্কুল করে দিতে সরকারকে একটা চিঠি দি-ই।' তাও বিশ্বাস করত না। বলতাম, 'সবাই একজোট হলে কেন হবে না?' তারপর দরখাস্ত লেখা হতো। টিপ নেয়া হতো মেয়েদের আঙ্গুলের। সমিতির কথাটা তখনই উঠত। সমিতি না হলে এসব কে করবে? কেই বা সবাইকে খবর দেবে?[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে গ্রামীণ নারীসমাজ উপলব্ধি করতে পারলো যে, নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য তাদের নিজেদেরই সংগঠিত হতে হবে। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক দলের আরেকটি সাফল্য ছিল সাধারণ মুসলিম পরিবারের মেয়েদের এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে তারা সফল হয়েছিল। কলকাতায় মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা কমিটির মাধ্যমে ৫০০ মুসলিম মহিলা শ্রমিক গান্ধীজীর মুক্তিআন্দোলনে শরিক হন। নাজিমুন্নেসা আহমেদ এই কমিটির নেত্রী ছিলেন। ১৯৪৩ এর মার্চ মাসে পাবনার ৬০০ মহিলা ভুখা মিছিল করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান। এর মধ্যে ৫০০ জন ছিলেন মুসলিম মহিলা। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এদের কাছে ভুখা মিছিল সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার করার ফলে হিন্দু-মুসলিম মহিলারা সম্মিলিতভাবে ভুখা মিছিল করে। একই বছর জুন মাসে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে মেদিনীপুর তমলুক থানার দুই নম্বর ইউনিয়নের দুই শ হিন্দু ও মুসলিম মহিলা কোলাঘাট, রূপনারায়ণপুর ধানকলে যান এবং ১০ টাকা মন দরে চাল বিক্রির দাবি জানান। ১৯৪৩-এর ৬ জুলাই খুলনার মুসলমান পাড়ায় হিন্দু-মুসলমান মহিলাদের একটি সভা হয়। এই অঞ্চলটিতে পর্দাপ্রথার কঠোর অনুশাসন সত্ত্বেও ৪৫ জন মুসলমান মহিলা সভায় আসেন।

দিনাজপুরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৪-এর ২৬ মার্চ। সম্মেলনে মুসলিম মেয়েদের নেত্রী শাহজাদী বেগম ও শাহেদা খাতুনের নেত্রীত্বে বোরখা খুলে মুসলিম মহিলারা আসেন। মুসলিম লীগের আঞ্চলিক সম্পাদক সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। এটাই প্রথম সম্মেলন যেখানে দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের মহিলারা উপস্থিত ছিল। রাজশাহীতে ৮-৯ মে, ১৯৪৪ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে মুসলিম মহিলারা উৎসাহিত হন। তাদের উদ্যোগে ১১ এপ্রিল স্থানীয় মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রায় ৩৫০ জন মুসলিম মহিলা উপস্থিত হন। কনক মুখার্জী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এর ফলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও মুসলীম লীগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।[৩৮] সাধারণ মুসলিম পরিবারের মেয়েদের প্রকাশ্য রাজপথে এত অধিক সংখ্যায় মিছিল করা ছিল সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে এক বড় প্রতিবাদ।

(২)

চল্লিশ দশকের মধ্যভাগ-এ অবিভক্ত বাংলায় কৃষক আন্দোলন শুরু হলে শ্রমজীবি নারীচেতনার জাগরণ এবং নারীমুক্তি এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এবিষয়ে সমাজতান্ত্রিক নারী নেত্রী রেনু চক্রবর্তীর উপলব্ধি হলো, রামমোহন রায়ের নারী-মুক্তির সংগ্রাম শুধু শহরের মেয়েদের জন্যই ছিল এবং তা রইল রেনেসাঁ হয়ে। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন নিয়ে এল গাঁয়ের মেয়েদের নবজন্ম এই প্রথমবার।[৩৯]

কৃষক আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রণের চরিত্র বিশ্লেষণে মালেকা বেগম বলেন

> অত্যাচারী জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের স্পৃহাও ছিল তীব্র। তারা দুভাবে জোতদারের হাতে নিগৃহীত হতো। প্রথমত চাষী পরিবারের একজন হিসেবে স্বামী সন্তানের পরিশ্রমের ফসল অন্যের গোলায় উঠিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়ে অভাবে-দারিদ্র্যে সেও নির্যাতিত হতো, দ্বিতীয়ত নারী হিসেবে উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী জোতদার-জমিদারের অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হতো। গ্রামীণ কৃষক রমণীরা সরাসরি এইসব অত্যাচারের মোকাবেলা করতো।

Dhaka University Institutional Repository

> শোষিত, নির্যাতিত স্বামীও তার স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতো। একদিকে সে যেমন জোতদারের কাছে ছিল সম্পত্তির মতো বেচা-কেনার সামগ্রী, শোষণের বস্তু, অন্যদিকে স্বামীর কাছেও ছিল পণ্য স্বরূপ,–ভারবাহী পশুর মতো মার খেত, নির্যাতিত হতো। তাই গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠন যখন গড়ে উঠল, তখন স্বাভাবিকভাবে তারাও এতে যোগ দিল। গড়ে তুললো তীব্র প্রতিরোধ-প্রতিবাদ-সংগ্রাম। পাশাপাশি নারীর মর্যাদা লাভের জন্য পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের দাবিতে তারা ক্রমশ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতেও সংগঠিত হতে থাকে।[৪০]

কাজেই তেভাগা বা কৃষক আন্দোলন কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকল না, তা হয়ে উঠল প্রান্তিক নারীর জন্য মুক্তির বারতা। তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী রানী মিত্রর (দাশগুপ্ত) সূত্রে রেনু চক্রবর্তী উল্লেখ করেন কীভাবে কমিউনিষ্ট মেয়েরা গ্রামীণ কৃষক সমাজের কাছে কেবল অর্থনৈতিক সমস্যাই নয় বরং সামাজিক সমস্যাও তুলে ধরে। ১৯৪৪-এ পশ্চিম ঠাকুরগাঁওয়ের আতোয়ারী গায়ে সমিতির সাধারণ সভায় সম্পাদক যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন স্থানীয় একজন কমরেডের স্ত্রী বক্তৃতার মাঝে বলে উঠেন, 'কোন আইনে বৌগরে মারন যায়, কও দেখি কমরেড। আমার মরদ আমারে মরাব ক্যান্ ? আমি বিচার চাই।" সভায় তাৎক্ষনিকভাবে প্রস্তাব পাশ হয় স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলা নিষেধ বলে।[৪১]

বীরগঞ্জে মহিলা নেত্রী ফুলেশ্বরীর বাড়িতে এক সভায় এক কৃষক গৃহিনী কিষাণ সভার এক সভ্যকে নিয়ে এসে লোকটির বিরুদ্ধে নালিশ জানায় যে সে তার স্ত্রীকে মারে। লোকটি ক্ষমা চেয়ে এবং জরিমানা দিয়ে ছাড়া পায়।[৪২] আরেক স্থানে কণ্ঠমনি নামে এক মহিলা নালিশ জানালেন : 'বাড়ীর পিছ দুয়ারে যা তরকারী হয় আমরা বেচি; ছাগল গরুর দুধ বেচি; খালে বিলে মাছ ধরে বেচি, ছাগলও বেচি। এখন এ পয়সা কার? স্বামীর না বৌ এর? এই পয়সা সংসারের পেছনেই যায়। কিন্তু মরদরা আছে খালি এই পয়সা হাতাবার তালে।" ঐ টাকা স্ত্রীধন বলে কমিউনিষ্ট পার্টি রায় দেয়।[৪৩]

রংপুরে তেভাগা আন্দোলনের সময় মুসলিম মেয়েরা কঠিন পর্দাপ্রথা উপেক্ষা করে আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেন। তাঁরা বিভিন্ন সভায় অংশ নেবার বিষয়েও আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পর্দার প্রশ্ন কীভাবে সমাধান করা হবে? কৃষকরা এই সমস্যার সমাধানের জন্য সভা ডাকলেন। কারো অভিমত হলো মেয়েরা সভার যেদিকে থাকবে সেদিকে একটা পর্দার আড়াল দিয়ে দিলেই চলবে, কেউ বলল, মিটিংয়ে কী হয় না হয় তা তাদের পরে জানিয়ে দিলেই হবে। অধিকাংশ মুসলমান মত প্রকাশ করল, কী দরকার অত হ্যাঙ্গামার? এলই বা তারা মিটিং-এ। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় মিটিং হবে রাত্রি বেলা–মুসলমান মেয়েরা তাতে যোগ দিতে পারবে।[৪৪] এভাবে কৃষক মেয়েরা অতি সহজে পুরুষের পাশে স্থান করে নেয় ধর্মীয় বিধি-নিষেধের গণ্ডি পার হয়ে। মুসলমান নারীদের বিদ্রোহী ভূমিকা অনেক স্থানেই দেখা যায়। মনি সিংহ ময়মনসিংহের মুসলমান নারীদের প্রসঙ্গে বলেছেন

> ভাগচাষী মুসলমান মেয়েরা গরীব হলেও পর্দানশীন। তাহারা হাজং, রাজবংশী বা নমশুদ্র মেয়েদের মতো আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ কওে না, পর্দার আড়ালে থাকেন। কাজেই ওদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

> অজ্ঞ। . . . দুইজন সশস্ত্র পুলিশ খুব দাপাদাপি করিয়া একটি গরীব কৃষকের বাড়ির এক গাছতলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এমন সময় দুইটি মুসলমান যুবতী বধূ দুইটি দা হাতে রণমূর্তির বেশে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা সামাজিক রীতিনীতি ভুলিয়া গেল, উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া নিজেদের ভাষায় বলিল–'ওরে বাদ্দীর পুতরা, আমাগো নুকেরে মারছ কেন? এই দাও দিয়া তরারে জব করিয়া ফ্যালবাম।' যুবতীদ্বয়ের দা আর রণমূর্তি দেখিয়া পুলিশদ্বয় যে যেদিকে পারিল রাইফেল দুইটি ফেলিয়া ভো দৌড়ে পালাইয়া গেল। তাহাদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না।[৪৫]

বস্তুতপক্ষে সংগঠিত হওয়া ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়ার পূর্বে কৃষক নারীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যতা, আত্মপরিচিতি ও অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনভাবেই সচেতন ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে কৃষকনেতা অমল সেন বলেন

> তেভাগা সংগ্রাম মহিলা সমিতিকে ঠেলে দিল বিস্ময়কর বিপ্লবাত্মক এ সংগ্রামের ক্ষেত্রে। ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ আর ব্যবহার রীতির মধ্যে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে পরিস্কার করার কাজে নেমে পড়ল মহিলা সমিতি। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আচরণরীতি, বিধবা বোনের প্রতি ভাইদের মনোভাব ও আচরণ; ছেলেমেয়ে পালন করার ধারা। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য ও বাসস্থানের স্বাস্থ্যবিধি, সংসারের পরস্পরের প্রতি, পড়শীর প্রতি, সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার আর আপনজনের মত মানসিকতা ও ব্যবহাররীতি–প্রতি ক্ষেত্রেই মহিলা সমিতির সংগ্রাম প্রসারিত হয়ে গেল। সমগ্র জীবনবোধ, সামাজিক সম্পর্ক, আর ব্যবহাররীতি, সব কিছুকেই সুন্দরভাবে বদলে দেবার অবিশ্বাস্য সব ঘটনা সংগঠিত হয়ে চললো। অনেক দেশে বিপ্লব সমাধা হবার পর সাংস্কৃতিক বিপ্লব হচ্ছে বলে শুনি।. . . কিন্তু তেভাগা আন্দোলন আর মহিলা সমিতির এইদিককার সংগ্রাম তেভাগা অঞ্চলের কৃষকদের সমাজে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়ে তুলেছিল। বললে খুব একটা বাড়িয়ে বলা হলো বলে আমার মনে হয় না।[৪৬]

উনিশটি জেলায় তেভাগার দাবিতে কৃষক সংগ্রাম হয়। এই জেলাগুলো হলো দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি। প্রতিটি অঞ্চলেই তেভাগা আন্দোলনে নারীসমাজ ছিল সক্রিয় এবং বহু ক্ষেত্রেই তারা নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং অমল সেন-এর ভাষ্য অনুসারে প্রতিটি এলাকাতেই সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। শ্রমজীবি নারীচেতনার উন্মেষ তেভাগা আন্দোলনের বড় প্রাপ্তি।

পরিশেষে বলা যায় চল্লিশের দশকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে এর মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় নারীর বিশেষ অধিকারের জন্য আন্দোলনে সচেষ্ট হওয়া আর এজন্য সমাজের একেবারে উপরতলা বাদ দিয়ে অন্যসব শ্রেণির মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ করার কার্যক্রম তারা গ্রহণ করে। এই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষক আন্দোলনে কৃষক রমণী এবং কমিউনিষ্ট পার্টির নারীদের অংশগ্রহণ প্রান্তিক নারীকে আন্দোলনে সামিল করে তাদের অধিকার এবং বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই সচেতনতা সনাতন পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর প্রতি চ্যালেঞ্জমূলক হলেও এমন সমাজকাঠামোকে বদলে দেয়ার মতো সামর্থ্য তখনও নারীদের হয় নি (বলা

Dhaka University Institutional Repository

চলে আজও হয় নি।) তবে এটা স্বীকার্য যে, নারীর মনোজগতে সমাজের রূপান্তর উপযোগী এক শক্তিশালী পরিবর্তন অবয়ব ধারণ করেছিল; এবং যা এক কালের অন্তঃপুরের ঘেরাটোপে হারিয়ে যাওয়া নারীর নবজাগৃতী ও তার রাজনৈতিকায়নের তীক্ষ্ণ একটি সূচক ছিল। লক্ষণীয় সূচক-বিন্দুটির ক্রমে ক্রমে বৃত্ত হওয়া বা বৃত্তটির ক্রমপ্রসারমানতা আজও দৃশ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. Taneja, ***Gandhi, Women, and the National Movement***, p. 181
২. ঐ
৩. ঐ, পৃ. ১৮৭
৪. সেন, *সেদিনের কথা*, পৃ. ৪৫
৫. ঐ
৬. Taneja, ***Gandhi, Women, and the National Movement*** , p. 207
৭. ঐ
৮. কুমুদিনী ভাকুয়া (অনুলিখন ও সম্পাদনা: অধ্যাপিকা উমা সেনাপতি), *মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামে কুমুদিনী ভাকুয়া*, (কলকাতা: মহিলা গবেষণা কেন্দ্র, ১৪১০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩১
৯. দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃ. ৯০
১০. ঐ, পৃ. ৯৪-৯৫
১১. অনুরাধা রায়, *সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃতি আন্দোলন*, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৫), পৃ. ১৭৬
১২. ঐ, পৃ. ১৭৭
১৩. মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, পৃ. ৩০
১৪. ঐ
১৫. ঐ
১৬. ঐ
১৭. চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা ১৯৪০-৫০*, পৃ. ৩৪
১৮. সেন, *সেদিনের কথা*, পৃ. ৭১
১৯. বসু, 'বাঙলার নারী-আন্দোলন', পৃ. ৩৪৭
২০. ঐ পৃ. ৪৪৯
২১. ঐ
২২. ঐ
২৩. ঐ পৃ. ৪৪৭
২৪. চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা*, পৃ. ৪২
২৫. ঐ, পৃ. ৫৭
২৬. মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, পৃ. ৭৯
২৭. বসু, 'বাঙলার নারী-আন্দোলন', পৃ. ৩৪০
২৮. ঐ, পৃ. ৩৪০-৩৪১
২৯. সেন, *সেদিনের কথা*, পৃ. ৪৮
৩০. ঐ, পৃ. ১০০
৩১. চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা*, পৃ. ১৮-১৯
৩২. উদ্ধৃত : রায়, *সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃতি আন্দোলন*, পৃ. ১৮১-১৮২
৩৩. ঐ
৩৪. সেন, *সেদিনের কথা*, পৃ. ৯১
৩৫. ঐ, পৃ. ১০৯
৩৬. ঐ
৩৭. ঐ, পৃ. ১২৭
৩৮. রেনু চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা*, পৃ. ২৫, ৩০, ৩৬, ৩৭, ৪৪,৪৫,
৩৯. ঐ,পৃ. ৭২
৪০. মালেকা বেগম, 'তেভাগা আন্দোলন ও গ্রামীণ নারী জাগরণ', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পাদিত), *তেভাগায় কথা ও বাংলার কৃষক আন্দোলন*, (ঢাকা: প্যাপিরাস, ২০০৫) পৃ. ৬৫
৪১. চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা*, পৃ. ৭৩
৪২. ঐ, পৃ. ৭৪
৪৩. ঐ
৪৪. বসু, 'বাঙলার নারী-আন্দোলন', পৃ. ৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. সুস্নাত দাশ, *অবিভক্ত বাংলায় কৃষক সংগ্রাম: তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার*,(কলকাতা: নক্ষত্র প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ১৯০

৪৬. ঐ, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

বিশ শতকে বাঙালি নারী প্রকৃত অর্থে পিতৃতান্ত্রিক অবরোধ থেকে মুক্ত হবার যাত্রা শুরু করে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই যাত্রার সূচনা ঘটে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ পুরুষদের দ্বারা বাঙালি নারীর উপনিবেশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হবার মধ্যদিয়ে। প্রত্যেক রাজনৈতিক আন্দোলনেরই একটি সামাজিক তাৎপর্যের দিক থাকে এবং কোনো বিশেষ মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই সেই আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় মূলত উনিশ শতকের শেষে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এবং স্বদেশী আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে বিস্তার লাভ করে পরবর্তী সাড়ে চার দশক ধরে এই জাতীয়তাবাদী চেতনাই সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে। বৃটিশ ভারত তথা অবিভক্ত বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সক্রিয়ভাবে সামাজিক যে বিষয়টি জড়িত হয় তা হচ্ছে নারীকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা। এই নারীকেন্দ্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ করার মধ্যদিয়ে। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ যেমন ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা অর্জন করে তেমন নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে এবং বাঙালি নারী পুরুষতন্ত্রের অচলায়তন ভাঙ্গতে সচেষ্ট হয়।

অবিভক্ত বাংলায় নারীর রাজনৈতিকায়ন ও নারীমুক্তি আন্দোলনকে বুঝবার পূর্বে বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্ব ও নারীমুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশে বর্তমান গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের পর্যালোচনার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, উপনিবেশিক বাংলায় উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন এবং বিশ শতকের সূচনায় বাংলায় নারীবাদী যে ধ্যানধারণা প্রচলিত ছিল তা অনেকটাই উদারনৈতিক নারীবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বঙ্গ-ভঙ্গ পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনপর্ব থেকে শুরু করে বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্ত করবার ক্ষেত্রেও এই উদারনৈতিক মতবাদ প্রাধান্যলাভ করে। তিরিশের দশকের শেষ থেকে চল্লিশের দশকে এসে দেখা যায় মার্কসীয় দর্শন বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাঙালি নারীদের আকৃষ্ট করে।

বাংলার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকে অঠারো শতকের শেষভাগ পর্যন্ত নারীর ভূমিকায় তেমন কোন সামাজিক পরিবর্তন ঘটে নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রধানত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির পুরুষরা তাদের নিজেদের যোগ্য সহধর্মিনী ও পরিবারের যোগ্য মাতা হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য নারীদের জীবনে কিছু পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন। কিন্তু এই সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা মূল পরিবার কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় নি, নারীর ভূমিকা পূর্বের মতোনই পরিবারকেন্দ্রিক অর্থাৎ মাতা, কন্যা ভগিনী ও পত্নী হিসেবেই থেকে যায়। ব্যক্তি হিসেবে নারী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কারণ নারীর ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্ত ধারণাটির উৎস ছিল পুরুষের নিজস্ব চাহিদা। চাহিদাটি ছিল নারীকে পুরুষের সামাজিক মর্যাদা উপযোগী সহধর্মীনি হিসেবে গড়ে তোলা; নারীর কোন সামাজিক অবস্থানান্তর নয়। সুতরাং প্রারম্ভিক পর্বে পুরুষের নারী জাগরণী চিন্তা-কর্ম সিংহভাগ ক্ষেত্রে যে এমনভাবে সীমিত ছিল তা লক্ষণীয়। অর্থাৎ তখনও পুরুষতান্ত্রিকতায় কোন মৌলিক পর্বান্তর দৃশ্যমান হয় নি। তবে যে বিষয়টি অনস্বীকার্য, তা হচ্ছে এই সংস্কার আন্দোলনের অন্যমত সূচক নারীশিক্ষার বিস্তার নারীর মানসজগতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। বাঙালি নারী উপলব্ধি করে যে গৃহের চার দেয়ালের বাইরে একটি বৃহৎ জগৎ বিদ্যমান এবং গৃহকর্ম, সন্তানপালন, ধর্মপালন ব্যতিত আরো বৃহৎ কর্ম সেই জগতে বিদ্যমান। তবে শিক্ষার সুযোগ যেহেতু শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং মূখ্যত হিন্দু ধর্মাবলম্বী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু সংস্কার আন্দোলন সার্বিকভাবে নারীর কল্যাণে সার্থক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় নি। পাশাপাশি উনিশ শতকের শেষপর্যায়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা মূখ্য হয়ে উঠলে শ্রেনি হিসেবে নারীসত্তার বিশেষ বিকাশ পক্রিয়াটি ব্যর্থ হয়। নারী হিসেবে চলমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজবৈশিষ্ট্য বা লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজের শোষণপক্রিয়া উপলব্ধির পরিবর্তে জাতি হিসেবে উপনিবেশিক শাসনের গ্লানি সম্পর্কে বাঙালি নারী সচেতন হয়। ফলে শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে বা বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি নারীকে সোচ্চার হতে দেখা যায় না, যেটি সমকালীন পাশ্চাত্যে সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা গিয়েছিল। পরিবর্তে বাঙালি নারীকে অবশ্যম্ভাবীভাবে জড়িত হতে হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। বর্তমান গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন। বাঙালি নারীর রাজনৈতিকায়নের প্রথম পর্যায়ের এই আন্দোলনে নারী জড়িত হয় আন্দোলনের প্রয়োজনে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান দিক যেহেতু ছিলো বিদেশী পণ্য বয়কট ও দেশীয় পণ্যের প্রচার ও প্রসার, কাজেই নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে নারীসমাজের অন্তর্ভুক্তি ব্যতিত এই আন্দোলন সফল হবে না। এই উপলব্ধি থেকে বাঙালি নারীকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় দীক্ষিত করা হয়। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালি নারীকে সম্পৃক্ত করবার এই পর্ব ছিল পিতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নারীকে তার ঐতিহ্যিক ভূমিকায় আবদ্ধ রেখে, ব্রতধারণ, অরন্ধন, রাখীবন্ধনসহ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হয়। ফলে বাঙালি নারী স্বদেশবোধের চেতনায় উজ্জিবিত হলেও নারীমুক্তির ভাবনা তার মধ্যে জাগ্রত হতে পাওে নি। নারীকে এই পর্যায়ে দেখা যায় পুরুষের প্রেরণাদাত্রী হিসেবে এবং পুরুষদের নেতৃত্বে চলমান আন্দোলনকে সফল করবার মাধ্যম হিসেবে। তবে সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনের ফলে মুষ্ঠিমেয়সংখ্যক নারীর চিন্তাজগতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়, নিজ সংসারের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে দেশের কল্যাণেও তার ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি আসে এই

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের মনে। ফলে অনেক স্থানে দেখা যায় মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ। যদিও এই সমাবেশ ছিল ঘরোয়া এবং ধর্মীয় আবরণ যুক্ত, তথাপি বাঙালি নারীর জীবনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষকে সামনে রেখে একত্রিত হবার সূচনা স্বল্পমাত্রায় হলেও এসময়েই দৃশ্যমান হয়।

বিশের দশকে অবিভক্ত বাংলা তথা সমগ্র ভারতে নারীর সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন মহাত্মা গান্ধী। চতুর্থ অধ্যায়ে এপর্যায়ের আলোচনায় দেখা যায়, চিরাচরিত সাংস্কৃতিক কাঠামোতে খাপ খেয়ে গিয়েছিল বাঙালি নারীর রাজনৈতিকায়ন, সনাতন ভূমিকাকে অস্বীকার করতে দেখা যায় না এ পর্বের নারীকে। স্বদেশবোধের চেতনাই এপর্যায়েও নারীর দর্শনে সর্বাগ্রে অবস্থান করছিল। তবে পূর্বের দশক থেকে যে পরিবর্তনটি এসময়ে আসে তা হচ্ছে রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে একধরনের সামাজিক সচেতনতাও নারীর মধ্যে কাজ করতে থাকে। এই পর্যায়েই নারী তার নির্ধারিত গৃহকোণ থেকে বাইরে বের হয়ে আসে রাজনৈতিক প্রয়োজনে, ক্রমান্বয়ে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তলে। নারীদের নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠনও এপর্যায়ে গড়ে উঠতে থাকে। দশকের শেষ পর্যায়ে বাঙালি সমাজে নারীর প্রকাশ্য চলাচল স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে ওঠে বিশেষত ছাত্রীসমাজ, যারা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তারা সমাজের চিরন্তন ভাবনা জগতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। তবে এক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নারীসমাজের এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত না হওয়া এবং মুসলিম নারীসমাজের পশ্চাদপদতাকে চিহ্নিত করা যায়।

বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার মধ্য দিয়ে বাঙালি নারী কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নিজ অবস্থানকে দৃঢ় করে নি, পাশাপাশি সমাজের নারী সম্পর্কিত ভাবনাতেও পরিবর্তন আনে। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যায়, এরই ধারাবাহিকতায় তিরিশের দশকে বাঙালি নারী সচেষ্ট হয় তার ঐতিহ্যগত ভূমিকা ও সংস্কার ছিন্ন করে প্রথাসিদ্ধ ভূমিকার বাইরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি নারীদের একটি বড় অংশ এ সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ব্যাপকসংখ্যক নারীর করাবরণের মধ্যদিয়ে নির্ধারিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার বাইরে বের হয়ে আসে বাংলার নারীসমাজ। কারাগারে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য সংগঠিত হওয়া, নারীদের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করার মধ্যদিয়ে বাঙালি নারী নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে শেখে। বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত নারীরাও এসময়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজমানসকে অস্বীকার করে নিজেদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় চল্লিশের দশকে প্রান্তিক ও শ্রমজীবি নারীর উন্মেষ। চল্লিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক দলের মূল দাবি স্বাধীনতা ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবি সকলের জন্য উত্থাপিত হলেও এই দলের কার্যক্রমে নারীর বিশেষ দাবিদাওয়া, অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, যে অভাব-অভিযোগগুলোর অধিকাংশই ছিল শ্রমজীবি নারীসমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর সম্পৃক্তি

Dhaka University Institutional Repository

নয়, নারীকেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচি এই পর্বে দেখা যায়। এ সময়ে শ্রমজীবি কৃষকসমাজ এবং এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নারীসমাজকে কেন্দ্র করে সমাজতান্ত্রিক দলের কার্যক্রম পরিচালিত হবার ফলে নারীমুক্তি বিষয়টি প্রান্তিক নারীর কাছে পৌঁছায়, যার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীসমাজ ও এর অংশ হিসেবে শ্রমজীবি মুসলিম নারীসমাজও নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রদ ও স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৪৭-এ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত বাঙলাকে পর্যায়ক্রমে জটিল ও বহুমাত্রিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। বিশেষত ১৯২০ থেকে শুরু করে ৪৭ পর্যন্ত সময়কালে একদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মকাণ্ড, আর মধ্য ত্রিশের দশক থেকে সমাজতান্ত্রিক দলের উত্থান বাঙলার রাজনীতিকে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে। এর প্রতিটি ধারাতে দেখা যায় নারী সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। প্রশ্ন ওঠে নারীর এই অংশগ্রহণের মূল্যায়ন নিয়ে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে দেখা যায় বিভিন্ন দল ও মতের কর্মসূচি নারীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করেছে, আবার ধর্মের ভিন্নতাও নারীর অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করেছে।

স্বদেশী আন্দোলনে নারীর অংশগহণ ছিল আন্দোলনের প্রয়োজনে এবং নারীর ঐতিহ্যিক ভূমিকাকে রক্ষা করে। তাথাপি দেখা যায় যে এই সময় থেকেই নারী গৃহস্থালির বাইরে সমাজজীবন ও রাজনৈতিক বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ের নারীকে যদি তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও জীবনদর্শন দিয়ে বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে তাদের চিন্তাজগতে এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এক বড় পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল যা তাদের নিত্যদিনের জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন আনে। বিশ শতকের বিশ-এর দশকে গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন-এ যোগদানের জন্য সর্বস্তরের মহিলাদের আহ্বান জানালেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় গান্ধীজী নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের আন্দোলন বিপুল সংখ্যায় বাঙালি নারীকে তাদের প্রথাসিদ্ধ ভূমিকার বাইরে বের না হয়েও এই আন্দোলনে যুক্ত হবার সুযোগ করে দেয়। এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীদের অধিকাংশ ছিলেন রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। এই সদস্যরা যতখানি রাজনীতি সচেতন ছিলেন, ততখানি নারীদের সমস্যা বা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। গান্ধীজী বা কংগ্রেস নারী প্রশ্নে কোন সমাধান দেন নি, বা নারীকেও দেয়া হয় নি নিজের জীবন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার। এর একটি কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, গান্ধীজী তার আন্দোলনে অধিকসংখ্যক জনগণকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন, যেহেতু তখন পর্যন্ত সমাজের বৃহদাংশ ছিল নারীপ্রশ্নে রক্ষণশীল, তাই নারী বিষয়ে কোন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব নেন নি। অধিকন্তু অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে নারীর জন্য পৃথক ভূমিকাও তাঁরা নির্দিষ্ট করে দেন।

তিরিশের দশকে বিপ্লবী দলের পুনরুত্থান বাঙালি নারীর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই প্রথম দেখা গেলো যে, বাঙালি নারী নিজেকে তার পুরুষ সহকর্মীর সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ত্রিশের দশকেই বিপ্লবী

Dhaka University Institutional Repository

দলে দেখা গেলো দু'জন কিশোরী (শান্তি ও সুনীতি) কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করলো, বীনা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে স্বয়ং গভর্নরকে হত্যার প্রচেষ্টা চালান। চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পাহারতলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দিলেন এবং সফল আক্রমণ শেষে আত্মোৎসর্গ করলেন এটা প্রমাণ করবার জন্য যে পুরুষের মতন নারীও প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করবার মত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। বিপ্লববাদ বাংলায় নারী-কমরেড তৈরি করে। বিপ্লবী নারীরা একদিকে যেমন বৃটিশ প্রসাশনের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল তেমনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রধান বাঙালি পুরুষসমাজের অধিকাংশের কাছে এরা ছিলেন অনাকাঙ্খিত। যে কারণে দেখা যায় প্রীতিলতার আত্মত্যাগকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় নি। পরবর্তী সময়ে ত্রিশের দশকের শেষার্ধে সমাজতান্ত্রিক দলের উত্থান ছিল বাঙালি নারীর জন্য যুগান্তকারি ঘটনা। প্রথমত, এই প্রথম কোন রাজনৈতিক দলকে দেখা গেলো নারীমুক্তির লক্ষ্য সামনে রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করতে, দ্বিতীয়ত, এই প্রথম প্রান্তিক নারীসমাজ বা গ্রামীণ অবহেলিত নারীসমাজের কাছে নারীর অধিকারের বার্তা পৌঁছে গেলো। কাজেই কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, বিপ্লবী দলের সশস্ত্র আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক দলের শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার আন্দোলন এই তিন পর্যায়ের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনই নারীকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। ফলে ক্রমান্বয়ে বাঙালি নারী 'মুক্ত নারী' হবার পথে এগিয়ে গেছে।

নারীর রাজনৈতিকায়নের ক্ষেত্রে ধর্ম বড় ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন এবং বিশ শতকের শুরুতে স্বদেশী আন্দোলন পর্বে মুসলিম নারীর অনুপস্থিতি ধর্মীয় ভিন্নতার প্রমাণস্বরূপ। বিশ শতকের সূচনায় দেখা যায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীদের শিক্ষাগ্রহণ অনেকটাই সমাজস্বীকৃত হয়ে ওঠে এবং এই নারীরা স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন। পক্ষান্তরে একই সময়ে আমরা দেখি বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের আহ্বান জানাচ্ছেন সামাজিক শৃংখলের বেড়াজাল ভেঙ্গে শিক্ষার আলোতে এগিয়ে আসবার জন্য, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলীম নারীসমাজ তখনও শিক্ষার আলো বঞ্চিত। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দেখা যায় খুব সামান্যসংখ্যক মুসলিম নারী পর্দা প্রথার বাইবে বের হয়ে আসলেন, এসময়ে মুসলিম নারীসমাজের কল্যাণে আঞ্জুমানে খাওয়াতিনসহ বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। তবে এই পর্যায়েও সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলিম নারী ছিলেন অনুপস্থিত। ত্রিশের দশকে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে মুসলিম নারীর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, হোসনে আরা মোদাব্বের, দৌলতননেছা খাতুন প্রমুখ মুসলিম নারীর বৃটিশবিরোধী রাজনীতিতে সরব উপস্থিতি ও কারো কারো কারাবরণের ঘটনা ত্রিশের দশকে মুসলিম নারীকে সনাতন ভূমিকার বাইরে নিয়ে আসে, যদিও এদের সংখ্যা ছিল প্রতিবেশি সম্প্রদায়ের নারীদের তুলনায় নগণ্য। বিপ্লবী দলেও উল্লেখযোগ্য মুসলিম নারীর দেখা মিলল না। এই ভূমিকার পরিবর্তন আসে চল্লিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হলে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জেলা কমিটির মিটিং এবং মিছিলে সাধারণ মুসলিম নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় (ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত)। কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেখা গেল মুসলিম নারীরা যাতে মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন সে কারণে রাতে কৃষক সমিতির মিটিং ডাকা হলো। অর্থাৎ রাজনীতি যখন গণমানুষের কাছে পৌঁছে তখন ধর্মীয় বিভেদ অনেকটাই ঘুঁচে যায়। সম্ভ্রান্ত বা বংশীয় মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে যেমন পর্দার বিধিনিষেধ বিরাজমান ছিল, খেটে খাওয়া মানুষদের পক্ষে সেই বিধিবিধান পালন সম্ভবপর হয় না, কাজেই এই প্রান্তিক মুসলিম নারীর কাছে যখন শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজের কথা বলা হলো, তখন খুব সহজেই সে তা গ্রহণ করে।

বৃটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীদের প্রধান লক্ষ্য কী ছিল? উপনিবেশিক শাসন শোষণের কবল থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করা, না এর সঙ্গে সঙ্গে নারীর সার্বিক কল্যাণও তাঁরা চেয়েছিলেন। প্রথমত বলা যায়, স্বদেশী পর্যায়ে নারীসমাজের মূল লক্ষ্য ছিল দেশ ও জাতির কল্যাণ। এ পর্যায়ে নারীমুক্তির ভাবনা নেতৃবৃন্দ এবং নারীদের মনে ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন পর্বেও নারীমুক্তি প্রধান লক্ষ্য ছিল না, তবে এ সময় থেকেই নারী সামাজিকভাবে সচেতন হতে শুরু করে, পাশাপাশি নিজের অজ্ঞাতেই বাইরের জগতে নিজের একটি স্থান তৈরি করে নেয়। গড়ে ওঠে লীলা নাগের 'দিপালী সংঘ' এবং লতিকা ঘোষের 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ'। এই সংগঠন দুটি কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশেই নয় বরং সার্বিকভাবে নারীমুক্তির লক্ষে স্থাপিত হয়। এ সময় থেকেই ছাত্রীসমাজ রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করে, গড়ে ওঠে কল্যাণি দাস ও সুরমা মিত্রের নেতৃত্বে 'ছাত্রী সংঘ'। ফলে ভবিষ্যতের নারীনেতৃত্ব তৈরি হয়, আবার এই ছাত্রীরাই সামাজিক বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ শুরু করে, জনপরিবহনে যাতায়াত করে জনমনে নতুন নারীর ধারণা তৈরি করে। ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে বাঙালি নারী সনাতন ভূমিকার বাইরে বের হয়ে আসলো। যদিও এই প্রথাসিদ্ধ ভূমিকার বাইরে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, কিন্তু এর মধ্যদিয়ে নারীর আত্মপোলব্ধির জায়গা তৈরি হয়। আইন অমান্য আন্দোলনে নারীর কারাবরণ একটি বিশেষ ঘটনা। কারাবরণ নারীর জীবনে আত্মপোলব্ধির ও আত্মউন্নয়নের বিশেষ সুযোগ তৈরি করে। বন্দী নারীরা কারাগারে বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে ও নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষে লড়াই করতে শেখে এই কারাগারে। বিপ্লবী দলের নারীদের লক্ষ কেবল দেশমুক্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, নারীমুক্তিও তাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রীতিলতা তাঁর বিদায় বাণীতে স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন যে নারী-পুরুষের বৈষম্য তাঁকে ব্যথিত করেছিল এবং তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর আদর্শে অন্যান্য নারীরা উদ্বুদ্ধ হবে। বিপ্লবী দলে নারী-পুরুষের বৈষম্য অনেকটাই ঘুঁচে গিয়েছিল এবং বিপ্লবী দলের নারীরা অনেকাংশে মুক্ত নারীর স্থানে যেতে পেরেছিলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও তাঁদের ছিল। বীনা দাস তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে, গভর্নরকে গুলি করবার সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে এসে দেখা গেলো প্রান্তিক নারীর কাছে রাজনীতি হয়ে ওঠে নারীমুক্তির মাধ্যম। কাজেই বলা যায় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

দেশমুক্তি ছিল প্রধান লক্ষ্য, তবে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, তাদের ভূমিকায় পরিবর্তন আসে এবং এর মধ্যদিয়ে বাঙালি নারীসমাজ সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে নারীর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হতে থাকে। নারীমুক্তি মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়েও এভাবেই রাজনৈতিকায়ন বাঙালি নারীকে মুক্ত নারীর ধারণায় অনুপ্রাণিত করে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, উনিশ শতকে সংস্কার আন্দোলন বাঙালি নারীর জীবনের মানোন্নয়নে যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে তা ছিল পিতৃতান্ত্রিকতার ভিন্নরূপ বা 'মডারেট' পিতৃতন্ত্র। যা নারীকে পুরুষের ইচ্ছানুযায়ি পুনঃসজ্ঞায়িত করে। সংস্কারযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এর মধ্যদিয়ে, ফলে নারীপ্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। নারী সম্পৃক্ত হয় উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে। এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী তাঁর সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজমানসে নারীর চিরন্তন যে চিত্র তা পরিবর্তনে সমর্থ হন। নারীর সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারসহ পতিতালয় উচ্ছেদের দাবি এই সময়ে সামনে আসে। তিরিশের দশকে নারীরা পৃথক মহিলা কংগ্রেসের দাবিও তোলেন। কৃষক আন্দোলনে প্রান্তিক নারীকে সম্পত্তির অধিকার কিছুটা ভিন্নরূপে ফিরিয়ে দেয়। এই সময়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হলো কৃষক রমণী তার আঙ্গিণায় যে ফল-মূল, সব্জী উৎপাদন করে বিক্রি করে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ কৃষক রমণীর 'স্ত্রীধন'। নারী নির্যাতন বা বউ পেটানোকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় একই সময়ে। মনিকুন্তলা সেন বর্ণনা করেছেন কিভাবে বিধবা বাতাসী কৃষকনেত্রী বিমলা মাজি তে রূপান্তরিত হয়। এসব সমাজ পরিবর্তনের সূচক। অর্থাৎ সুনিশ্চিভাবে বলা যায় যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন নয়, বরং বিশ শতকে পর্যায়ক্রমে সামাজিক ক্ষেত্রে এবং এর মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের ফলে বাঙালি নারীসমাজ ক্রমেই নিজেদের অধঃস্তনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় রত হয়। উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রমজীবি নারীর সচেতন উত্থানের মধ্যদিয়ে বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের একটি পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এই সাড়ে চার দশকে বাংলার নারীসমাজের প্রাপ্তি কী? এর উত্তর পাওয়া যায় বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক নারীনেত্রী মনিকুন্তলা সেনের বর্ণনায়– মনিকুন্তলার দিদিমা রাস্তার উল্টো দিকের বাড়িতে যেতেন বদ্ধ পালকিতে চড়ে, তাঁর মা যেতেন একগলা ঘোমটা টেনে, একদৌড়ে নির্জন রাস্তা পার হয়ে, আর চল্লিশের দশকে মনিকুন্তলা সেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমাবেশ করেছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন নিশ্চিতভাবে পর্দা ত্যাগ করে। বাঙালি নারীর এই অর্জন তার রাজনৈতিকায়নের সামাজিক প্রতিক্রিয়ারই অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

১৯২১ ও ১৯২৫-এ বঙ্গীয় আইন সভায় নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে-বিপক্ষে ব্যক্তির অবস্থান ঃ-

56 Legislators who voted against female suffrage in 1921 by religious affiliation and constituency

Name	Religion	Constituency
Addy, Babu Amulya Dhone	H	Bengal National Chamber of Commerce
Afzal, Nawabzada K.M. Khan Bahadur	M	Dacca City (M)
Ahmed, Khan Bahadur Maulvi Wasimuddin	M	Pabna (M)
Ahmed, Maulvi Azaharuddin	M	Backarganj West (M)
Ahmed, Maulvi Emaduddin	M	Rajshahi South (M)
Ahmed, Mr. M	M	Faridpur South (M)
Ahmed Maulvi Rafi Uddin	M	Jessore South (M)
Ahmed, Munshi Jafar	M	Noakhali (M)
Aley, Shaikh Mahboob	M	Not indicated
Ali, Maulvi Syed Muksood (M)	M	24 Parganas North Municipal
Ali, Mr. Syed Nasim	M	24 Parganas Rural (M)
Ali, Munshi Amir	M	Chittagong (M)
Ali, Munshi Ayub	M	Chittagong (M)
Arhamuddin, Maulvi Khandakar (M)	M	Mumensingh West
Azam, Khan Bahadur Khwaja Mohamed	M	Dacca East Rural (M)
Barma, Rai Sahib Panchanan	H	Rangpur (N-M)
Birla, Babu Ganeshyamdas Marwari	H	Nominated Non-official
Chaudhuri, Khan Bahadur Maulvi Hafizar Rahman	M	Bogra (M)
Chaudhuri, Maulvi Shah Muhammad	M	Malda cum jalpaiguri (M)
Chaudhuri, Rai Harendranath	H	24 Pargans Rural North (N-M)
Chaudhuri, the Hon'ble the Nawab Saiyid Nawab Ali, Khan Bahadur	M	Mymensingh East (M)
Das, Babu Bhishmadev	H	Nominated non-official-depressed classes
Donald, Mr.J.	C	Nominated official
Doss, Rai Bahadur Pyari Lal	H	Dacca City (N-M)
French, Mr. F.C.	C	Nominated official
Ghatak, Rai Sahib Nilmani	H	Malda (N-M)
Ghose, Rai Bahadur jogendra Chunder	H	Calcutta University

Dhaka University Institutional Repository

Hopkvns. Mr. W.S.	C	Nominated official
Karim, Maulvi Abdul	M	Faridpur North (M)
Karim, Maulvi Fazal	M	Backarganj South (M)
Kerr, the Hon'ble Mr. J.H	C	Nominated official –Member Exce
Council		
Khan, Babu Devendra Lal	H	Midnapore North (N-
M)		
Khan, Maulvi Hamid-ud-din	M	Rangpur East (M)
Khan Chaudhuri, Khan Bahadur	M	Rajsahi North (M)
Maulvi Muhammad Ershad Ali		
Maharajadhiraja Bahadur of Burdwan,	H	Member Exec Council Nominated
official.		
the Hon'ble		
Mukharji, Babu Satish Chandra	H	Hoogly cum Howrah Rural (N-
M)		
Mukhopadhaya, Babu Sarat Chandra	H	Midnapore South (N-M)
Mullick, Babu Nirode Behary	H	Backarganj South (N-M)
Nakey, Mirza Muhammad Ali	M	24 Parganas Municipal South
(M)		
O' Kinealy, Lt.-Col, Frederick	C	Nominated official
O' Malley, Mr, L.S.S.	C	Nominated official
Pahlowan, Maulvi Md. Abdul Jubbar	M	Mymensingh West
(M)		
Poddar, Babu Keshoram	H	Bengle Marwari Association
Rauf, Maulvi shah Abdur	M	Rangpur West (M)
Ray, Babi Surendra Nath	H	24 Parganas Municipa South
(N-M)		
Ray, Kumar Shib Shekhareswar	H	Rajshahi Landholders
Roy, Mr. Bijoy Prosad Singh	H	Burdwan (N-M)
Roy, Babu Jogendra Krishna	H	Faridpur South (N-M)
Roy, Maharaja Bahadur	H	Nadia (N-M)
Roy, Rai Bahadur Lalit Mohan Singh	H	Burdwan Landholders
Roy, Raja Maniloll Singh	H	Burdwan (N-M)
Roy Chaudhuri, Babu Sailaja Nath	H	Khulna (N-M)
Sarkar, Babu Rishindra Nath	H	Bankura West (N-M)
Suhrawardy, Dr. A.	M	Dacca West Rural (M)
Suhrawardy. Dr. Hasan	M	Hoogly cum Howrah
Municipal (M)		
Suhrawardy, Mr. Huseyn Shaheed	M	Burdwan South (M)

Dhaka University Institutional Repository

H	-Hindu
M	-Muslim
C	-Christian
(M)	-Muslim constituency
(N-M)	-Non-Muslim constituency

23 Hindus, 27 Muslims and 6 Christians voted against.

37 Legislators who voted in favour of female suffrage in 1921 by religious affiliation and constituency

Name	Religion	Constituency
Ahmed, Maulvi Yakuiniddin	M	Dinajpur (M)
Ali, Maulvi A.H.M. Wazir	M	Backarganj North (M)
Ali, Mr. Syed Erfan	M	Nadia (M)
Banerjea, The Hon'ble Sir	H	24 Parganas Municipal (N-M)
Banerjee, Rai Bahadur Abinash Chanada	H	Birbhum (N-M)
Barton, Mr. H.	H	Anglo-Indian
Basu, Babu Jatindra Nath	H	Calcutta North (N-M)
Bose, Mr. S.M	H	Mymensingh East (N-M)
Charmakar, Babu Rasik Chandra	H	Noakhali (N-M)
Das, Mr. S.R.	H	Calcutta North West (N-M)
Das Cupta, Babu Nibaran Chandra	H	Backarganj North (N-M)
De, Babu Fanindralal	H	Hoogly cum Howrah Rural (N-M)
Dutt, Mr. Ajoy Chunder	H	Bankura East (N-M)
Dutta, Babu Indu Bhushan	H	Tippera (N-M)
Faroqui, Mr. K.C.M.	M	Tippera (M)
Ghose, Mr. D.C.	H	24 Parganas Rural South (N-M)
Gordon, Mr. A.D.	C	Indian Tea Association
Huq. Maulvi A.K. Fazlul	M	Khulna (M)
Khan, Maulvi Md. Rafique Uddin	M	Mymensing East (M)
Khan, Mr. Razaur Rahman	M	Calcutta North (M)
Lang. Mr.J.	C	Nominated Official
Larmour, Mr. F.A.	C	Calcutta Trades Association

Dhaka University Institutional Repository

Makramali, Munshi	M	Noakhali (M)
Mc Kenzie, Mr. D.P.	C	Indian Hute Mills Association
Mitter, the Hon'ble Mr. P.C.	H	Presidency
Landholders		
Moitra, Dr. Jatindra Nath	H	Faridpur North (N-M)
Mukherji, Professor S.C.	C	Nominated Non-official-Indian
Mullick, Babu Surendra Nath	H	Calcutta South (N-M)
Raikat, Mr, Prasanna Deb	H	Jalpaiguri (N-M)
Ray, Babu Bhabendra Chandra	H	Jessore North (N-M)
Ray, Rai Bahadur Upendra Lal	H	Chittagong
Landholders		
Ray Chaudhuri, Mr Krishna Chandra	H	Nominated Non-official-
Labour		
Ray Chaudhury, Raja Manmatha Nath	H	Mymensingh West
(N-M)		
Roy, Babu Jogendra Nath	H	Dacca Rural (N-M)
Roy, Babu Nalini Nath	H	Jessore South (N-M)
Roy, Mr. J.E.	C	Bangal Chamber of commerce
Stark, Mr.H.A	C	Anglo-Indian

H	-Hindu
M	-Muslim
C	-Christian
(M)	-Muslim constituency
(N-M)	-Non-Muslim constituency

21 Hindus, 8 Muslims and 8 Christians voted in favour.

Votes of British Legislators on Female Suffrage in 1921

Name	**Constituency**	**Vote**
Donald, Mr. J	Nominated official	anti
French, Mr. F.C.	Nominated official	anti
Gordon, Mr. A.D.	Elected-Indian Tea Association	pro
Hopkyns, Mr.W.S.	Nominated official (Member Exec Council)	anti
Lang, Mr. J.	Nominated official	pro
Larmour, Mr. F.A.	Elected-Calcutta Trades Association	pro
McKenzie, Mr. D.P.	Elected-Indian Jute Mills Assoc	pro

Dhaka University Institutional Repository

O' Kinealy, Lt, Col. Frederick	Nominated official	anti
O' Malley, L.S.S.	Nominated official	anti
Roy, Mr. J.E.	Elected-Bengal Chamber of Commerce	pro

Source: BLCP, vol, IV (Sept, 5, 1921), p, 476.

Of the 11 British legislators 6 voted against and 5 voted in favour. Among the nomineted officials 6 out of 7 voted against. All elected British legislators voted in favour.

Legislators voting for and against female suffrage, 1925

YES

Ahmed, Maulvi Najmuddin
Ahmed, Maulvi Zannoor
Bagachi, Babu Romes Chandra
Banerjee, Dr. Pramathanath
Banerjee, Rai Bahadur Abinash Chandra
Barton, Mr. H.
Basu, Babu Jatindra Nath
Birely, Mr. L.
Bose, Babu Bejoy Krishna
Chatterjee, Babu Umes Chandra
Chaudhuri, Maulvi Saiyed Abdur Rob
Chunder, Mr. Nirmal Chandra
Das, Babu Charu Chandra
Das, Dr. Mohini Mohan
Das Gupta, Dr. J.M.
Datta, Babu Akhil Chandra
Daud, Mr. M.
De, Mr. K.C.
Gafur, Maulvi Abdul
Ganguly, Babu Khagendra Nath
Guha, Mr. P.N.
Haldar, Mr. S.N.
Hossain, Maulvi Wahed
Haq, Maulvi Ekramul
James, Mr. F.E.
Joardar, Maulvi Aftab Hossain
Khaitan, Babu Debi Prosad
Khan, Babu Devendra Lal
Khan, Maulvi Abdur Raschid
Khan, Maulvi Mahi Uddin
Liddell, Mr. H.C.
Mitra, Babu Jogendra Nath
Mitter, Sir P.C.
Moreno Dr. H.W.B.
Mukerjee, Babu Taraknath
Nasker, Babu Hem Chandra
Neogi, Babu Manmohan
Quader, Maulvi Abdul
Raikat, mr. Prasanna Deb
Ray, Babu Abanish Chandra
Ray, Dr. Kumud Sankar
Ray, Chaudhuri, Mr. K.C.
Ray Chaudhury, Raja Manmatha Nath
Roy, Dr. Bidhan Chandra
Roy, Mr. Kiran Sankar
Salam, Khan Bahadur Maulvi Abdus
Sarkar, Babu Hemanta Kumar
Sarker, Babu Nalini ranjan
Sen, Mr. N.C.
Sen Gupta, Mr. J.M.
Suhrawaerdy, Dr. A.
Wilson, Lt. Col. R.P.
Woodhead, Mr. J.A.

Dhaka University Institutional Repository

NOES

Addams-Williams. Mr.C.

Addy, Babu Amuly Dhone

Ahamad, Maulvi Asimuddin

Ahmed, Maulvi Tayebuddin

Ali, Maulvi Sayyed Sultan

Banerjee, Mr. A.C.

Barma, Rai Sahib Panchanan

Chakravorty, Babu Sudarsan

Chaudhuri, Rai Harendranath

Chaudhuri, Nawab Bahadur Saiyid Nawab Ali, Khan Bahadur

Chaudhury, Maulvi Md. Nurul Haq

Chowdhury, Maulvi Fazlal Karim

Dey, Babu Boroda Prosad

Doss, Rai Bahadur Pyari Lal

Doss, Rai Bahadur Pyari Lal

Forrester, Mr. J. Campbell

Ghuznavi Hadji, Mr. A.K.

Haq, Kahn Bahadur Kazi Zahirulo

Haq, Shah Syed Emdadul

Hoque, Maulvi Sayedul

Hossain, Khan Bahadur Maulvi Musharruf

Lal Mohammed, Haji

Lindsay, Mr. J.H.

Maity, Babu mahendra Nath

Masih, Mr. Syed M.

Nazimuddin, Khaje

Oaten, Mr. E.F.

Pahlowan, Maulvi Md. Abdul Jubbar

Rahim, The Hon'ble Sir Abdur

Rahman, Mr. A.F.

Ray, Babu Nagendra Narayan

Ray, Babu Surendra Nath

Roy, The Hon'ble Maharaja Kshaunish Chandra

Roy, Mr. D.N.

Roy, Raja Maniloll Singh

Sarkar, Maulvi Allah Bukhsh

Stephenson, The Hon'ble Sir Hugh

Suhrawardy, Mr. H.S.

Tarafdar, Maulvi Rajib Uddin

Dhaka University Institutional Repository

*Source: BLCP, vol XVIII (19 August, 1925), p. 307.

Of the 92 legislators who voted, 54 supported Women Suffrage and 38 voted against

Votes of Legislators who were present for both the 1921 and 1925 vote on Female Suffrage in the Bengal Legislative Council

Name	1921 vote	1925 vote
Amulya Dhane Addy	anti	anti
Abinash Chandra Banerjee, Rai Bahadur	pro	pro
Panchanan Barma, Rai Sahib	anti	pro
H. Barton	pro	pro
Jatindra Nath Basu	pro	pro
Harendranath Chaudhuri, Rai	anti	anti
Saiyid Nawab Ali Chaudhuri	anti	anti
Pyari Lal Doss, Rai Bahadur.	anti	anti
Devendra Lal Khan	anti	pro
P.C. Mitter	pro	pro
Md. Abdul Jabbar Pahlowan, Maulvi	anti	anti
Prasanna Dab Raikat	pro	pro
Surendra Nath Ray	anti	anti
K.C. Ray Chaudhuri	pro	pro
Manmatha Nath Ray Chaudhury, Raja	pro	pro
Kshaunish Chandra Roy, Maharaja	anti	anti
Maniloll Singh Roy, Raja	anti	anti
A, Suhrawardy, Dr.	anti	anti
H.S. Suhrawardy	anti	anti

Source: BLCP, vol, IV (Sept 5, 1921), p. 416, BLCP, vol. XVIII, (August 19, 1925), p. 307.

Of the 19 legislators who voted on both resolutions, 17 were consistent.

সূত্র : Barbara Southard, *The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal: The quest for political rights, Education and social reform legislation*, p:132-143

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানের মহিলাগণ ১৯৩০ সালের লবন আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন, তাদের নামের তালিকা কমলা দাশগুপ্ত দিয়েছেন যা নিম্নরূপ :

কলিকাতা (১৯৩০)

১. নির্ঝরিণী সরকার (১৯৩০,১৯৩২)
২. সরোজবাসিনী সাহা
৩. ছায়ারানী দেবী
৪. সুরুচি গুহ রায়
৫. পুষ্প নন্দী
৬. লাবন্য মিত্র
৭. সুন্দর দেবী
৮. গঙ্গা দেবী
৯. কিষেণ দেবী
১০. দেশকালী ছেত্রিনী
১১. নারায়ণী কাউর
১২. মলিনা গুপ্ত
১৩. সরযুবালা সেন
১৪. শেভনা রায়
১৫. সুবর্ণ সেন
১৬. গিরিবালা রায়
১৭. কনকলতা দাস
১৮. শতদলবাসিনী দত্ত
১৯. নন্দরানী ধর
২০. উজ্জয়িনী দেবী
২১. ইন্দুবালা দেবী
২২. দয়াকুল দেবী
২৩. আরতি মুখোপাধ্যায়
২৪. সুনীতি দাস
২৫. হিরন্ময়ী ঘোষ
২৬. শেখরবাসিনী সাহা
২৭. মায়া নন্দী
২৮. গোদাবরী বেন
২৯. ওয়াজিয়া বাই
৩০. সুপ্রভা দেবী
৩১. সরযু দেবী
৩২. তারা দেবী
৩৩. ভগবান দেবী
৩৪. যশোদা দেবী
৩৫. লীলাবতী দেবী
৩৬. যমুনা বাই
৩৭. পুষ্প বাই
৩৮. প্রমীলা বাই
৩৯. প্রিয়ম্বদা দেবী
৪০. শৈলবালা দেবী
৪১. কুন্দরানী সুরিতা
৪২. সুরমা মুখোপাধ্যায় (১৯৩০, ১৯৩২)
৪৩.সুষমা মুখোপাধ্যায় (১৯৩০, ১৯৩২)
৪৪. কমলা বিশ্বাস
৪৫. মথুরা বাই
৪৬. সন্তোষবাসিনী গুহ
৪৭. সোহম্ দেবী
৪৮. বিন্দুবালা
৪৯. শান্তবালা দাসী
৫০. ক্ষীরোদাসুন্দরী দাসী
৫১. মনোরমা দাসী
৫২. অম্বালিকা রায়
৫৩. মানদা সেন
৫৪. সরলা চক্রবর্তী
৫৫. শিউবাসিনী গুহ রায়
৫৬. শান্তা দেবী
৫৭. লাবন্যপ্রভা দেবী
৫৮. চপলা সেন
৫৯. অম্মা জান
৬০. দুর্গাবতী দাসগুপ্ত (১৯৩০, ১৯৩২)
৬১. কুন্দ মিত্র
৬২. প্রীতিলতা দাস
৬৩. সরলা সরকার
৬৪. সরস্বতী দাশগুপ্ত (মিত্র)
৬৫. অরুণা দাশগুপ্ত
৬৬. অমিতা দত্ত
৬৭. সরযুবালা দত্ত
৬৮. আভা দে
৬৯. ছায়া চট্টোপাধ্যায়
৭০. পুষ্পরানী নন্দী
৭১. সুরুচি সিংহ রায়
৭২. সরযূ সেন
৭৩. সীতা ঘোষ
৭৪. লক্ষীমণি দেবী
৭৫. বসন্ত বেন
৭৬. যমুনা বেন
৭৭. রতনদেবী জেঠী
৭৮. লক্ষীদেবী কাপুর
৭৯. লক্ষীদেবী শর্মা
৮০. গঙ্গাদেবী মেহতা
৮১. কৌশল্যা বেন
৮২. যজ্ঞেশ্বরী দেবী
৮৩. কৃষ্ণা দেবী
৮৪. দেওকালী দেবী
৮৫. সুন্দর বাই
৮৬. শান্তা বেন
৮৭. প্রমীলা বেন
৮৮. পুষ্পবতী বেন
৮৯. সরস্বতী গুপ্তা
৯০. সজ্জন দেবী মহনোত
৯১. শ্রীমতী মহনোত

কলিকাতা (১৯৩২)

৯২. জ্যোৎস্না মিত্র
৯৩. গিরিজাবালা দত্ত
৯৪. রমা দেবী
৯৫. কুমুদিনী দাসী
৯৬. ব্রিজরানী দেবী
৯৭. কৃষ্ণা মিত্র
৯৮. রুক্মিণী বেন
৯৯. হরি বেন
১০০. বাচ্চু বেন
১০১. সরলাবালা দেবী
১০২. রামকুমারী বেন
১০৩. লক্ষ্মী আচার্য
১০৪. বিভা দত্ত
১০৫. অনিতা দত্ত
১০৬. বিভাবতী দাশগুপ্তা
১০৭. কৌশল্যা দেবী
১০৮. সজ্জন দেবী
১০৯. লক্ষী দেবী
১১০. বাসন্তী দেবী
১১১. বীণাপাণি পাল
১১২. শীতলকুমারী দেবী
১১৩. গোদাবরী দেবী
১১৪. পদ্মাবতী দেবী
১১৫. সুভদ্রা দেবী
১১৬. প্রভাবতী দেবী
১১৭. হীরামণ বিবি
১১৮. হাজিমন্নেসা খাতুন
১১৯. সুলতা রায়
১২০. সান্তনা রায়
১২১. আভারঙ্গী দেবী
১২২. অনা দেবী
১২৩. বিনোদিনী ঘোষ
১২৪. উজ্জম বেন
১২৫. শৈলবালা ঘোষ
১২৬. গৌরী দেবী
১২৭. রাজেশ্বরী দেবী
১২৮. প্রভাবতী সরকার
১২৯. কুঞ্জরানী দাসী
১৩০. হোসেন্নেসা বেগম
১৩১. চন্দ্রাবতী দেবী

Dhaka University Institutional Repository

১৩২. নলিনীবালা মাইতি
১৩৩. প্রীতিলতা ঘোষ
১৩৪. মুন্নী দেবী
১৩৫. কলালক্ষী ঘোষ
১৩৬. নলিনীপ্রকাশ ঘোষ
১৩৭. সরযু দেবী
১৩৮. গঙ্গাদেবী ক্ষেত্রী
১৩৯. কমলা রায়
১৪০. বীনাপানি সরকার
১৪১. চপলাবালা সেন
১৪২. সুনীতাবালা দাশগুপ্ত
১৪৩. সরোজিনী মিত্র
১৪৪. রাধারানী দে
১৪৫. সুধারানী দে
১৪৬. অনিমা ভট্টাচার্য
১৪৭. বীনা দাশগুপ্ত
১৪৮. শান্তি নিয়োগী
১৪৯. যামিনীসুন্দরী দাসী
১৫০. তারাদেবী খান্না
১৫১. সরোজিনী সেন
১৫২. সত্যবালা দাসী
১৫৩. যশোদাবালা মল্লিক
১৫৪. কুমুদিনী মিত্র
১৫৫. রাধারানী দেবী
১৫৬. ইন্দুবালা দত্ত
১৫৭. কমলিনী দেবী
১৫৮. এলোকেশী দাস
১৫৯. বীনাপানি গোস্বামী
১৬০. নুনুজদলনী গোস্বামী
১৬১. পরিতোষবালা দেবী
১৬২. কুশাঙ্গিনী দরাই
১৬৩. সুশীলাবালা দেবী
১৬৪. ননীবালা দেবী
১৬৫. লীলাবতী কাপুর
১৬৬. দক্ষবালা দেবী
১৬৭. মতিবালা দেবী
১৬৮. মলিনা দেবী
১৬৯. পদ্মা দেবী
১৭০. শহীদা খান
১৭১. কমলিনী সরকার
১৭২. বীনাপাণি দেতু
১৭৩. তারাদেবী সুন্দরী
১৭৪. কমলারানী সরকার
১৭৫. প্রভাবতী দে সরকার
১৭৬. শৈবলিনী দেবী
১৭৭. হোসেনারা বেগম
২৪ পরগনা (১৯৩২)
১৭৮. শিবকালী দেবী
১৭৯. অমলা দেবী
১৮০. মাতঙ্গিনী করণ
হাওড়া (১৯৩২)
১৮১. সুশীলা দেবী
১৮২. হীরালক্ষ্মী দেবী
১৮৩. লক্ষ্মী বাই
১৮৪. নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৫. হরিদাসী চট্টোপাধ্যায়
১৮৬. লীলাবতী দেবী
১৮৭. বীনাপাণি দে
১৮৮. কমলিনী সরকার
১৮৯. সুষমা মুখোপাধ্যায়
১৯০. সুরমা মুখোপাধ্যায়
১৯১. কুমুদিনী দাসী
১৯২. সুকুমারী মুখোপাধ্যায়
১৯৩. করুণাময়ী দেবী (১৯৩০, ১৯৩২)
হুগলী (১৯৩২)
১৯৪. চারু দাসী
১৯৫. বিনয়বালা দেবী
১৯৬. বরদা দাসী
১৯৭. রতনবালা দাসী
১৯৮. আতরবালা দাসী
১৯৯. এককড়িবালা ঘোষ
২০০. বরদাময়ী দাসী
বীরভূম (১৯৩২)
২০১. সত্যবালা দেবী
বর্ধমান (১৯৩২)
২০২. বীনাপানি দেবী
২০৩. সরসীবালা দাসী
২০৪. নির্মলাবালা সান্যাল
২০৫. শিবানীবালা দেবী
২০৬. দুর্গারানী দেবী
২০৭. সুবাসিনী চন্দ
২০৮. জ্ঞানপ্রভা দেবী
২০৯. কমলেকামিনী দেবী
২১০. সুষমা দেবী
২১১. মঞ্জুরানী ঘোষ
বাঁকুড়া (১৯৩২)
২১২. বসন্তকুমারী দেবী
২১৩. তিনকড়িবালা দাসী
২১৪. সুহাসিনী দাসী
২১৫. বিন্দুবাসিনী দাসী
২১৬. সরোজিনী বাগচী
২১৭. চারুবালা দাসী
২১৮. ইন্দুমতি ঘোষ
২১৯. উষারানী দেবী
২২০. রামদুলালী দেবী
২২১. হেমনলিনী দেবী
২২২. হিরন্ময়ী রায়
২২৩. লক্ষ্মীপ্রিয়া রায়
২২৪. চারুবালা দেবী
২২৫. সরসী দেবী
২২৬. কিরণবালা কর্মকার
২২৭. সরযূবালা বাগ্‌লী
২২৮. দক্ষবালা দেবী
২২৯. রাধারানী দেবী
নদীয়া (১৯৩২)
২৩০. নির্মলনলিনী ঘোষ
২৩১. অপর্ণা অধিকারী
২৩২. বিভারানী দাসী
২৩৩. সুপ্রীতি মজুমদার
২৩৪. সাবিত্রী দেবী
২৩৫. হরিদাসী বৈষ্ণবী
২৩৬. লীলাবতী দেবী
২৩৭. মৃণালিনী দে
২৩৮. উষালতা দেবী
২৩৯. প্রমোদা দাসী
২৪০. নন্দরানী বিশ্বাস
২৪১. সাবিত্রী দাস
২৪২. দুর্গারানী দেবী
২৪৩. মৃণালিনী সান্যাল
মুর্শিদাবাদ (১৯৩২)
২৪৪. জ্যোতির্ময়ী বাগচী
২৪৫. বেলারানী দাসী
২৪৬. প্রমীলা দেবী
২৪৭. কমলা বসু
২৪৮. সরসীবালা দেবী
২৪৯. মৃণালিনী দেবী
২৫০. কালিদাসী দেবী
২৫১. কিরণশশী দেবী
২৫২. কমলা দেবী
২৫৩. হেমনলিনী চৌধুরী
২৫৪. আশালতা দেবী
২৫৫. বীনাপানি দেবী
যশোহর (১৯৩২)
২৫৬. উষারানী ঘোষ
২৫৭. মনোরমা বসু
২৫৮. সরোজিনী ঘোষ
২৫৯. রাজপ্রিয়া ঘোষ
২৬০. শৈলবালা ঘোষ
২৬১. শৈলবালা আশ
২৬২. বনলতা বসু
২৬৩. অমিয়ারানী ধর
২৬৪. হেমনলিনী ঘোষ
২৬৫. সরোজিনী দে
২৬৬. তরুলতা মারিক
২৬৭. কালিদাসী বন্দ্যোপাধ্যায়
খুলনা (১৯৩২)
২৬৮. চারুবালা বসু
বরিশাল (১৯৩২)
২৬৯. সরযূবালা সেন
২৭০. লাবন্যপ্রভা দাশগুপ্ত
২৭১. লাবন্যপ্রভা দত্ত
২৭২. গোলাপবাসিনী দাস
২৭৩. মনোরমা বসু
২৭৪. শৈলবালা দাস
২৭৫. যোগমায়া দত্ত (১৯৩২, ১৯৪২)

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াখালি (১৯৩২)
২৭৬. কমলকামিনী ঘোষ
২৭৭. কিরণপ্রভা চৌধুরী
২৭৮. বনলতা সরকার
চাঁদপুর (১৯৩২)
২৭৯. বিভাবতী ঘোষ
ঢাকা (১৯৩২)
২৮০. কিরণবালা কুশারী
২৮১. বিরজাসুন্দরী বসু
২৮২. সরোজিনী ঘোষ
২৮৩. অনুপমা ঘোষ
২৮৪. উষাবালা দেবী
২৮৫. সরোজিনী দত্ত
২৮৬. কুসুমকুমারী ঘোষ
২৮৭. সরোজিনী সরকার
২৮৮. স্বর্ণমঙ্গলা দেবী
৩৮৯. সুখলতা দাসগুপ্ত
২৯০. সুরবালা দে
২৯১. রাধারানী সাহা
২৯২. কিরণবালা সাহা
২৯৩. প্রতিভা সেন
২৯৪. ব্রজবালা দেবী
২৯৫.ছায়া রায়
২৯৬. লাবন্যপ্রভা গুহ
২৯৭. কুসুমকামিনী ঘোষ
২৯৮. হেমনলিনী গঙ্গোপাধ্যায়
২৯৯. কমলা দেবী
৩০০. গিরিবালা ঘোষ
৩০১. শোভনাময়ী সরকার
৩০২. প্রভাবতী রায়
৩০৩. সরযুবালা দেবী
৩০৪. হেমনলিনী সেন
৩০৫. নীহারকনা ঘোষ
৩০৬. চারুবালা দে সরকার
৩০৭. নৈশপ্রভা দেবী
৩০৮. মৃণালিনী দেবী
৩০৯. সরলা দেবী
৩১০. হিরন্ময়ী ঘোষ
৩১১. উত্তমা মজুমদার
৩১২. সর্বসুন্দরী পাল
৩১৩. সরোজিনী দে
৩১৪. তরুবালা পাল
৩১৫. শান্তিবালা কর
৩১৬. হেমলতা আচার্য
৩১৭. চপলা দেবী
৩১৮. মাখনবালা সরকার
৩১৯. সুরুচি দেবী
৩২০. সরমা মুখোপাধ্যায়
৩২১. হেমাঙ্গিনী দেবী (২জন)
৩২২. সুহাসিনী দেবী
৩২৩. হিরণবালা দেবী
৩২৪. প্রভা সেন
৩২৫. সুরবালা সেন
৩২৬. সুরবালা দাসগুপ্ত
৩২৭. প্রভাবতী দেবী
৩২৮. নগেন্দ্রবালা সেন
৩২৯. বিধুমুখী সোম
৩৩০. মানদা দেবী
৩৩১. লাবন্য দাশগুপ্ত
৩৩২. সরযুবালা সরকার
৩৩৩. প্রভাবতী চন্দ
৩৩৪. জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী
৩৩৫. সুরবালা দেবী
৩৩৬. কাদম্বিনী দেবী
৩৩৭. প্রভাবতী সরকার
৩৩৮. পুরবালা সরকার
৩৩৯. অমিয়বালা সরকার
৩৪০. সর্বমঙ্গলা দেবী
৩৪১. সুনীতি সেনগুপ্ত
৩৪২. সৌদামিনী শীল
৩৪৩. ইন্দুমতী দেবী
৩৪৪. সুতৃষ্ণা বসু
৩৪৫. চিনুবালা বসু
৩৪৬. মনোরমা বর্ধন
৩৪৭. সুহাসিনী সোম
৩৪৮. জ্যোৎস্নাময়ী মিত্র
৩৪৯. মমতাবালা দে
৩৫০. টগরবালা সরকার
৩৫১. স্নেহলতা দেবী
৩৫২. হেমনলিনী দেবী
৩৫৩. সুহাসিনী দাস
৩৫৪. জগৎতারা দেবী
৩৫৫. কামিনীবালা দেবী
৩৫৬. সাবিত্রীবালা দাস
৩৫৭. প্রিয়বালা দেবী
৩৫৮. শরৎকামিনী সরকার
৩৫৯. হেনারানী মজুমদার
৩৬০. জ্ঞানদাসুন্দরী রুদ্র
৩৬১. হেমাঙ্গিনী রুদ্র
৩৬২. পুটু দে সরকার
৩৬৩. কিরণবালা দেবী
৩৬৪. সুরমা মুখোপাধ্যায়
৩৬৫. নীহারমালা গঙ্গোপাধ্যায়
৩৬৬. মোক্ষদাসুন্দরী দে
৩৬৭. যশোদাসুন্দরী দে
৩৬৮. অবলাবালা দে
৩৬৯.প্রমদাসুন্দরী দেবী (নির্মলা দে)
৩৭০. শান্তিবালা গুপ্তা
৩৭১. ষোড়শীবালা দে
৩৭২. মানদা মল্লিক
৩৭৩. উত্তমা ধুপী
৩৭৪. বিজনবালা দে
৩৭৫. সুহাসিনী দত্ত
৩৭৬. চপলা দত্ত
৩৭৭. সরযুবালা দত্ত
৩৭৮. কামিনীবালা দত্ত
৩৭৯. পূর্ণিমা দে
৩৮০. কামিনী দে
৩৮১. জ্ঞানদা দে
৩৮২. প্রমদা দাস
৩৮৩. নির্মলা দাস
৩৮৪. মহামায়া দত্ত
৩৮৫. সুধাবালা দত্ত
৩৮৬. সুরবালা গুপ্তা
৩৮৭. শৈবলিনী দাস
৩৮৮. সুষমা দাস
৩৮৯. শোভারানী দত্ত
৩৯০. বীনাপাণি দেবী
৩৯১. সুনীতি দে
৩৯২. বিনোদা দে
৩৯৩. বাসন্তী দেবী
৩৯৪. সুকুমারী শীল
৩৯৫. হিরণপ্রভা সরকার
৩৯৬. বাসন্তী ঘোষ
৩৯৭. মৃণালিনী দে
৩৯৮. শান্তিবালা সেন
৩৯৯. নয়নবালা গুহ
৪০০. আশালতা দে
৪০১. বিন্দুবাসিনী দেবী
৪০২. সরযু মুখুটি
৪০৩. মনোরমা দাশগুপ্তা
৪০৪. প্রমদাসুন্দরী সেন
৪০৫. সুবর্ণময়ী সরকার
৪০৬. শান্তমণি ভাওয়াল
৪০৭. রাইসুন্দরী দেবী
৪০৮. ক্ষ্যান্তকালী দেবী
৪০৯. সুকুমারী দত্ত
৪১০. আশালতা দেবী
৪১১. রণদক্ষিণা দাস
৪১২. ক্ষীরোদাসুন্দরী দাস
৪১৩. কুসুমকুমারী দেবী
৪১৪. স্নেহলতা নাগ
৪১৫. হরিদাসী দে
৪১৬. হরিদাসী দত্ত
৪১৭. প্রভাসলক্ষী দেবী
৪৪১৮. শরৎকামিনী দে
৪১৯. সুমতিবালা দে
৪২০. ইচ্ছাময়ী দেবী
৪২১. স্নেহলতা রায়
৪২২. ক্ষীরোদাসুন্দরী রায়
৪২৩. প্রফুল্লবালা কুন্ডু
৪২৪. মনোবাসিনী দেবী
৪২৫. সুনীতিবালা কর
৪২৬. কনকপ্রভা রায়
৪২৭. হেমলতা আচার্য
৪২৮. হরিদাসী দেবী

Dhaka University Institutional Repository

৪২৯. সুরধনী দেব
৪৩০. স্নেহলতা বসু
৪৩১. হিরন্ময়ী গুহ
৪৩২. সরোজবালা মজুমদার
৪৩৩. শচীরানী দেবী
৪৩৪. কিরণবালা দেবী
কুমিল্লা (১৯৩২)
৪৩৫. গীতারানী ভৌমিক
৪৩৬. হিরন্ময়ী দেবী
৪৩৭. অমিয়া রায়
৪৩৮. ঊষারানী পালিত
৪৩৯. সাধনা সরকার
৪৪০. শান্তশীলা পালিত
৪৪১. সুহাসিনী মমুখোপাধ্যায়
৪৪২. নির্মলা সরকার
৪৪৩. চারুশীলা দেবী
৪৪৪. অরুণা মজুমদার
৪৪৫. সরযু বসু
৪৪৬. স্নেহলতা পাল
৪৪৭. নবনীতকোমলা সিংহ
৪৪৮. বিভাবতী চৌধুরী
পাবনা (১৯৩২)
৪৪৯. কুসুমবালা ঘোষ
৪৫০. রেবারানী চন্দ
৪৫১. সরোজনলিনী দত্ত
৪৫২. কুমুদিনী ঘোষ
৪৫৩. হেমপ্রভা দেবী
৪৫৪. প্রভারানী দেবী
৪৫৫. বিভারানী দাস
রংপুর (১৯৩২)
৪৫৬. সুমতিবালা সমাদ্দার
৪৫৭. দক্ষবালা দাসী
৪৫৮. অর্চনা প্রামানিক
৪৫৯. শান্তিবালা দেবী
৪৬০. অমিয়ারানী দেবী
৪৬১. মহামায়া দেবী
৪৬২. জ্যোতির্ময়ী দেবী
৪৬৩. সুধারানী সরকার
৪৬৪. বীনা সরকার
৪৬৫. চারুবালা ভট্টাচার্য
৪৬৬. বেলারানী রায়
৪৬৭. আশালতা দেব
৪৬৮. প্রিয়বালা দেব
মেদিনীপুর (১৯৩০)
৪৬৯. ননীবালা দাস
৪৭০. অনুরূপা দাস
৪৭১. শতদল অধিকারী
৪৭২. স্বরূপা দাস
৪৭৩. সবিতা বসু
৪৭৪. চারুশীলা সেন
৪৭৫. সুষমা সেন
৪৭৬. কমলা বাগ্‌দী
৪৭৭. ননীবালা মাইতি
৪৭৮. মাখন দাসী
৪৭৯. বসন্ত মন্ডল
৪৮০. নিবারণ দাসী
মেদিনীপুর (১৯৩২)
৪৮১. সত্যবালা দাসী (অত্যাচারিত)
৪৮২. ইন্দুমতী দেবী
৪৮৩. সুহাসিনী দেবী
৪৮৪. সুখদা রায়চৌধুরী
৪৮৫. লক্ষ্মীরানী দেবী
৪৮৬. কুসুমকুমারী মন্ডল
৪৮৭. বাসনবালা মাইতি
৪৮৮. হেমন্তবালা ঢোং
৪৮৯. পঞ্চমী ডালনী
৪৯০. ভূতিবালা ডালনী
৪৯১. মগনবালা মাল
৪৯২. কিরণবালা মাইতি
৪৯৩. বসন্তবালা করক
৪৯৪. নীরবালা রায়
৪৯৫. সুবোধবালা কুইতি
৪৯৬. শুভঙ্করী দেবী
৪৯৭. ধীরেনবালা ভূঁইয়া
৪৯৮. চারুশীলা জানা
৪৯৯. চিকনবালা দাসী
৫০০. কিরণবালা বেরা
৫০১. চারুবালা পালিত
৫০২. সৌদামিনী পাহাড়ী
৫০৩. মায়ালতা দাস
৫০৪. যমুনাবালা দেবী
৫০৫. চারু মাঝিনী
৫০৬. অবনীবালা মাঝিনী
৫০৭. সরযূবালা দাসী
৫০৮. মনোরমা দাসী
৫০৯. সরযূশোভনা বসু
৫১০. শতদল দেবী
৫১১. বিরাজমোহিনী মাইতি
৫১২. মাতঙ্গিনী দাসী
৫১৩. ননীবালা দাস
৫১৪. হরিপ্রিয়া দেবী
৫১৫. সরোজিনী গিরি
৫১৬. দময়ন্তী গিরি
৫১৭. সুষমা পালিত
৫১৮. নীরদা দাসী
৫১৯. বিজনবালা দাসী
৫২০. রাসমনি মাঝিনী
৫২১. গঙ্গামণি জানা
৫২২. বসন্তকুমারী বেরা
৫২৩. লক্ষ্মীরানী দেবী
৫২৪. গিরিবালা হাজরা
৫২৫. জ্ঞানদাবালা বার
৫২৬. বিন্দুবালা দে
৫২৭. সত্যভামা জানা
৫২৮. সন্ধ্যাময়ী পাহাড়ী
৫২৯. যমুনা বেওয়া
৫৩০. কিরণশশী দত্ত
৫৩১. কুসুমকুমারী মন্ডল
৫৩২. যামিনীবালা সেন
৫৩৩. জানকী দাসী
৫৩৪. সুশীলাবালা দে
৫৩৫. বন বিবি
৫৩৬. সার দাসী
৫৩৭. সজনী দাসী
৫৩৮. রোহিনী দাসী
৫৩৯. বসন্ত দাসী
৫৪০. কুমুদ বাগ্‌দী
৫৪১. পদ্মা দাসী
৫৪২. বিদ্যুৎ দাস
শ্রীহট্ট (১৯৩২)
৫৪৩. হীরাপ্রভা চৌধুরী
৫৪৪. সুরপ্রভা দেব
৫৪৫. প্রভাবতী ধর
৫৪৬. সুপ্রবাসিনী দেব
৫৪৭. সুকেশিনী দেব
৫৪৮. সরোজবালা সেন
৫৪৯. সুষমা দাস
৫৫০. মহামায়া দাস (৭০ বৎসর)
৫৫১. ইন্দ্রমণি দেবী (৮০ বৎসর)
৫৫২. নলিনীবালা মিত্র
৫৫৩. সুচিত্রাময়ী দাস
৫৫৪. চারুবালা সেন
৫৫৫. নিত্যময়ী দেবী
৫৫৬. কারুণাময়ী দেবী
৫৫৭. বিন্দুবাসিনী দাস
৫৫৮. সুরবালা দেব
৫৫৯. গিরিবালা দেব
৫৬০. কনকলতা নাগ
৫৬১. সুরবালা দেবী
৫৬২. সরোজবালা দাস
৫৬৩. চারুবালা দেবী
৫৬৪. শিশিরকণা বিশ্বাস
৫৬৫. সুনীতিবালা দাস
৫৬৬. সরোজিনী পাল
৫৬৭. গিরিবালা গুপ্তা
৫৬৮. মোহিনীবালা সরকার
৫৬৯. কিরণবালা দেবী
৫৭০. বিনোদিনী পাল
৫৭১. সৌদামিনী পাল
৫৭২. চরিত্রবালা নমঃশুদ্র
৫৭৩. বিলাসময়ী কর
৫৭৪. মাতঙ্গিনী দাস
৫৭৫. শশীপ্রভা দেব (ভানুবিল সত্যাগ্রহ)
৫৭৬. চারুশীলা দেব (ভানুবিল সত্যাগ্রহ)

Dhaka University Institutional Repository

৫৭৭. গিরিবালা দত্ত
৫৭৮. সরযূবালা দত্ত
৫৭৯. শৈলবালা দেব
৫৮০. হেমন্তকুমারী দেব
৫৮১. বসন্তকুমারী দেব
৫৮২. তারকসুন্দরী পাল

(আশালতা সেন-প্রদত্ত)
১. উষাবালা দত্ত
২. ষোড়শীবালা দত্ত
৩. কুমুদিনী ঘোষ
৪. চারুশীলা পাল
৫. রতনবালা দাসী
৬. ননীবালা রায়
৭. কিশোরীবালা দাসী
৮. রাধারানী দাসী
৯. নির্মলা দাসী
১০. মাখনবালা
১১. উষারানী ঘোষ
১২. হেমনলিনী ঘোষ
১৩. কিরণশশী দেবী
১৪. অনুপমা দেবী
১৫. পারুল দত্ত
১৬. কুসুম দাসী
১৭. ক্ষ্যান্তমণি দেবী
১৮. কুমারীবালা
১৯. রানীবালা
২০. লিচুবালা
২১. সুশীলা দে
২২. কাননবালা পট্টনায়ক
২৩. চারু পালিত
২৪. মেনকা দেবী
২৫. নীরজনলিনী দে
২৬. সাবিত্রী দেবী
২৭. সত্যরানী হালদার
২৮. সুনীতি সেন
২৯. মহামায়া ঘটক
৩০. সন্তোষ পাল
৩১. যোগিনী পাল
৩২. শৈলসূতা সরকার
৩৩. সিন্ধুবালা কোলে
৩৪. সুনীতি দাশগুপ্ত
৩৫. বিভাবতী দাস
৩৬. সুমিত্রা দেবী
৩৭. রতনমণি দেবী
৩৮. রাধারানী মন্ডল
৩৯. চপলা দেবী
৪০. ভানুমতী বিশ্বাস
৪১. রোহিতকুমারী বিশ্বাস
৪২. বৈদ্যবালা মজুমদার
৪৩.শ্রীমতীঘোষ

(সূত্র : কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, পৃঃ ২৭৩-২৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ৩

ক) বেঙ্গল ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স গেজেট, জুলাই, ২২, ১৯৩২ (প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার- এর লুক আউট ওয়ারেন্ট)

ক) কলকাতা পুলিশ গেজেট, আগষ্ট, ১০, ১৯৩২

* সূত্রঃ কলকতা পুলিশ মিউজিয়াম

খ) বিপ্লবী কল্পনা দত্তকে লেখা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার- এর চিঠি

গ) Addendum to the history sheet of Kalpana Datta

ঘ) Statement of Kalpana Datta

ঙ) Statement of Kalpana Datta, May 3, 1932

চ) বিপ্লবী শান্তি ঘোষের জবানবন্দি

ছ) বিপ্লবী বীনা দাশের জবানবন্দি

* সূত্রঃ কলকতা প্রাদেশিক আর্কাইভ্স- এ রক্ষিত আই.বি রিপোর্ট

Dhaka University Institutional Repository

(10)

Part VIII

Miscellaneous Notices, including Deserters.

147.

Reward, Rs. 50.

I. B., C. I. D., Bengal (Miss Prithi Waddadar—Reward for tracing of).—The above reward is offered for the tracing of Miss Prithi Waddadar, whose photographs are published above. Photograph No. 1 was taken about 2 years ago when Miss Prithi was a student of the Dacca Eden Intermediate College and photograph No. 2 (sitting posture), which is a more recent one, was found at the time of the search of one Apurba Sen *alias* Bhola (since deceased), in connection with the Dhalghat shooting affray at Chittagong.

A special "look-out" should be kept for her and when traced, the I. B., C. I. D., Bengal, Calcutta, should be informed by wire. A close, though unobtrusive, surveillance should at the same time be kept on her movements.

Description—Miss Prithi Waddadar, daughter of Jagabandhu Waddadar (Baidya by caste), of Dhalghat, Patiya and Jamalkhana, Chittagong town: age 20/21 (looks younger than her age); dark; medium build; short; ugly in appearance.

Note by C. I. D., Bengal.—(1) Will all Ss. P. and Addl. Ss. P. please especially note?

(2) Will the Commr. of Police, Calcutta, and the other C. I. Ds., kindly note?

(Gt. 112—32.)

Part IX

Important Rulings in Criminal Cases.

Dhaka University Institutional Repository

CALCUTTA POLICE GAZETTE.

PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF BENGAL.

10TH AUGUST 1932

CRIME.

Reward of Rs. 50.

2931. A special look out should be kept for Miss Prithi Waddadar, daughter of Jagabandhu Waddadar of Dalghat Patiya and Jamalkhana, Chittagong Town, age 20—21 years, looks younger than her age, dark complexion, medium build, short, ugly appearance.

If traced, the I. B., C. I. D., Bengal, should be immediately informed.

(Bengal C. I. Gazette, dated 22-7-32).

2932. The following is the description of an old offender named Ananda Routh, son of Lakhan Routh of village Bantala, police-station Bonth, district Balasore, who is untraced since 7th November 1931. He is liable to prosecution under section 176 I.P.C. :—

Age about 40 years, dark complexion, strong build, round face, a flower plant tattooed on the right forearm and a goddess on the left forearm, a scar on the back.

If traced, the Superintendent of Police, Balasore should be informed.

(Bengal C. I. Gazette, dated 22-7-32).

2933. The following is the description of Ramesh Chandra Biswas, who is wanted in Monghyr Town police-station case No. 16, dated 19th June 1932 under section 406 I.P.C. :—

Age about 28 years, dark complexion, has big moustache, a mole on the eye-brow.

If traced, he should be arrested and the Superintendent of Police, Monghyr informed.

(Bengal C. I. Gazette, dated 22-7-32).

2934. The following is the description of an old offender named Amulya Charan Ghosh *alias* Gokul Datta *alias* Daitari Datta *alias* Bhagwan Das, son of Monmatha Nath Ghosh *alias* Gobind Datta *alias* Udai Narain Das, who is untraced since his release from Bankura jail on the 4th January 1932 :—

Age about 32 years, height 5 feet 4 inches, dark complexion, strong build, curly hair, round face, short nose, narrow forehead, protruding eyes, separate eye-brows, short lobed ears, pointed chin, small mouth.

If traced, he should be arrested for violating orders under section 565 C.P.C. and the Superintendent of Police, Singhbhum informed.

(Bengal C. I. Gazette, dated 22-7-32).

SECRET

Dhaka University Institutional Repository

Contents of a Post Card addressed to Miss Kalpana Datta c/o Late Durga das Datta Anderkilla Chittagong and intercepted at the G.P.O. Chittagong on 10.12.31

Addressee: Miss. Kalpana Datta
c/o Late Durga das Datta
Anderkilla Chittagong

Post-marks:- 1) Beadon St. (Seal of Posting) Calcutta 8. Dec. 31
2) Chittagong (seal of delivery) 10 Dec. 31

Calcutta
7.12.31

[illegible]

[illegible Bengali text] ... Changing Change ... Principal ... Test ... Result ... 20 ... Picnic ... [illegible]

Translation:

Bhulu.

Received your card a few days back. I had a great mind to see you before I left but I could not wait. Days back I wrote to you a letter along with some to Khukin (Sister). Let me know if you received the same. I shall most certainly be at the Centre. But I would have felt happy if I could go there during the X'mas holidays. But the Principal would not allow it. I shall have to go in January after paying the fees (examination fees). The result of the test exam will also be out in January. Just let me definitely know if I can't go during the X'mas. But I did. Sister have written to say that they will organise a picnic. Just on receiving this letter let me know if the letter I wrote to you [illegible] Sister has reached you. Don't delay. Accept love. Yours indulgently Priti

Submitted. Bhulu is the nickname of Miss Kalpana Datta - may be suspected. The writer is the daughter of Jagabandhu Waddadar - Head clerk ... Chittagong.

P.T.O.

Dhaka University Institutional Repository

The writer is said to be a student of B.A. - 4th year in the Bethune College. Both the writer & addressee are said to be associates of Miss Sarojini Pal & Miss Nalini Pal, D/o Babu Ambica Charan Pal, Pleader, [illegible] Chittagong town. According to secret information recd. from I.B. the Pal Sisters are members of Chittagong Jugantar party.

[illegible signature]
10/12/31

Submitted. Priti waddedar worked in the civil disobedience movement as lady picketter at Chittagong.

[illegible signature]
D.I.
Chittagong
10/12/31

4/12/31

INTELLIGENCE BRANCH
15 DEC. 1931
27558
C.I.D. BENGAL

(44257)

Memo No. 4025 dated 12.12.31.

Forwarded to Rai N.N.Majumdar Bahadur, Special Superintendent, I.B., for information.

[illegible signature]

For Superintendent of Police, Chittagong.
14/12

H.G.

Dhaka University Institutional Repository

ADDENDUM TO THE HISTORY SHEET OF KALPANA DATTA, DAUGHTER OF BENODE BEHARI DATTA, OF SRIPUR, BOALKHALI AND FAIRY TANK WEST, CHITTAGONG.

(37)

I. The History Sheet of Kalpana Datta was written on 25.2.32 when action under the B.C.L.A.Act was contemplated against her, but no action was taken as both she and her father executed bonds undertaking that she would not participate in any anti-Government or terrorist activities.

II. The following reports of her revolutionary activities were received after that date:-

1. Ardhendu Guha (ex-convict Chittagong Explosives Act Case and ex-detenu - Jugantar) used to keep revolvers with Kalpana Datta after the Chittagong Armoury Raid. (C.H.8 dated 8.4.32).

2. Kalpana Datta used to mix freely with Priti Waddadar (who attired in male dress, took part in the Pahartali European Institute raid and then committed suicide on 24.9.32) and taught her how to ride a bicycle. (Chittagong Mis. dated 27.6.32 and C.A.58 of Chittagong dated 23.11.32).

3. Kalpana Datta was in communication with the undertrial prisoners of the Chittagong Armoury Raid in Chittagong jail and supplied embroidered handkerchiefs to them. She was also in direct touch with the absconders of the raid case. (C.T.G. dated

Dhaka University Institutional Repository

17.7.32 and C.H.24 dated 17.6.35).

4. Kalpana Datta became untraced from her house in Chittagong town on 17.9.32 and was arrested in male attire at Pahartali, Chittagong, on 18.9.32 with Nirmal Sen and Dinabandhu Mazumdar (ex-detenus - Jugantar) who were escorting her to the absconders of the raid case. She was prosecuted u/s 109 C.P.C. and was released on bail on 28.12.32. She then left her house, became untraced and joined the notorious absconder Surjya Sen (hanged in connection with the Chittagong Armoury Raid). She used to meet Priti Waddadar and other absconders in an Asram before the Pahartali outrage (raid on European Institute on 24.9.32) in which she was to take part. (C.H.36 dated 4.10.32: C.H.52 dated 12.1.33: Report of S.P. Chittagong and C.A.43 of Chittagong dated 26.4.33).

(NOTE:- Kalpana Datta was examined by the Chittagong D.I.B. on 3.5.32 when she pleaded absolute innocence and total lack of sympathy for the revolutionary movement. She was also examined on 18.9.32, 23.9.32 and 18.10.32 after her arrest at Pahartali in male attire when she repeated her plea of innocence and said that there was no political significanc behind her arrest. She stated that she left home after quarrelling with her mother and put on male attire to avoid recognition by her friends and relatives who might try to find her)

5. Kalpana Datta recruited and infused revolutionary ideas in Kundalata Sen (ex-convict

Dhaka University Institutional Repository

ex-restrictee - Jugantar), Nirmala Bala Debi (ex-detenu - Jugantar) and others. She advocated the adoption of violent methods for the independence of India. (Chittagong Mis. dated 4.11.32: Chittagong Mis. dated 8.4.33; Statement of Nirmala Debi dated 28.8.33: Statement of Sunil Kumar Chakrabartti dated 28.8.33 and Deponent 870 dated 13.4.36).

6. Before absconding (in connection with the case u/s 109 C.P.C.) Kalpana Datta told some of her friends that she was sure to be confined to jail but that she preferred to die for the good of the country by murdering some responsible Government officers who were enemies of the country. She ran away from the house determined to meet Surjya Sen and to be trained by him to enable her to play the role of Priti Waddadar. (A.S.P. dated 14.1.33 and A.P.6 dated 24.1.33).

7. Kalpana Datta's name appeared in cipher in a paper seized from Sahaya Ram Das (transported for life in the Chittagong Armoury Raid Case). (C.T.G. and Report of S.P. Chittagong dated 21.1.33).

8. Kalpana Datta was a member of the Chittagong Jugantar party and learnt rowing in the Victoria Memorial Tanks, Calcutta, along with Kalyani Bhattacharji (nee Das, ex-detenu - Jugantar), Bina Das (ex-convict - Jugantar) and others. (C.h.55 dated 22.1.33: A.L.S.34 dated 4.2.33 and Tippera C.A. dated 28.3.33).

9. Kalpana Datta's party name was Buluda. She associated and lived with dangerou

Dhaka University Institutional Repository

terrorist absconders Surjya Sen, Tarakeswar Dastidar and others after she absconded. During the period she was absconding, she handled bombs with I.R.A. (Indian Republican Army) imprinted on them, carried revolvers and attended target practice. (C.H.51 dated 9.2.33 and 14.2.33: C.H.55 dated 14.2.33: C.H.61 dated 16.5.33: her own statement and that of Tarakeswar Dastidar dated 19.5.33).

10. Kalpana Datta, Tarakeswar Dastidar and some other absconders were sheltered in a house at village Jaisthapura, P.S. Boalkhali, when another house in the village was being searched. They held themselves in preparedness to fight the searching party if their shelter also was searched. (C.H.57 dated 16.2.33).

11. Kalpana Datta with some others were with Surjya Sen when the Gairala shelter was cordoned by the Military on 17.2.33 and Surjya Sen was arrested. She with some other absconders escaped from the shelter and she was injured. (C.H.36 dated 19.2.33: C.H.51 dated 23.2.33: C.H.59 dated 6.3.33: C.H.61 dated 17.4.33 and C.H.80 dated 3.12.33).

12. Kalpana Datta became unduly intimate with absconder Tarakeswar Dastidar which the members of the party did not like. They wanted to compel her to commit some murder and to court death or commit suicide. Coming to know of this Surjya Sen sent information from Chittagong jail that Kalpana Datta should commit some outrage but Tarakeswar would not spare her for the purpose. (C.H.54 dated

Dhaka University Institutional Repository

21.2.33: C.H.66 dated 11.5.33 and C.A.68 of Chittagong dated 17.5.33).

13. Kalpana Datta, along with other absconders of the raid case, were contemplating to resort to indiscriminate murders. Kalpana, Tarakeswar Dastidar and two others came to Chittagong town to assassinate some D.I.B. officers but went back unsuccessful. (C.H.56 dated 31.3.33: C.H.36 dated 6.4.33: C.A.17 of Chittagong dated 6.4.33 and C.A.53 of Chittagong dated 6.4.33 and 4.5.33).

14. Dressed in male attire Kalpana Datta with Tarakeswar Dastidar and other absconders and party members, observed the Armoury Raid anniversary on 18.4.33 at village Kanangoepara, Chittagong, where photos of the dead members and leaders of the party were worshipped and a revolver decorated with flowers was placed on a plate. The party of Tarakeswar had six revolvers with them at the time. (C.H.55 dated 19.4.33).

15. Kalpana Datta was selected by Surjya Sen (hanged) to lead an outrage which could not take place owing to Surjya Sen's arrest (on 17.2.33). Surjya Sen had decided to raid a military camp in Chittagong (presumably Kalpana was to lead this raid). (C.H.62 dated 10.5.33).

16. A plan was made to attack the Chittagong jail in which Kalpana Datta, Manindra Datta (ex-convict Arms Act Case - Jugantar) and Santi Sen (ex-detenu - Jugantar) were to take part. They came to Chittagong town

Dhaka University Institutional Repository

three times for the purpose. Kalpana Datta was to lead the attack. (C.H.62 dated 10.5.33).

17. Armed with bombs and revolvers Kalpana Datta and three others went to murder Mr. Hicks (then S.P. Chittagong) but they returned unsuccessful. (C.A.29 of Chittagong dated 20.5.33).

18. Kalpana Datta with Tarakeswar Dastidar and some others, were arrested at Gahira, Chittagong, on 19.5.33, after an exchange of shots with the military which cordoned the shelter. They surrendered three revolvers of .455 bore and some cartridges including country made ones. On searching the den some revolutionary and highly objectionable writings in the handwriting of Kalpana Datta were seized. Some torn pieces of paper in her handwriting were also seized and when pieced together and pasted, it was found to be a statement of Kalpana's own terrorist activities. It runs as follows:-

ITEM 18.

(Torn pieces of papers found at GAHIRA on 19.5.33 in the house of Prosonno Taluqdar where accused Kalpana Dutta and Tarakeswar Dastidar were living and arrested. I pieced them together. They now make 6 (six) pages manuscript in the handwriting of accused Kalpana Datta).

.....

PAGE 1.

Long live Revolution.

...

Dhaka University Institutional Repository

I boldly declare myself as a revolutionary, whose lofty ideal is to liberate the (MOTHER) INDIA from the British Rule by th(e) (direct method)..od of Devalera. No nation ha ha(s)(any right to rule another nation. The right of (ownership) of India and the control of her de(terries) belongs to the people of India only. We want to assert this right in the face of the world, by taking away the (lives of) British Officials who have p(erpetrated the) massacre on the Indians (and thus proved to) be the worst enemy of our (country).

The fight for Country's (fr)eedom has began long ago. Our today's action is one of the links in the chain. The mass may not still support this revolutionary outrages, but like other countries they will have to support in the long run.

PAGE 2.

When there will be repeated actions. With this firm faith on the armed..... (re)bellion I have come today to discharge (my.....du)ty as a revolutionary..... (aI) this intense moment, I appeal (to) my sisters not to lag behind and to stand side by side with the brothers to face any and every danger in a fight for country's freedom. They should vindicate before the world their equal rights with (the) brothers in every spere of life - (Social) political and educational.

We received great shock when we heard that Proyoja Chaudhury, a humble member of our

Dhaka University Institutional Repository

organisation has been tortured to death. We again warn the despotic Government to refrain from this sort of inhuman brutality. We further affirm that any repetition of such shocking outrage will be paid back with tenfold cruelty and horror.

When I was at School stu(dent I read) some national books and felt (very deeply at) my heart the condition of the country and at that time I made up my mi(nd to) sacrifice myself for the good of my (country) wh. has been subjected to wrong and groaning under the tyranny of the foreign Govt. While I was studying in Bethune (College). I got some hints of the pa(rty) revolutionary brother. Having (been aware of the party's ideal, I have ado(pted)...(the) method and became a true member (of).... the organisation.

After the armoury raid I devoted myself heart and soul to the work of the organisation and took part in the dynamite conspiracy and Jail finding. The intention of the undertrial behind the prison bars was to escape from the jail by blowing away the jail compound (by sh)ooting the sentries to death. For that (purpose) revolvers and explosives were taken by (us into) the British Jail.

.....(I) had to change my place of study from Calcutta and took admission in B.Sc. class Chittagong Govt. College.

Then I was summoned by the (V)enerable leader to take part in the armed (raid) at the Pahartali European Club. But.....unfortunately

Dhaka University Institutional Repository

I was arrested on the way. My (heart did) not droop down into despair and tried (my) best to escape from the Jail. When I realised the sure chance to be convicted or taken by the B.C.L.A. I absconded to fulfil my hankering after some practical revolutionary action.

In my absconding, there was an

(e)ngagement (with) the Police at Gairala, where (our) great (Maste)r da was arrested. I and (O)r of (our fri)ends fought to the last to save him and thus to give him an opportunity to come back to the arena of revolutionary activities. At last two of my comrades who stood by his side were mortally wounded and our venerable leader was snatched away from us by the shower of British bullets. This tragedy touched my heart to its very depth and my hankering after practical action grew more intense. My long cherished desire is going to be fulfilled today by the newly elected President who is also like a glowing luminary receiving incessant stream of light from the inexhaustible personality of my rev. Masterda.

I emphatically say that it is not a whimsical act (of mo)ment's inspi(ration) but I have cherished (the) idea (in) the bosom of my h(eart) more tha(n).....six years and launch today's bloody campaign.....fully realising it.

I am going today to sacrifice my life on the altar of the mother-country wh. has been

Dhaka University Institutional Repository

who defied even the cold touch of death in worshipping the mother country.

The country so long misunderstood the lofty idea of those shining personalities and regarded them as runaway lunatics, working under moment's whims. If my countrymen feel in the least the hard-earned realisations of these noble patriots after going through my statements, my attempt will be crowned with success and blessings. May God Fulfil and assist me in this sacred campaign.

---

19. On 24.5.33 the house of one Brojendra Lal De of Taltuli P.S. Anwara, Chittagong was searched and some objectionable and anti-British writings in the hand of Kalpana Datta were seized. (Extract from Search statement).

III. Kalpana Datta was tried by a Special Tribunal at Chittagong along with Surjya Sen and Tarakeswar Dastidar, accused of the Chittagong Armoury Raid, a brief history of which is as follows:-

On the night of 18.4.30, the terrorist party of Chittagong, headed by Ananta Singh, Surjya Sen, Ganesh Ghose, Lokenath Bal, Ambica Chakrabartti, Nirmal Sen and Tarakeswar Dastidar, numbering about one hundred, clad in khaki uniforms and armed with revolvers, guns, sledge-hammers, chisels, bombs etc., attacked the Telephone Exchange, the Auxiliary Force/armoury at Pahartali and the District Police Armoury. They chloroformed the Telephone

Dhaka University Institutional Repository

the sentries at the Armouries, ransacked both and set fire to them. Besides the sentries, they shot the Staff Sergeant Major, an Anglo-Indian Railway Guard and three outsiders. The revolutionaries also removed the Railway line near Dhoom Station in order to wreck the down trains.

On 24.8.33 the Special Tribunal convicted and sentenced Kalpana Datta to transportation for life u/s 121A I.P.C.. u/s 4 of the Explosives Substances Act and u/s 19(f) of the Arms Act while Surjya Sen and Tarakeswar Dastidar were sentenced to death. Their conviction was confirmed by the Hon'ble High Court on 14.11.33.

IV. After the arrest of Kalpana Datta at the Gohira den, the following information relating to her political activities before arrest, was reported:-

1. A meeting of the absconders' shelterer and important party members was held by Tarakeswar Dastidar and Kalpana Datta and this meeting decided the murder of the two judges who had passed death sentence on Ambica Chakrabartti (one of the leaders of the Chittagong Armoury Raid). (C.H.77 dated 27.5.33).

2. Kalpana Datta and Manindra Datta (convict, Arms Act Case - Jugantar) and Santi Sen (ex-detenu - Jugantar) visited Chittagong town on several occasions to murder the District Magistrate. (C.H.62 dated 31.5.33; C.H.36 dated 2.7.33; C.A.218 of Chittagong

Dhaka University Institutional Repository

dated 6.12.35).

3. A secret meeting of the absconders and members of the Chittagong party was held at village Bidgram in Chittagong on 28.2.33 in which Kalpana Datta, Tarakeswar Dastidar and 26 others took part. The meeting decided to follow the path of terrorism and all swore vengeance upon the European officers for Surjya Sen's arrest. (C.H-68 dated 15.7.33).

4. While Kalpana Datta was absconding, she recruited the agent by anointing his forehead with blood taken from her own finger and the agent was made to promise to remain faithful to the party and to obey orders of the leaders blindly. Kalpana was accompanied by Tarakeswar Dastidar and four other absconders at the time and all of them carried revolvers. Kalpana explained to the agent how Ireland became independent and instructed him to steal money or ornaments from his own house and the houses of his neighbours and relatives.

In June 1933 (after Kalpana's arrest) the agent stole gold ornaments worth about Rs. 700/- from a house in Chittagong town and gave them to a member to whom Kalpana had introduced the agent. (J.P.140 dated 27.12.33).

5. Kalpana Datta and Tarakeswar Dastidar received (i) about Rs. 2000/- worth of jewellery stolen by Gopal Chaudhury (ex-detenu - Jugantar) a trusted member of the party, (ii) Rs. 25/- from a member who stole the money from his own house and, (iii) cash and

Dhaka University Institutional Repository

support of the absconders of the party. Kalpana also induced a member to collect money from school boys and to ask them to steal money for the support of the absconders. (C.H.91 dated 29.1.34: C.A.106 of Chittagong dated 29.5.35: C.H.241 dated 29.9.35: C.H.80 dated 11.10.35: C.H.82 dated 24.10.35 and Deponent 876 dated 31.5.36).

6. Kalpana Datta was connected with Kamala Chatarji (ex-detenu - Jugantar). In 1929-30 she carried materials for preparation of bombs from Calcutta to Sealdah Station (presumably to be taken to Chittagong). (Deponent 4 of Dacca dated 15.6.35).

7. Kalpana Datta, Priti Waddadar (died in Pahartali outrage), Bina Das (ex-convict Senate Hall outrage) and others were reliable members of the Chittagong Jugantar party. (Deponent 847 dated 15.10.35).

8. While in Hijli Jail, Midnapur, after her conviction, Kalpana Datta was interviewed by her father whom she requested to prefer an appeal to the Privy Council against the order of death on Surjya Sen and Tarakeswar Dastidar. She asked her father to approach Captain N.N.Datta, Dr. Charu Banarji (ex-detenu - Jugantar) husband of Bimal Prativa Debi (ex-detenu - Jugantar) and Satyendra Datta (ex-detenu - Jugantar), M.L.C., for expenses of the appeal. She also agreed to make a confession of her past activities if the Government agreed to commute their death sentence. (Report of S.P. Midnapur dated

Dhaka University Institutional Repository

30.12.33).

V. Interviews:-

1. Kalpana Datta was interviewed by an officer of this department in Rajshahi Jail on 5th and 7th October 1934, when she said that inspired by some revolutionary youths, she joined the secret organisation from a spirit of adventure. She was led away by excitement, thoughtless of consequences. The interviewing officer found her to be very friendly with Amiya @ Ujjala Mazumdar, then a convict in the jail.

2. Kalpana Datta was next interviewed by an officer on 9.4.35 when she expressed regret for her past activities and proposed not to return to her former revolutionary activities.

3. Kalpana Datta was again interviewed on 9.1.36 at Midnapur jail by an officer of this department when she was found to be somewhat repentant and her attitude appeared to have improved.

4. Kalpana Datta was next interviewed by an officer of this department on 17.2.36 in Midnapur Jail. She said that she was practically recruited by Purnendu Dastidar (ex-detenu - Jugantar - Communist) and that she came in touch with Priti Waddadar in 1929. She met Surjya Sen (then an absconder) during the Puja vacation of 1930 and he encouraged her to work. She was arrested at Pahartali on 18.9.32 when she had gone there to meet Surjya Sen and Priti Waddadar. She fled away from home in December 1932, at the instance of

Dhaka University Institutional Repository

Surjya Sen whom she joined after absconding.

5. Kalpana Datta was interviewed for the last time by an officer of this department on 27.6.37 in Dinajpur jail. The interviewing officer found her attitude changed for the worse.

VI. The following information of her activities in jail were reported:-

1. Kalpana Datta used to smuggle out letters from the jail to the detenus in Hijli Camp through a convict and a jail warder. (Deponent 828 dated 4.4.36).

2. Kalpana Datta, Bina Das (ex-convict - Jugantar), Santi Ghose (ex-convict - Jugantar), Amiya Mazumdar (ex-convict - B.V.) and Kamala Chatarji (ex-detenu - Jugantar) assaulted the female warder of Dinajpur jail on 7.1.37. They snatched away the whistle and the keys of the warder after gagging her and holding her down on the ground. (Report of a Deputy Magistrate, Dinajpur, in the jail visitors' book on 7.1.37).

3. While in Rajshahi Jail, Kalpana Datta was in secret communication with Samya Behari Mukharji (convict - Mankundu robbery case (Deponent 676 dated 26.8.37).

VII. Kalpana Datta was released from jail, before her turn, on 1.5.39. The following information about her is reported after that date:-

1. After her release, Kalpana Datta met Arun Chandra Guha and Bhupendra Kumar Datta (ex-State prisoners - Jugantar) at the "Forward"

Dhaka University Institutional Repository

office where she said that she would decide her future course of activities in consultation with her old acquaintances. Santi Sen (ex-detenu Jugantar) said that Kalpana would work with the old members of the Chittagong party in the B.L.P. (A.P.52 dated 3.5.39).

2. On 2.5.39 Kalpana Datta went to the Forward office accompanied by Kamala Chatarji (ex-detenu - Jugantar - Communist) who wanted to recruit her to the Communist party. The same evening she had a secret discussion with Sati Bhusan Sen (ex-detenu - Jugantar) and she passed the night with Bina Das (ex-convict - Jugantar). Kalpana said that while in jail, Purnendu Dastidar (ex-detenu - Jugantar - Communist) wrote to her to accept Communism. (A.P.31 dated 5.5.39).

3. Kalpana Datta expressed her views in favour of M.N.Roy's party. (C.H.272 dated 6.5.39).

4. Kalpana Datta met Bhupendra Kumar Datta (ex-State prisoner - Jugantar) at the Forward office on 3.5.39 and had secret discussions with him. (T.L.56 dated 6.5.39).

5. Kalpana Datta has accepted communism and on the strong recommendation of Kamala Chatarji (ex-detenu - Jugantar) she has been admitted in the inner circle of the C.P.I. Purnendu Dastidar (ex-detenu - Jugantar) supplied her communist literatures to read. (C.H.147 dated 8.5.39: C.116 dated 9.8.39: A.S.34 dated 21.7.39).

6. Kalpana Datta received a smuggled

Dhaka University Institutional Repository

letter from Ambica Chakrabartti (convict - Jugantar) in which Ambica reminded her of the heroic sacrifices of the martyrs like Surjya Sen @ Masterda (hanged) and others and said that their examples should always be cherished by the party members. Ambica also expressed satisfaction at Kalpana's meeting the Jugantar leaders and instructed her to remain occupied with work. (C.H.17 dated 26.5.39: A.P.31 dated 26.5.39).

7. Kalpana Datta is a member of the Chittagong Political Prisoners' Release Committee. She addressed a ladies' meeting in the Town Hall on 14.7.39, presided over by Labanya Lata Chanda (ex-detenu - Jugantar) and exhorted about 200 ladies who were present to join the agitation for release of the Political Prisoners. (A.S.34 dated 21.7.39 and J.P.88 dated 27.7.39).

8. A letter was written by Purnendu Dastidar (ex-detenu - Jugantar) to Ananda Gupta (convict, Chittagong Raid Case) in Alipore Central Jail, in which it is said that Kalpana Datta had a progressive mind and that she was working with the C.P.I. She was engaged in serious studies and was expected to turn a good comrade soon. (C.B.5 dated 27.7.39).

9. Kalpana Datta who is supporting Communism, wrote several letters on her return to Chittagong to Benodini Das (Jugantar - Soc.) asking her to start a female organisation at Kharandwip, Chittagong. (C.H.272 dated 6.8.39).

220

Dhaka University Institutional Repository

10. Kalpana Datta has started a female section of the Students Federation at Chittagong. (J.P.88 dated 13.9.39).

VIII. General:-

Kalpana Datta, an important female member of the Chittagong party, is a dangerous terrorist who associated and lived with notorious terrorist absconders like Surjya Sen, Tarakeswar Dastidar (both hanged) and others of the Chittagong Jugantar, which was responsible for the Chittagong Armoury Raid in April 1930. Her name was found in Cipher with an accused of the Chittagong Armoury Raid Case. She recruited members for the party and collected funds for the support of the absconders. Dressed in male attire, she went about with the absconders of the party and planned to commit outrages and murders of high and responsible Government officials. She attended target practice with some other absconders of the party. She handled revolvers and bombs, possessed materials for the preparation of the latter and took part in engagements with the military where shots were exchanged. She was convicted along with Surjya Sen and Tarakeswar Dastidar and sentenced to transportation for life on 24.8.33. She was released before her turn on 1.5.39. In the jails she was in secret communication with other members and she assaulted a female jail warder along with other female convicts and detenus. After her release she associated with some Jugantar leaders and female ex-convicts and ex-detenus. She has finally joined the

22

Dhaka University Institutional Repository

C.P.I. and is reported to have been admitted in the inner circle of the party.

CALCUTTA,
THE 27TH FEBRUARY 1940.

for DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLIC
INTELLIGENCE BRANCH, C.I.D.

Dhaka University Institutional Repository

Statement of Miss Kalpana Datta D/O Babu Benode Behari Datta of Sripur, P.S. Boalkhali, district Chittagong and Anderkilla, Chittagong town - aged 19 years.

I am a student of 4th. year B.Sc. class of the Chittagong College and reside at our town residence at Anderkilla. I attended College as usual yesterday and returned from the College at about 2.30 P.M. I went out again in a hackney carriage at about 5 P.M with my younger brother Bejoy Ratna Datta @ Kalu, aged 7 years, to the house of Professor Mohim Babu near Debpahar as I was invited by Mohim Babu's daughter Anupama Barua to take my meal there. Anupama is a student of the 1st. year I.Sc. class, Chittagong College and is an acquaintance of mine. I do not know the name of the hackney carriage driver. I paid the driver annas eight as his hire and dismissed him from the foot of the hill (Debpahar). I reached Mohim Babu's place at about 5.15 P.M. My brother Bejoy Ratna did not accompany me up to the house of Mohim Babu but went back in the hackney carriage. I took some light refreshment at the place of Mohim Babu at about 7.30 P.M. I was asked to take rice but I did not take any rice there. I went to Mohim Babu's house in my usual dress. I left the house of Mohim Babu at about 8 P.M. Mohim Babu's daughter Anupama and Mohim Babu's servant whose name I do not know accompanied me up to the Jugat Bandhu Asram at Debpahar and then they went back. As I had some altercation with my mother on my return from the College over the question of the invitation mentioned above I resolved not to go back home. I then went to the house of Babu Pranhari Rakshit of Parade square and stayed there for the night,

(221)

Dhaka University Institutional Repository

as requested by Pranhari Babu's daughter Monica Rakshit, who is a student of the 2nd. year I.Sc. class of the Chittagong College and an acquaintance of mine. I did not tell Monica anything about the altercation with my mother. I at first told Monica that I would go back home but as Monica pressed for my staying there for the night I agreed as I had really no intention of going back home for reasons given above. I was at the house of Pranhari Babu for the whole day (to-day). To day being Sunday no one enquired or became anxious to know as to why I was not going back home.

I knew Nirmal Kumar Sen @ Bulbul S/O Syama Charan Sen of Quepara, P.S.Ramzan from before. At my request Monica sent the servant to call Nirmal from the house of Benode Behari Chaudhury, merchant of Korbanigani where Nirmal was putting up. Nirmal came to the place of Pranhari Babu at about 6.20 P.M. to-day. At my request Nirmal agreed to escort me to the house of my friend Kalyani Debi, sister of Dina Bandhu Mazumdar of South Kattali, P.S.Double Moorings, who (Dina Bandhu) was a friend of Nirmal and whose house Nirmal knew. Nirmal went out to call Dinabandhu. I also went to the Jagatbandhu Asram at Debpahar. It was arranged that Nirmal and Dinabandhu would meet me at Debpahar. After about half an hour Nirmal and Dinabandhu met me at Debpahar. At Debpahar I dressed myself as a boy, by means of clothes which I had already brought from my town residence. I dressed myself as a boy as I found it necessary to conceal my identity as I apprehended that my guardians would search for me. On our way to Kattali we were arrested by the police at Pahartali bazar. I have got no relationship with Dinabandhu but Nirmal is a distant cousin of mine. Before leaving my house yesterday I had no occasion to talk with

Dhaka University Institutional Repository

Nirmal and Dinabandhu or with any one else that I would run away. After a few days I would have gone back to my house.

I have got no connection with any terrorist organization. I do not know if Nirmal and Dinabandhu have got any connection with any terrorist organizatio I told Nirmal and Dinabandhu about the altercation with my mother, when they became curious to know as to why I was dressing myself as a boy. They at first hesitated to escort me but agreed at last at my request when I assured them that I would soon go back to my house.

When I left my house at about 5 P.M. yesterday I gave my mother to understand that I was going to attend a meeting of the College Union. Kalyani was a school mate of mine at Dr. Khastagir's Girls' School, Chittagong.

The striped shirt used by me for my disguise was made by me as I would sometimes use it at home for fancy's sake. I never went out before in the guise of a boy.

Recorded by me.
Read over to the deponent and admitted by her to be correct.

Sd/- Panchanan Sikdar S.I.
18.9.32.

Sd. Kalpana Dutta
18.9.32.

F.P.20/9

Dhaka University Institutional Repository

SECRET.

Statement of Miss Kalpana Datta daughter of Babu Binode Behari Datta of Sripur, police-station Boalkhali, and Anderkilla, Chittagong town, recorded by the D.I.B.Inspector on 9.9.32.

My name is Kalpana Datta, daughter of Babu Binode Behari Datta of Sripur, P.S. Boalkhali and Anderkilla, Chittagong town. I am the eldest daughter of my father. I have two brothers, the eldest one aged 7 years. I commenced my studies from Chittagong Khastagir Girls' School and passed the Matriculation in 1929. I then took admission in the Bethune College, Calcutta, in the 1st year I.Sc. where I used to reside at the Bethune Hostel. I appeared at the I.Sc. from Bethune College and appeared at the Chittagong centre and passed I.Sc. in 1931. I am now student of the 4th year B.Sc. Chittagong College.

I knew Miss Nalini Pal who was senior to me in the Chittagong Girls' School but I had no particular friendship with her. I knew the following girls who joined Bethune College in 1929:-

(1) Maya De - daughter of late D.L.De the then S.D.O. of Chittagong, she was a class mate of mine in Bethune College.

(2) Panna Guha, daughter of Babu Jogendra Chandra Guha, Pleader, Nandankanan. She is married now.

I also knew one Prithi Wadadar, daughter of Jagabandhu Waddadar, of Chittagong. She was senior to me in the school but I had no intimacy with her.

While I was in Bethune College, I was not in the strike. During the puja vacation while I was first year I.Sc. student of Bethune College, I came to Chittagong. I went one day in

262

Dhaka University Institutional Repository

the picketing of Khastagir Girls' School. I appeared in I.Sc. as non-collegiate student as my percentage fell short. I was accompanied in the girls' school by my cousin Anil Chandra Datta who was then a student of class X, Municipal School, to picket. He was not aware that I was going there to picketing. Sarojini Pal, sister of Miss Nalini Pal was also in that picketing but I was not acquainted with her.

I do not know Ardhendu Guha. My nickname is Bhulu. I do not know any other nickname of mine as Ajit. I do not know Bisweswar Chaudhury. I do not know Sripati Chaudhury. I know Bijay Sen (an accused in the Armoury Raid case) who is my uncle by marriage. I do not know Sahaya Ram Das.

I am only 4th year girl student in the B.Sc. class, Chittagong College.

I do not know how the Principal of the Bethune College came to know that I was in the picketing at Chittagong. Mrs. Raj Kumari Das, Principal of the Bethune College asked me and I admitted before her that I picketted Chittagong girl School one day.

I have not been to Calcutta since 28th February last. I do not know any of the accused of the Chittagong Armoury Raid case, except Bijay Sen who is related to me. I do not know Surja Sen personally but I have heard about him as a notorious absconder. I do not know anybody who to my knowledge is concerned in the terrorist movement. I have never myself fired a gun but I have seen birds shot by the gun. I have am not at all acquainted with the art of dagger play. I am not in sympathy with the terrorist movement nor with revolutionary movement.

Recorded by me, read over and admitted by her to be correct.

Sd. Kalpana Dutta. 5.5.32. 262 Sd. Jogendra Ch. Gupta. D.I.B.Ins

(Original on file 7180/38)

Dhaka University Institutional Repository

Convict Santi Ghosh.

I interviewed female terrorist convict Santi Ghosh in the Dinajpur jail on 27.6.36.

She has grown pale and emaciated. She complained of constantly losing weight and said that she is suffering from a dull pain on her stomach and has got a tendency to vomit whatever she takes.

She further said that she has complained to the I.G. when he visited the jail recently.

She further said that while in Midnapore Jail she was under a regular course of treatment, but since she has been removed to this jail, strictly speaking no treatment has been adopted.

The medical authorities think that she has got imaginary troubles, consequently she should be left alone.

I found her very annoyed with the jail authorities for their indifference.

From her attitude I gathered that she wished to be transferred to the Presidency Jail, to be X-rayed.

Her attitude is very stiff and she is entirely under Bina Dass' influence.

Sd. M. Bose.
Chief Lady Interviewer.
2.7.36.

EM.13.7.36.

Dhaka University Institutional Repository

FILE NO. Stat. Dep. NO. 849.

Extract from Statement of Deponent 849, dated 24/9/35.

*** *** ***

Santi Ghosh and Suniti Chaudhuri the assassi of the late Mr. Stevens were the recruits of Akhil Nandi. The murder of Mr. Stevens was planned and executed by Akhil and Biren. Before the murder, there was a split in the party and as soon as Lalit Burman was arrested the difference became very actute. Lalit Burman left the charge of the party with Suren Das. Thi was resented by Biren Bhattacharji who formed his own group being supported by Akhil Nandi.

The Brahminbaria postal robbery was organise by Biren Bhattacharji. I know Biren purchased several firearms with the money he got out of this robbery. These arms, as far as I have heard, are still with unmarked members of the party and have not been seized by the Police yet. Biren Bhattacharji was also jointly responsible for the Itakhola robbery with murder, which was committed by members of his group.

*** *** ***

MRG/
22/10/35

Dhaka University Institutional Repository

Original in 718 D/34.

487.

Interview Report.

I interviewed the convict Miss Santi Ghosh (of Stevens Lurder, Comilla) at Hijli Jail on 23.1.35. She seeks favour from the Government for the remission of her sentences, but she seems to be unwilling to disclose anything about the terrorist activity in return.

Sd/-

D.I.G. Comilla

24.1.35.

SH/-

208

Original in 718 y/34. 186

Dhaka University Institutional Repository

Copy of an I.B. Officers report dated 28.6.34.
Camp Kharagpur.

.....

I interviewed life convict Santi Ghosh in the Hijli Special Jail with the permission of the Dist. Magte. Midnapur and Commandant, Hijli on 27.6.34. I found th convict in a pensive mood. She enquired from me if an consideration could be shown to her in case she made a clean breast of everything. She said that she was the Secretary of the Chatri Sangha organised by Detenu Pr fullya Brahma at Co illa. Life convict Sunity Choudhury was in charge of training the female members in the art of playing lathis, swords and daggers etc. Mina Datta, Asoke Nandi, Usha Das Gupta, Nilima Nandi and many others were the members of this Sangha. Abou five or six days before the murder of Mr. Stephens, she had a long discussion with life convict Sunity Choudhury about the murder - Sunity Choudhury brought two loaded revolvers and wanted her to accompany Sunity to the Dist. Magte's Bungalow which she accordingly did and committed the murder. When I wanted to enter into minute details, the life convict said that she was not i possession of all the informations I wanted and so she proposed to be transferred to the Jail where Sunity Choudhury was lodged or the latter should be transferred to the place where life convict Santi Ghosh is now. She said that in either case she would be able to pump out everything in minute details.

The life convict further said that she had come to learn from a female detenu lately transferred to the Hijli Special Jail that Sunity Choudhury was suffering much owing to her being placed as a prisoner in Div.III. while she was in Div.II she added that this differential treatment in classification made her position very uncomfortable.

266

Dhaka University Institutional Repository

No. 10693/11-34 dated the 3rd August, 1934, from the Additional Superintendent of Police, Tipperah.

As requested in your Cir. No. 19704 of 29/6/34, I note below mother's name and name of female detenus and convicts of this district.

1. Mother's name of detenu Miss Prafulla Brahma - Mrs. Rangabala Brahma.

2. Mother's name of detenu Miss Prativa Bhadra - Mrs Mrinalini Bhadra.

3. Mother's name of detenu Miss Moina Mukharji @ Usa @ Miring - Mrs Manorama Mukharji.

4. Mother's name of detenu Miss Nilima Nandi - Mrs. Mrinalini Nandi.

850/31 {
5. Mother's name of convict Miss Santi Ghose - Mrs Sailabala Ghose.

6. Mother's name of convict Suniti Chaudhury - Mrs. Sura Sundari Chaudhury.
}

CK. 7.8.34.

Dhaka University Institutional Repository

SECRET.

District Intelligence Branch,
Berhampore, Murshidabad Dist.
The 25th February 1932.

No. 967...../
6732

My dear Ray,

I beg to enclose herewith a cyclostyle copy of speech of Miss Bina Das, accused in the convocatio Hall shooting outrage, together with an envelope.

This was addressed to the Secy. Student's Union, Krishnanath College, Berhampore.

It was intercepted by the Principal of the College. In this connection I beg to draw your attention that G.L.No. 1606 Nalinakshya Sanya who is staying in Calcutta, is one of the organiser of the Student's Union of the College.

It appears that copies probably by book-post were sent to the different colleges in Bengal. It was posted most probably in Bowbazar Post-Offic

Yours sincerely,

A. C. Saha
25/2

To

R. E. A. Ray, Esq., I.P.,
Special Superintendent of Police,
Intelligence Branch, Calcutta.

S.K.Sen/25.2.32.

Dhaka University Institutional Repository

(12) 60

Statement of Miss. Bina Das daughter of Babu Beni Madhar Das of 6/7/1, Ekdalia Road, Ballygunge, and of the Diocesan College Hostel, Bhowanipore, Calcutta, recorded on 6-2-32.
(assailant in the Convocation Outrage)

Dap. 172/32

6638

I am aged about 21 years and unmarried. My father is a retired Headmaster of the Sanskrit Collegiate School, Calcutta. My father is a resident of Sooratoli (possibly), Dist. Chittagong. I have never been to Chittagong in my life. My father is now living with his faimly at his own house at 6/7/1, Ekdalia Road, Ballygunge. Previous to this we lived at 7 Rammohan Roy Road about five years ago. From that place we shifted to the present address.

This was Santosh Mitter's rendezvous. sd/- B.B.M. 7/2.

I have the following brothers and sisters:-

1) Dr. Bimal Chandra Das, M.B. - lives at our residence.
2) Nirmal Chandra Das - read up to B.A. above 30 years. I do not know his present whereabouts. He left Calcutta about two months ago.
3) Amal Chandra Das - 11 years old. He reads in the Ballygunge Boys' School- possibly 4th class.

Here is here now and being examined. sd/-B.B.M. 7/2.

B.7151-C Dated 25.2.32.

Three of my sisters are married- I do not like to give particulars of them. Next sister is Miss. Kalyani Das, B.A. who has been convicted recently from Alipore, 24,Perganas, in connection with the Civil Disobedience Movement. I am next to her in age. I passed Matric from the Bethune School in 1927, I.A. in 1929, from the Bethune College, and B.A. in 1931, from the Diocesan College. I am at present a B.T. student of the same College.

Copy to Dis. 25/2

I put up at the Diocesan College Hostel where I shifted about a fortnight ago. Previous to it, I used to put up with my parents at 6/7/1, Ekdalia Road, Ballygunge. For conveniences of my studies, I shifted to the College Hostel at Elgin Road.

Bina Das. 6-2-32.

262

Dhaka University Institutional Repository

A note should be prepared about this Samiti. How much can we put in as evidence? Have we a list of members? sd/- [illegible] 7/2.

I had seen Bimal Pratibha Devi at our residence once or twice in connection with the meetings of the Nari Satyagraha Samity to be held in some other place. She came to call Kalyani (my sister) and me for the purpose. In spite of her request I did not attend any Satyagraha meeting. In this way I came to know Bimal Pratibha Debi. I did not join any association. I do not like to say anything about my private tuition.

Evidently false statement. sd/- [illegible] 7/2.

About 10 or 12 days ago at about 10 a.m. I was coming to my College Hostel in a taxi (Number I do not remember) when I saw a bundle wrapped up with English newspaper lying on the passengers seat which I partly opened and noticed a revolver in it. I took the bundle with me to my room in the hostel and opened it. It contained the following:-

1) The revolver with which I have been arrested to-day while opening fire on His Excellency.

2) The cartridges of which I have used five to-day in firing as mentioned in (1)

3) A [illegible] of [illegible] Chowdhury and Santi Ghose.

4) An Enquiry Committee report of Midnapore.

5) A packet of potassium cyanide.

After getting these things I formed an idea of killing the Governor of Bengal at the annual convocation when I would go to get my diploma.

Dhaka University Institutional Repository

5-8

from the Principal. I took out the above mentioned revolver and loaded it with five cartridges and took it inside my ~~xxx~~ blouse. I left the remaining five cartridge in my trunk tied in a handkerchief. None of my fellow students knew about the hiding of the revolver and the cartridges. Then I came downstairs, took my admission card along with other girls named Christina Mondal and Indira Dey and left the College with lecturers Miss. Ingman and Miss. Batley. On reaching the Senate House I took my seat by the side of Christina Mondal. After the Vice-Chancellor's speech I left my seat, went to Miss. Batley and told her that I was feeling thirsty. She asked me to wait. Then I went back and took my seat by the side of Indira Dey. A few minutes after, I again left my seat, rushed forward and fired shots at His Excellency. I did not see if he got hurt. I saw His Excellency covering his face with his hands. Then I could not realize what happened. I was then overpowered and arrested. A packet of potassium cyanide was found on my person. The revolver was snatched off from my hand. I was then placed under arrest and taken to Lal Bazar Police Office. From this place I was taken to the Diocesan Hostel where my belongings were searched in my presence. Amongst other things, one handkerchief containing five cartridges and other papers were seized. A list was prepared in my presence and I signed it.

Seized on search. B.B.M. 7/2.

Both have been examined. sd/-B.B.M. 7/2.

Recorded by me and

admitted to be correct.

sd/- G. B. Roy,
Inspector, S.B.
6-2-32.

28?

sd/-
Rina Das.

Dhaka University Institutional Repository

জেনেছিলাম। কারো কারো কাছে যুখারিন ও হেগেলের বই ছিল। . . . সঙ্গীতচর্চা, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা খুব বেশিই হতো। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের ইন্দুদি ছিলেন বলে ঐ বিষয়ে আরও একটু সুবিধা হয়েছিল।[৪০]

কারাজীবন নারীকে আলোকিত হতে সহায়তা করেছিল। প্রত্যেক নারীবন্দির স্মৃতিকথায় এ প্রসঙ্গটি উঠে আসে। কমলা দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন

১) বীনা ও শান্তির কাছ থেকে আসে নতুন হাওয়া। তাছাড়া বীনা ছিল কবি এবং সাহিত্যিক। যখন মনটা ভারী হয়ে আসে, ওর কাছে গেলে কত রকমের আলোচনা করে। মনটা যেন নতুন ছোঁওয়া পায়। ভারী মনটা কথায় কথায় কখন ক্ষয়ে হালকা হয়ে যায়। জেলখানাটা ছিল মরুভূমি, তার মধ্যে বীনা আর শান্তি ছিল ওয়েসিস্। ওইখানে যেন একটা ইন্‌টেলেকচুয়াল হাওয়া বইত, তার ছিল চুম্বকের মত আকর্ষণ।[৪১]

২) জেলখানাটা এমন জায়গা যে, মানুষ সেখানে গিয়ে নিজের মনকে নিয়ে কেবলই হয়রান হয়। অফুরন্ত সময় সেখানে। চিন্তায় ডুবে যাওয়ার, সমস্ত জীবনকে তলিয়ে ভাববার, অনাদি অনন্ত বিশ্বকে কল্পনায় খুঁজে ফিরবার, জগতের আদিঅন্তকে জানতে চাইবার, সত্যকে আবিস্কার করবার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে অহরহ টানতে। চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। চিন্তা যে কত নির্মম কত নিষ্ঠুর শিকারি হতে পারে সেকথা জেনেছি জেলখানায়।[৪২]

একই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় বীনা দাসের বক্তব্যেও

বন্দীজীবনের নিজস্ব ক্ষতিপূরণও অনেক কিছু আছে বৈকি! মানুষকে অন্তর্মুখী করে তোলবার এমন উপযুক্ত স্থান বুঝি আর নেই। চিন্তা আর কল্পনা, স্মৃতি আর স্বপ্ন, সমালোচনা আর আত্মবিশ্লেষণ– এ সবের অবকাশ বাইরে থেকে মানুষ কতটুকুই বা পায়? অথচ এদের দিয়েই বন্দীজীবন বিধৃত হয়ে থাকে। কাজেই বন্দীর মন অনেকখানি গভীরতা লাভ করে–জীবনটা নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেকখানি রসঘন হয়ে উঠতে চায়। বাইরের জগতের কার্পণ্য যত বেড়ে চলে, নিজের দাবী-দাওয়া সব-কিছু নিজের কাছেই করতে হয়, আর তা মেটাতে নিজের মন সবসময়ে নিরাশও করে না।[৪৩]

কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থাতে চট্টগ্রামের বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বড়বোন ইন্দুমতি সিংহ লীলা রায়ের তত্ত্বাবধানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন, যার ফলে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে বীমা কোম্পানিতে চাকুরী নেন। কল্যাণী দাস, রেনু সেন জেলে বসে এম এ পরীক্ষা দেন। কমলা মুখোপাধ্যায়, সুশীলা দাশগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত পাশ করেন বি.এ.। যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেকের জন্য তার ছোটদের পড়াশুনায় সাহায্য করা বাধ্যতামূলক ছিল।[৪৪] কারাবন্দী জীবন একদিকে নারীকে আত্মপোলব্ধির সুযোগ তৈরি করে দেয়, পাশাপাশি কারাজীবনে নারী জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে তাদের বিভিন্ন দাবি ও প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নেয়। এর জন্য তারা অনশন পর্যন্ত করে। কেবল নিজেদের অধিকার নয়, জেলে সাধারণ বন্দি নারীদের সঙ্গে যে অনিয়ম হতো তার বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার হয়। বীনা দাসের ভাষ্যে জানা যায়

জেলের ফিমেল ইয়ার্ডে ঢুকে জেলার নানারকম অনাচার আরম্ভ করল। ওর স্পর্ধা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সুপারিনটেন্ডেন্টকে জানালাম। উত্তর না দিয়ে চলে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট একদিন জেল দেখতে এল, তাকে বললাম, "চোখের সামনে এ-সব আমরা সহ্য করতে পারছি না।" ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলায় হাত নেড়ে ম্যাজিস্ট্রেট বলে গেল, "না

Dhaka University Institutional Repository

> দেখতে পার চোখ বন্ধ করে থাকবে।" বুঝলাম এরা গোলমাল না করিয়ে ছাড়বে না। শাস্তি ততদিনে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে, তিনজনে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলাম, অনশন আরম্ভ করতে হবে। সাধারণ কয়েদিরা শুনে বলল, ঠিকই তো, এসব তো থামানোই উচিত।[৪৫]

রাজনৈতিক নারী বন্দীদের অনশনের ফলে জেলারকে ওই জেল থেকে সড়ানো হয় এবং অনশনকারীরা অনশন ভঙ্গ করেন। কমলা মুখোপাধ্যায়-এর বর্ণনায় জানা যায়, ''জমাদারনীরা যারা আমাদের একটু ঘনিষ্ঠ ছিল, তাদের কাছে জেনেছি যে 'স্বদেশীওয়ালী'রা আসার পর জেল কর্তৃপক্ষ জেলের নিয়মকানুন একটু মেনে চলতেন। আগে নাকি দেখতে ভালো–অল্পবয়সী মেয়েরা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের আবাসে প্রেরিত হতো–'স্বদেশী'রা যাবার পর তা বন্ধ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সব জিনিষেরই একটা ভাল দিকও আছে বোধহয়।"[৪৬] নারী হিসেবে নারীর প্রতি অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাঙালি নারীর জন্য একটি নূতন অভিজ্ঞতা। প্রতিবাদী বাঙালি নারী উপলব্ধি করলো যে নারীর অধিকার ও সম্মান আদায়ের জন্য নারীকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ফলস্বরূপ দেখা যায় পরবর্তী সময়ে এই নারীরা অধিকাংশই (কমলা দাশগুপ্ত, কল্পনা দত্ত, বীনা দাস প্রমুখ) তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। আবার এই অধিকসংখ্যক নারীর কারাবরণ সমাজকে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে এবং নারী ভাবনায় পরিবর্তন আনতে সহায়তাও করে। ১৯৩০-এর নভেম্বরে হিন্দি ম্যাগাজিন *Chand* মতামত প্রকাশ করে

> Our readers would be surprised to know that the number of women who have gone to jail for taking part in the freedom movement is maximum in Bengal. … Now all those people who opposed education for women and who spoke against their liberation can gain some lessons from this heavenly sight.[৪৭]

সার্বিক বিচারে বলা যায় কারাজীবন ছিল নারীর জন্য বৃটিশ প্রশাসন তথা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং বাঙালি নারী কেবল এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নি, নারীশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজচিন্তনে পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়, একই সঙ্গে নারীর আত্মবিকাশেও কারাজীবন সহায়তা করে।

আইন অমান্য আন্দোলনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ সংখ্যাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। যদিও এই সংখ্যা অপর সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় বলা চলে ছিল নগণ্য, তথাপি সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিশের দশকে বাঙালি মুসলিম নারীরা রক্ষণশীল মুসলিমসমাজের ধর্মীয় গোড়ামি আর কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছিলেন। শুধু মুসলিমসমাজের রক্ষণশীলতা নয়, বাঙালি মুসলিমদের জন্য দ্বিতীয় সমস্যা ছিল প্রতিবেশী ধর্ম হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকেদের মুসলমানদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও উপেক্ষার মনোভাব, যা ছিল অনেকটাই অজ্ঞতাবশত এবং যার কারণে গোঁড়া হিন্দুসমাজ মুসলমানদের হীন চোখে দেখতো। মূলত উপনিবেশিক ভারতে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিমদের পশ্চাদপদতা এবং বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সীমিত আকারে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণের এটি একটি কারণ ছিল। জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, যিনি পথিকৃৎ মুসলিম নারী রাজনৈতিক, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন

> এখনকার বাংলাদেশী কোন মুসলমান একথা চিন্তাও করতে পারবেন না যে, প্রতিবেশীর ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রতিবেশী অমুসলমান খোঁজই রাখত না যে মুসলমানরা কি। ওরা শুধু গরুই খায় আর গুন্ডামি করে। নীচু জাতের ওরা। সিলেট মহিলা সংঘের সভায় একদিন বলেই ফেললেন একজন মহিলা যাঁর কাছে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তার পাড়ার মেয়েদেরকে সঙ্ঘের মেম্বার করার ও অন্যান্য বিষয়ের। তিনি কিছুই করেননি। কৈফিয়ৎ দিলেন যে "আমাদের পাড়ায় তো ভদ্রলোক নেই! সবাই মুচলমান।" অথচ ওই পাড়ায় শিক্ষিত মুসলমান আর হিন্দুও আছেন অনেক। আর বস্তিও আছে মুসলমানদের। তখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম ঐ সভায়ই উক্ত ভদ্রমহিলাকে, তাহলে আমিওতো মুসলমান অভদ্রলোক, উচিত হয় নি আপনাদের, আমাকে প্রেসিডেন্টের পদে নির্ব্বাচিত করার। সভাস্থলে সকলের মুখে চুনকালি পড়ল, সকলেই এই উক্তির জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অবমাননা করার অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার জন্য অনুতাপ করা হলো।[৪৮]

বাঙালি মুসলিমসমাজ তাদের মেয়েদের পর্দাপ্রথা অমান্য করে প্রকাশ্য রাজপথে বা সভাসমিতিতে দেখতে নারাজ ছিল। "সাম্প্রদায়িক গোঁড়া কাঠমোল্লাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য ২/১ খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের দৌলতে।"[৪৯] জোবায়দা খাতুন চৌধুরী রাজনীতিতে যোগ দিলে সেইসব পত্রিকা তিনি ইসলামি শরিয়তবিরোধী কাজ করছেন বলে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাত, এমনকি তার পিতা খান বাহাদুর শরাফত আলী চৌধুরীকেও সমাজের কটুক্তি শুনতে হয়। জোবায়দা খাতুনের স্মৃতিতে জানা যায় তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত মওলানা হোসেন আহমদ মদনী প্রতি রমজান মাসে সিলেট অবস্থান করতেন এবং 'খতমে তারাবী'র নামাজ জামাতে পড়াতেন।[৫০] তাঁর পিতা সেই নামাজে শরীক হতেন। নামাজে ক্ষণিক বিরতির সুযোগ নিয়ে ধর্মান্ধ লোকেরা মওলানা সাহেবকে বোঝাতেন, "ডিপুটি সাহেব, উনার মেয়েরা পর্দ্দা মানে না, বোর্খা পড়ে না, সভায় যায়, মিছিলে যায়, বক্তৃতা দেয়, ইসলামি শরিয়তবিরোধী কাজ করে।"[৫১] তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রথম কারাবরণকারী মুসলিম নারী হোসনে আরা মোদাব্বের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গ্রামে গেলে তাঁকে গ্রহণ করতে তাঁর আত্মীয়-স্বজন অসম্মতি জানায়, তার স্বামী মোহাম্মদ মোদাব্বের এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এভাবে

> কলকাতায় মাসখানেক রেখে হোসনে আরাকে গ্রামের বাড়ীতে রেখে এলাম। গ্রামে আমাদের উপর শুরু হল কুসংস্কারে অন্ধ লোকদের অত্যাচার। পড়শীরা সকলেই প্রায় আমাদের বয়কট করে বসলো। আমার এক দূর সম্পর্কের বড় ভাই, প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগলো যে, এই বউকে বাড়ীতে থাকতে দেব না। মুসলমানের মেয়ে বেপর্দা হয়ে মিটিং করবে, জেল খাটবে, এ অনাচার আমরা সইব না। মা ত মাথায় করাঘাত করে চীৎকার করে কাঁদেন, ছেলেকে ঘরমুখো করবো বলে বিয়ে দেওয়ালাম আর সেই বউ ছেলেকে ঘর থেকে টেনে বের করলো। আরো কত রকম অত্যাচার যে আমাদের উপর দিয়ে চলল, তা বর্ণনা করলে আর একখানা বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতার বিপরীত চিত্রও ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা যায়। মওলানা হোসেন আহমদ মদনীর নিকট যখন জোবায়দা খাতুনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল,তখন এর সমাধান হিসেবে সিলেট মহিলা সংঘের সেক্রেটারি সরলাবালা দেব এবং জোবায়দা খাতুন চৌধুরী পরামর্শ করে কার্যনির্বাহী পরিষদের এক সভা আহ্বান করে।[৫৩] সভায় বক্তব্য প্রদানের জন্য মওলানা হোসেন আহমদ মদনীকে আমন্ত্রণ জানানো হলে, তিনি সম্মত হন।[৫৪] যদিও সভায় জোবায়দা খাতুন ব্যতীত অন্যকোন মুসলিম মহিলা উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি মওলানা হোসেন আহমদ মদনীর বক্তব্যটি মুসলিম নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের পক্ষে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। তিনি বক্তব্যে বলেন

> আমার সম্মানিতা মা বোনেরা। আমি সিলেটে এসে দেখলাম, স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনারা নারী হয়েও ইংরেজ সরকারের ভয়ভীতি প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যে ভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন উপেক্ষা করে জেল খেটেছেন, লাঠির গুতা খেয়েছেন কামান বন্দুকে ভীত না হয়ে জাতীয় পতাকা উন্নত রেখেছেন, দেখে আমি গর্ব্ব অনুভব করছি। ভারতের সর্ব্বত্র অমুসলমান মহিলারা শোভাযাত্রা, পিকেটিং করছেন। বড় আফসোস কোন মুস্লিম মহিলা এসবে নেই..। সিলেটের পাক জালালাবাদে মুসলিম মহিলারা মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ায় শরিয়তের কোন বরখেলাপ তো হবেইনা, শরিয়তের নির্দেশানুযায়ী কার্যই হবে। প্রাণ যাবে, বিসর্জন দেবেন জীবন, শাহাদত বরণ করবেন তথাপি পতাকার সম্মান রক্ষা করবেন। আমি আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করছি তিনি যেন আপনাদেরকে আরো শক্তি দেন।[৫৫]

মওলানা হোসেন আহমদ মদনী ছিলেন স্বনামখ্যাত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি। এমন একজন ধর্মপরায়ণ মওলানা যখন মুসলিম নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন, তখন সাধারণ মানুষ বিরোধিতা করতে পারে না। আবার হোসনে আরা মোদাব্বের যেমন নিজ গ্রামে লাঞ্ছিত হয়েছেন, আবার তাকে কেউ কেউ সাদরে বরণ করে নেয়ার চিত্রও পাওয়া যায়

> জেলখানা থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনে এলাম। ট্রেনের মধ্যে অনেক যাত্রী গায়ে-পড়ে আলাপ করতে এল। হোস্নে আরাকে দেখিয়ে বললো ইনি কি স্বদেশী করেন? ইনি কি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। যখন জানলো যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরছেন, তখন হিন্দু যাত্রীদের অনেকে এসে দুইহাত জোড় করে নমস্কার করলো। কেউ কেউ লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করতে লাগলো। শিয়ালদহ স্টেশনে হৈ হৈ ব্যাপার। হোসনে আরাকে নেয়ার জন্য কয়েক শতলোকের সমাবেশ হয়েছে, সবাই হিন্দু এবং কংগ্রেস নেতা ও কর্মী।[৫৬]

তবে এঘটনাগুলো ছিল ব্যতিক্রম। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিমসমাজ নারীপ্রসঙ্গে রক্ষণশীল মনোভাবই পোষণ করত। মুসলিম মহিলাদের বৃটিশবিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে কয়েকজন মুসলিম নারী রাজনীতিতে যোগ দেন তারা প্রত্যেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আনোয়ার হোসেন উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৩০-৩২ সালে কলকাতায় ১৭৬ জন মহিলা সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয়, এদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৬ জন মহিলা ছিলেন মুসলিম।[৫৭] তবে তাদের নাম বা পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। কমলা দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন ঢাকার চারজন মহিলার নাম, যারা আইন অমান্য আন্দোলনে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। এরা হলেন, সামছুন্নেছা বেগম (ঢাকার গোলাম জিলানীর মা); রওশন আরা বেগম (ঢাকার গোলাম জিলানীর স্ত্রী); রাইসা বানু বেগম (ঢাকার আসফ আলি বেগের স্ত্রী) এবং বদরুন্নেছা বেগম (ঢাকার আকতারউদ্দীন হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী)।[৫৮] গোলাম জিলানী ছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। আইন অমান্য আন্দোলন করার অপরাধে তিনি কারাবরণ করেন এবং জেলে থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কাজেই তার মা, স্ত্রী এবং অপর দুই মুসলিম নারী পারিবারিক প্রেক্ষাপটে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। সহায়ক ভূমিকায় নয়, বরং প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশনিয়ে নেতৃত্বের আসনে যিনি চলে আসেন তিনি জোবায়দা খাতুন চৌধুরী। হেনা দাসকে উদ্ধৃত করে জোবায়দা খাতুন চৌধুরীর জীবনীকার তাজুল মোহাম্মদ বলেন

> জোবায়দা খাতুন চৌধুরী হলেন সেকালে প্রথম ও একমাত্র মুসলিম মহিলা, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে কঠোর অবরোধ প্রথার শৃঙ্খল ছিঁড়ে প্রকাশ্যে রাজপথের শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মহিলা সংঘের সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করার মতো যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সারা বাংলায় কংগ্রেসী মহিলা নেতৃত্বের প্রথম সারিতে জোবায়দা খাতুনের অবস্থান ছিল একটি বিস্ময়কর ও অসাধারণ ঘটনা।[৫৯]

মুসলিম নারী হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে প্রথম দেখা যায় জোবায়দা খাতুন চৌধুরীকে। জোবায়দা খাতুন চৌধুরী কংগ্রেসে যোগদান করেন ১৯২৮-এ, ১৯৩০-এ সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেসপন্থী নারীদের একটি সংগঠন। অনেকে অভিমত পোষণ করেন যে এটি মহিলা কংগ্রেসের প্রথম জেলা কমিটি, তবে এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।[৬০] আবার কমিটির নাম নিয়েও রয়েছে মতভেদ। কেউ কেউ উল্লেখ করা হয়েছে মহিলা সংঘ, অনেকে বলেছেন কংগ্রেসের মহিলা শাখা। গবেষক তাজুল ইসলাম দুটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠার সাল কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে নামের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও সংগঠন ছিল একটিই।[৬১] জোবায়দা খাতুন চৌধুরী তাঁর অপ্রকাশিত আত্মকথায় 'সিলেট মহিলা সংঘ' বলে সংগঠনটির নাম উল্লেখ করেছেন।[৬২] তাঁর স্মৃতিকথায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে তিনি এই সংগঠনটির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং সেক্রেটারি ছিলেন সরলাবালা দেব।[৬৩] একজন রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের নারী কংগ্রেসের মহিলা সদস্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে জোবায়দা খাতুন নিজ আত্মশক্তির পরিচয়ই শধু দেন নি, তিনি বাংলার পশ্চাদপদ গোঁড়া মুসলিম নারীসমাজের জন্য উদাহরণ তৈরি করলেন। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সিলেটের অন্যান্য মুসলিম মহিলারা এগিয়ে আসার মতো সাহসিকতা দেখালেন না। ব্যতিক্রম হিসেবে একজনের নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন সিলেট বারের আইনজীবি সিরাজউদ্দিন চৌধুরীর স্ত্রী মুহিবুন্নেসা চৌধুরী। মুহিবুন্নেসা চৌধুরী স্বামীর উৎসাহে রাজনীতিতে আসেন। জোবায়দা খাতুন চৌধুরী মুহিবুন্নেসা চৌধুরীর রাজনীতিতে যোগদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন

> ঘোর রক্ষণশীল অভিজাত জমিদার পরিবারের কন্যা বিয়ে হয়ে আসলেন যার ঘরে, তিনি মুসলমান সমাজে অত্যাধুনিক রবীন্দ্রভক্ত, সাহিত্যানুরাগী, মজলিশি, তার্কিক, অপ্রিয় সত্যবাদী, যুবসমিতির সভাপতি ইত্যাদি। তিনি মেয়েদের পর্দা

Dhaka University Institutional Repository

> বা অবরোধের বিরোধী আশ্চর্য্য ঘটনা, অথচ বিয়ে করলেন গোড়াঁ সংস্কারবাদী পরিবারের মেয়ে। কিন্তু হলে কি হবে? প্রথম থেকেই সহধর্ম্মিনীকে এমন দীক্ষা দিলেন, জোবেদা খাতুন চৌধুরীর পাশে আর একজন সঙ্গিনী মুহিবুন্নেসা চৌধুরী। আর কি উৎসাহ উদ্দীপনায় তিনি সাথী বান্ধবী হয়েছেন জোবেদা খাতুনের। অথচ আমাদের দু'বান্ধবীর ঘর বলতে উল্টো পরস্পর বিপরীত। যেমন আমার স্বামী রক্ষণশীল হলেও আমি অধিকার আদায় করেছি প্রথমে ঘরে সংগ্রাম করে। আর মুহিবুন্নেসা চৌধুরী মুক্তি পেয়ে গেছেন স্বামীর আধুনিক মতবাদ আর উদারতায়।[৬৪]

বাঙালি মুসলিম সমাজের অল্পসংখ্যক নারী পরিবার এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ত্রিশের দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হলেও তাদের অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। জোবেদা খাতুন সিলেটে মহিলা সংঘের নেতৃত্বে এসে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৩১-এর ২৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে উৎসব এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় মহিলাদের সংগঠিত করেন জোবায়দা খাতুন। মিছিলটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গোবিন্দ পার্কের সামনে আসলে বাধা দেয় পুলিশ। জোবায়দা খাতুন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলেন যেখানে পুলিশ বাধা দিয়েছে সেই স্থানে অবস্থান করেই তাঁরা স্বাধীনতার শপথ নেবেন। এরপর পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে প্রকাশ্য রাজপথে শপথবাক্য পাঠ করান জোবায়দা খাতুন চৌধুরী। পরবর্তী বছরেও তাঁর উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। তাঁর সভাপতিত্বকালে সিলেট মহিলা সংঘের উদ্যোগে সুরমা উপত্যাকায় একটি রাষ্ট্রীয় সম্মেলন করে, যে সম্মেলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, উর্মিলা দেবীসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।[৬৫] তাঁর নেতৃত্বে মহিলা সংঘ সিলেটের মনিপুরী কৃষকদের জমিদারদের নির্যাতনের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা ভানুবিল আন্দোলনে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে।[৭০] সত্যেন সেন জোবায়দা খাতুনের মূল্যায়নে বলেন

> তাঁকে দেখা যেত মিছিলের পুরোভাগে, সভামঞ্চে – সামাজিক কোনো বাধাই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তখনকার দিনের সিলেটের মুসলিম সমাজের কোন শরিফ পরিবারের মহিলার পক্ষে এভাবে সাধারণ নরনারীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকাশ্য রাজপথে বেরিয়ে আসা-এ যে কতো বড় সাহসের পরিচায়ক, সে কথা আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের বলে বোঝানো যাবে না। সে সময়কার রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে ওদের মতো গুটিকয়েক মহিলা সেদিন ন্যায়ের জন্য আদর্শের জন্য, মুক্তির জন্য প্রথম পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন।[৬৬]

জোবায়দা খাতুন চৌধুরী পিকেটিং-এর কাজেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তবে তাঁকে অন্যান্যদের মতো গ্রেফতার বা কারাবরণ করতে হয় নি। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার পিতা এবং পাবলিক প্রসিকিউটর স্বামীর কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিত না, পরিবর্তে তাকে তাঁর পিতার জিম্মায় ছেড়ে দিত।[৬৭]

মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাবরণের সম্মান প্রথম অর্জন করেন হোসনে আরা মোদাব্বের। তিনি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাতুষ্পুত্রী এবং রাজনীতিবীদ ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের স্ত্রী। মোহাম্মদ মোদাব্বের বিপ্লবপন্থী হলেও স্ত্রী হোসনে আরা কংগ্রেসের আদর্শে বিশাবাসী ছিলেন। ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে সাধারণ গৃহিনী মেয়েরা যাতে আত্মনির্ভরশীল হতে